টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট:
বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২০

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট:
বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২০

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০

[মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত]

(এসডিজি অগ্রগতি মূল্যায়ন বিষয়ক জিইডির এটি দ্বিতীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদন)

এসডিজিএস প্রকাশনা # ২৪, জিইডি

প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব:
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

এই প্রতিবেদনটি ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এবং ইউনেপ-পিইএ এর 'Strengthening Institutional Capacity for SDGs Achievement in Bangladesh (SC_4SDG)' শীর্ষক প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রকাশ করা হয়েছে।

মুদ্রাকর :
ছোঁয়া
লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

মুদ্রিত কপির সংখ্যা : ২০০০

এম.এ. মান্নান, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে (জিইডি) দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক 'বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' প্রকাশের জন্য অভিনন্দন জানাই। এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য দেশে টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

বাংলাদেশ সরকার সবসময়ই বৈশ্বিক অভীষ্ট বাস্তবায়ন এবং দেশের অর্জনের বিষয় তুলে ধরার জন্য অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সূত্রে, বাংলাদেশ এরই মধ্যে ২০১৭ সালে প্রথম স্বতঃপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা (VNR) এবং ২০১৮ সালে প্রথম বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে।

বাংলাদেশ এই বছরের জুলাইয়ে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে (HLPF) দ্বিতীয় VNR উপস্থাপনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়া ২০২০ সালে এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা-বিষয়ক (SIR) সম্মেলনের দ্বিতীয় রাউন্ড আয়োজন করতে যাচ্ছে। অধিকন্তু বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। এটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বাংলাদেশে 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০'-এ এসডিজি বাস্তবায়নে সফলতার বিভিন্ন গল্প উঠে এসেছে। এগুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এসডিজির অংশ প্রণয়নে এবং আমাদের ফ্ল্যাগশিপ পরিকল্পনা দলিলে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে।

আমি এসডিজি অগ্রগতি পরিবীক্ষণের এই প্রকাশনা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং সব ধরনের অংশীজনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আরও সাধুবাদ জানাই ইউএনডিপির SC4SDG প্রকল্পকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রস্তুতিতে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য।

আমি আশা করি, এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন সামনে এগিয়ে যাওয়ার চিত্র উপস্থাপন ও দেশ ভবিষ্যতে যে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে তা মোকাবিলার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকাশনা হবে। আমি আরও আশা করছি, জিইডি নিয়মিত এই এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের উদ্যোগ নেবে, যেন অগ্রগতি অনুসরণে প্রণিধানযোগ্য প্রতিবেদন বহুসংখ্যক অংশীজনের কাছে নিয়মিত ভিত্তিতে সহজলভ্য করা যায়।

(এম.এ. মান্নান, এমপি)

[মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত]

জুয়েনা আজিজ
মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' প্রকাশ করছে। এটি এই ধরনের প্রথম প্রতিবেদন যা ২০১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি আশা করি, এসডিজির স্বতঃপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা (VNR) প্রস্তুত করার জন্য উপাত্ত বিশ্লেষণের পরিপূরক হিসেবে এই নথির হালনাগাদ তথ্য কাজে আসবে। বাংলাদেশ এটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে (HLPF) ২০২০ সালের জুলাইয়ে উপস্থাপন করতে যাচ্ছে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসডিজি চ্যাম্পিয়ন। গত চার বছরে জাতীয় পরিকল্পনা কৌশলসমূহের সঙ্গে এসডিজির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, সমগ্র সমাজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, এসডিজি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওপর দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে, উপাত্ত ঘাটতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কর্মকাঠামো চূড়ান্ত হয়েছে, অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে, অনলাইন ট্র্যাকারের সূচনা হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে এসডিজি স্থানীয়করণে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও তার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সরকারের প্রণীত M&E ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে বাংলাদেশ এসডিজির অনেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পথেই আছে অথবা এরই মধ্যে ২০২০ সালে অর্জনের জন্য নির্ধারিত কিছু লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় উপাত্ত সমন্বয় কমিটি (NDCC) গঠন করেছে। এর লক্ষ্য এসডিজি ও অন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপাত্ত ঘাটতি চিহ্নিত করা, গুণগত মানসম্পন্ন উপাত্তের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় করা। এই প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় অগ্রগতি প্রতিবেদনে প্রথমটির তুলনায় তথ্যের সহজলভ্যতার উন্নতি হয়েছে।

প্রতিবেদনটি তৈরিতে হালনাগাদ উপাত্ত সরবরাহ করায় আমি সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং অন্য তথ্য সরবরাহকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাদের উপাত্তের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে। অনেকেই ভালোভাবে অবগত আছে যে, বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অর্জন সাধিত হয়েছে। আমি আশা করি, পরবর্তী এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদনে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ থাকবে, যেখানে দেশে এসডিজি স্থানীয়করণের ৩৯+১ সূচকসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতির চিত্র থাকবে। এটি স্থানীয় পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি উৎসাহিত করবে এবং জনগণের নিকট জবাবদিহির একটি প্রক্রিয়া কার্যকর করবে।

সবাইকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা।

(জুয়েনা আজিজ)

[মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত]

ড. শামসুল আলম
সদস্য (জ্যেষ্ঠ সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

প্রাক-কথা

সরকারের কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা এবং জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (বিবিএস) থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি): বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' প্রণয়ন করে তা প্রকাশ করেছে।

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারে নিয়মিত কার্যক্রমের সঙ্গে এসডিজির সংগতিবিধান, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম এরই মধ্যে সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ। এসডিজিকে সকল অভীষ্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যপরিধির সঙ্গে সংযুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর উন্নয়ন এজেন্ডার সঙ্গেও এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংযুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্যরেখা ও নিম্ন দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার হার স্থিতিশীলভাবে হ্রাস পাচ্ছে। জাতীয় দারিদ্র্য পরিমাপে এমন চিত্রই পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতিক প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে উচ্চ দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত ২০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। পাশাপাশি নিম্নদারিদ্র্য নেমে এসেছে ১০.৫ শতাংশে। ঘাতসহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ত্বরিত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য মোকাবিলায় সরকার প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

পাঁচ বছরের কম বয়সী খর্বকায় শিশুর অনুপাত কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৯৯৬-৯৭ সময়ে এই বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ছিল ৬০ শতাংশ, ২০১৯ সালে তা ২৮ শতাংশে নেমে আসে। এছাড়া ২০১৯ সালে কৃশকায় শিশুর হার নেমে এসেছে ৯.৮ শতাংশে, ২০১৪ সালে এই হার ছিল ১৪ শতাংশ। আর পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে কম ওজনের শিশুর অনুপাত ২০০৭ সালের (৪১ শতাংশ) তুলনায় ২০১৯ সালে (২২.৬ শতাংশ) অর্ধেকে নেমে এসেছে।

১৯৯৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুমৃত্যুর হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উল্লিখিত সময়ে এই বয়সী শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ১২৫ থেকে ৪০ জনে নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে ২০২০ সালের জন্য যে মাইলফলক নির্ধারণ করা হয়েছে, বাংলাদেশ তা অর্জনে সঠিক পথেই অগ্রগর হচ্ছে। এছাড়া ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের গর্ভধারণের হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৯ সালে প্রতি এক হাজার শিশুর জন্মে কিশোরী মায়ের সংখ্যা ছিল ১৪৪ জন। ২০১৯ সালে তা ৮৩ জনে নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সরকার চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (HPNSP, ২০১৮-২০২২) বাস্তবায়ন করছে।

২০১২-১৩ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর হার ছিল ৭৯.৫ শতাংশ, ২০১৯ সালে তা ৮২.৬ শতাংশে উন্নীত হয়। আর ২০১৯ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সমাপনীর হার ছিল যথাক্রমে ৬৪.৭ ও ২৯.৪ শতাংশ। বৈশ্বির জেন্ডার গ্যাপ সূচকে ২০১৯ সালে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫০তম। আর নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সূচকে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। এক্ষেত্রে বিগত পাঁচ বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে, যা নারীর ক্ষমতায়ন জোরদারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির বিষয়টি জোরালোভাবে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের প্রকৃত মাথাপিছু গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতির ধারা উল্লেখ করার মতো। ২০১৪-১৫ সময়ে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.১ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৬.৯১ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে করোনাভাইরাস-জনিত রোগ (কোভিড-১৯) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার ক্ষেত্রে গুরুতর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন ও ঋদ্ধকরণে সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৪.২১ শতাংশে উন্নীত হয়, ২০১০-১১ অর্থবছরে যা ছিল ১৭.৭৫ শতাংশ।

দেশের টেলিযোগাযোগ পদ্ধতির আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৫.৭৫ কোটিতে উন্নীত হয়। প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠীর কাছে টু-জি মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে ২০২০ সালের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তা ২০১৯ সালের জুনেই অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৯ সালের জুনে থ্রি-জি ও ফোর-জি সেবার আওতায় আসে ৭৯ শতাংশ মানুষ।

এসডিজির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতির বিষয়ে সরকার সজাগ রয়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী ও গুণগত উপাত্ত প্রস্তুতকরণ এবং তা হালনাগাদ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' অগ্রাধিকারের সমন্বয়সাধন ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবে, যা এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা অনুধাবন ও সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন থাকতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের সকল অংশীজনের কাছ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণের অত্যাবশ্যকতা অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এই প্রতিবেদন এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সঠিক পথে পরিচালনের লক্ষ্যে অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া জোরদার করার ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন প্রেরণা জোগাবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো এসডিজির নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ব্যবহার করে প্রকৃত অগ্রগতি তুলে ধরা (অর্জনে পিছিয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করা), যাতে পরবর্তীকালে বিদ্যমান দুর্বলতা চিহ্নিত করে সময়োপযোগী ও গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং পুনরাবৃত্তি ও বাহুল্য বর্জন করে উপাত্ত তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

প্রতিবেদনটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করায় আমি বিবিএস, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা (Custodian Agency) প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে প্রতিবেদনটি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান ও একটি সমন্বিত টিম হিসেবে কাজ করায় জিইডির সকল সহকর্মী, ইউএনডিপির (SC4SDG) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞগণ এবং (UNEP-PEA) প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সবশেষে এসডিজির অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নে সর্বাত্মক সহায়তা ও প্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উজ্জীবিত করায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নানের প্রতি জিইডির সকল সহকর্মীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক ইউনিট প্রতিবেদনটি প্রণয়নে সহায়তা করেছে। তাদের প্রতিও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(শামসুল আলম)

[মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত]

সূচিপত্র

আদ্যাক্ষর শব্দাবলী ১৪
নির্বাহী সংক্ষেপ ২১
ভূমিকা অধ্যায় ৩৩
বাংলাদেশ: এসডিজি বাস্তবায়নের চার বছর ৩৩
পটভূমি ৩৪
টেকসই উন্নয়নে ২০৩০ কর্মসূচি ৩৪
বাংলাদেশ ও এসডিজি ৩৪
এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ৩৫
মন্ত্রণালয়সমূহে এসডিজির ম্যাপিং ৩৫
কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ৩৫
উপাত্তের ঘাটতি পর্যালোচনা ৩৬
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৩৬
এসডিজির অর্থায়ন কৌশল ৩৭
কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্তকরণ ৩৮
এসডিজি অর্জনে 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতি ৩৮
'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' নীতির ওপর গুরুত্বারোপ ৩৯
বাংলাদেশে এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০ ৪০
দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ৪১
সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় ৪৪
এসডিজি ১: দারিদ্র্য বিলোপ ৪৫
সকল পর্যায়ে সব ধরনের দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন ৪৫
১.১ এসডিজি ১ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ৪৬
১.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১ অগ্রগতি পর্যালোচনা ৪৬
১.৩ এসডিজি ১ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা ৫১
১.৪ এসডিজি ১ অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ ৫৩
১.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ৫৩
১.৬ সারকথা ৫৫
এসডিজি ২: ক্ষুধামুক্তি ৫৭
ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার ৫৭
২.১ এসডিজি ২ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ৫৮
২.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ২-এর অগ্রগতি পরিমাপ ৫৯
২.৩ এসডিজি ২ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা ৬১
২.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৬২
২.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ৬৩
২.৬ সারকথা ৬৩
এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ ৬৫
সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান ৬৫
৩.১ এসডিজি ৩ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ৬৬

৩.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৩ অগ্রগতি পর্যালোচনা ৬৭
৩.৩ এসডিজি ৩ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা ৭৩
৩.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৭৪
৩.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ৭৫
৩.৬ সারকথা ৭৫
এসডিজি ৪: গুণগত শিক্ষা ৭৭
সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিতকরণ ৭৭
৪.১ এসডিজি ৪ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ৭৮
৪.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৪ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ৭৯
৪.৩ এসডিজি ৪ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা ৮১
৪.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৮২
৪.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ৮৩
৪.৬ সারকথা ৮৩
এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ৮৫
জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন ৮৫
৫.১ এসডিজি ৫ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ৮৬
৫.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৫ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ৮৭
৫.৩ এসডিজি-৫ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা ৮৯
৫.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৯০
৫.৫ সারকথা ৯২
এসডিজি ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ৯৫
সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ৯৫
৬.১ এসডিজি-৬ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ৯৬
৬.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৬ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ৯৭
৬.৩ সরকারের প্রচেষ্টা ৯৮
৬.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৯৯
৬.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ১০০
৬.৬ সারকথা ১০০
এসডিজি ৭: সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি ১০৩
সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা ১০৩
৭.১ এসডিজি ৭ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১০৪
৭.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৭ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ১০৪
৭.৩ সরকারের প্রচেষ্টা ১০৮
৭.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১০৯
৭.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ১১০
৭.৬ সারকথা ১১০
এসডিজি ৮: স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১১৩
স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল চাকরি এবং সবার জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ১১৩
৮.১ এসডিজি ৮ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১১৪

৮.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৮ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ১১৫
৮.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১২১
৮.৪ ভবিষ্যৎ করণীয় ১২২
৮.৫ সারকথা ১২৩
এসডিজি ৯: অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন ১২৫
অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের সম্প্রসারণ এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ১২৫
৯.১ এসডিজি-৯ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১২৬
৯.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি-৯ অর্জন অগ্রগতি পর্যালোচনা ১২৭
৯.৩ এসডিজি-৯ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা ১৩০
৯.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১৩১
৯.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ১৩১
৯.৬ সারকথা ১৩২
এসডিজি ১০: অসমতার হ্রাস ১৩৩
দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমানো ১৩৩
১০.১ এসডিজি-১০ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১৩৪
১০.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি-১০ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ১৩৫
১০.৩ অসমতা হ্রাসে সরকারের উদ্যোগ ১৪০
১০.৪ প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ ১৪২
১০.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ১৪৩
১০.৬ সারকথা ১৪৫
এসডিজি ১১: টেকসই নগর ও জনবসতি ১৪৭
অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা ১৪৭
১১.১ এসডিজি ১১ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১৪৮
১১.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১১ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ১৪৯
১১.৩ টেকসই নগর ও জনবসতি নিশ্চিতে সরকারি প্রচেষ্টাসমূহ ১৫১
১১.৪ প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ ১৫৪
১১.৫ সারকথা ১৫৫
এসডিজি ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উন্নয়ন ১৫৭
টেকসই উৎপাদন ধারা ও পরিমিত ভোগ নিশ্চিতকরণ ১৫৭
১২.১ এসডিজি ১২ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১৫৮
১২.২ বাংলাদেশে এসডিজি ১২ অর্জনো হালনাগাদ চিত্র ১৫৯
১২.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১৬৩
১২.৪ ভবিষ্যৎ করণীয় ১৬৪
১২.৫ সারকথা ১৬৫
এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম ১৬৭
জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ ১৬৭
১৩.১ এসডিজি ১৩ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১৬৮
১৩.২ অগ্রগতি পর্যালোচনা ১৬৮
১৩.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১৭২

১৩.৪ ভবিষ্যৎ করণীয় ১৭৩
১৩.৫ সারকথা ১৭৩
এসডিজি ১৪: জলজ জীবন ১৭৫
টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ১৭৫
১৪.১ এসডিজি ১৪ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১৭৬
১৪.২ এসডিজি ১৪ অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬
১৪.৩ সরকারের প্রচেষ্টা ১৭৮
১৪.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১৭৯
১৪.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ১৭৯
১৪.৬ সারকথা ১৮০
এসডিজি ১৫: স্থলজ জীবন ১৮১
স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা দান, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরূকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয়রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ ১৮১
১৫.১ এসডিজি ১৫ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১৮২
১৫.২ অর্জন অগ্রগতি পর্যালোচনা ১৮২
১৫.৩ এসডিজি-১৫ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা ১৮৮
১৫.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১৯০
১৫.৫ ভবিষ্যৎ করণীয় ১৯০
১৫.৬ সারকথা ১৯১
এসডিজি ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ১৯৩
টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ ১৯৩
১৬.১ এসডিজি ১৬ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১৯৪
১৬.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১৬ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ১৯৫
১৬.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ১৯৮
১৬.৪ ভবিষ্যৎ করণীয় ১৯৯
১৬.৫ সারকথা ১৯৯
এসডিজি ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব ২০১
টেকসই উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ২০১
১৭.১ এসডিজি ১৭ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ২০২
১৭.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১৭ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ২০৩
১৭.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ২১০
১৭.৪ সারকথা ২১০
অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ ২১১
এসডিজি অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ ২১৩
আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ ২১৫
তথ্যপঞ্জি. ২১৭
সংযুক্তি: সমন্বিত সারণি এসডিজি সূচকসমূহের ভিত্তিসীমার নিরিখে ২০২০ সাল পর্যন্ত হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২২৩
২০০৯ থেকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ২৩৮
২০১৬ থেকে জিইডি কর্তৃক প্রকাশিত এসডিজি বিষয়ক গ্রন্থাবলী ২৪২

সারণি তালিকা

সারণি ১:	এসডিজি বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষিত	৪২
সারণি ১.১:	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত (%)	৪৭
সারণি ১.২:	উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা, ১৯৯২-২০১৯ (%)	৪৭
সারণি ১.৩:	নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা, ১৯৯২-২০১৯ (%)	৪৮
সারণি ১.৪:	বহুমাত্রিক সূচকে দারিদ্র্য প্রবণতা, ২০০৪-২০১৯	৪৮
সারণি ১.৫:	সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণ প্রবণতা, ২০০৫-২০১৯ (%)	৪৯
সারণি ১.৬:	মৌলিক সেবা প্রাপ্তির প্রবণতা	৪৯
সারণি ১.৭:	মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিভিন্ন সেবায় সরকারি ব্যয়ের অনুপাত (শতাংশ)	৫১
সারণি ২.১:	পুষ্টিহীনতার হার	৫৯
সারণি ২.২:	পাঁচ বছরের নিচে শিশুর পুষ্টিগত অবস্থানের প্রবণতা (শতাংশ)	৬০
সারণি ২.৩:	বাংলাদেশে কৃষিমুখিতা সূচকের প্রবণতা, ২০০১-২০১৬	৬১
সারণি ২.৪:	কৃষি খাতে মোট বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৬১
সারণি ৩.১:	মাতৃমৃত্যুর অনুপাত, ১৯৯৫-২০১৮	৬৭
সারণি ৩.২:	প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি, ১৯৯৪-২০১৯ (শতাংশ)	৬৭
সারণি ৩.৩:	শিশুমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৬৮
সারণি ৩.৪:	প্রতি লাখ মানুষের বিপরীতে যক্ষ্মা সংক্রমণের অবস্থা	৬৮
সারণি ৩.৫:	আত্মহত্যায় মৃত্যুর হার (প্রতি লাখ জনসংখ্যায়)	৬৯
সারণি ৩.৬:	বছরে মাথাপিছু পিওর অ্যালকোহল গ্রহণের হার (লিটার)	৭০
সারণি ৩.৭:	সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার (প্রতি এক লাখ জনসংখ্যায়)	৭০
সারণি ৩.৮:	১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি প্রতি হাজার কিশোরীর মধ্যে গর্ভধারণের হার	৭১
সারণি ৩.৯:	মোট পারিবারিক ব্যয়ের অনুপাতে স্বাস্থ্যসেবায় বড় অঙ্কের ব্যয় করা জনসংখ্যার অনুপাত (%)	৭১
সারণি ৪.১:	শিক্ষায় জেন্ডার সমতা সূচক, ১৯৯০-২০১৯	৮০
সারণি ৪.২:	১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সি প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার	৮১
সারণি ৪.৩:	প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সি-ইন ইডি প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষকের অনুপাত	৮১
সারণি ৫.১:	জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের অনুপাত, ১৯৯১-২০১৯	৮৮
সারণি ৫.২:	দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের আপেক্ষিক চিত্র	৯২
সারণি ৭.১:	বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)	১০৬
সারণি ৭.২:	রান্নায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)	১০৭
সারণি ৭.৩:	মোট ব্যবহৃত চূড়ান্ত জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য উৎসের অংশ (শতাংশ)	১০৭
সারণি ৭.৪:	নবায়নযোগ্য অবকাঠামোর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা	১০৭
সারণি ৭.৫:	প্রাথমিক জ্বালানির তীব্রতার স্তর (প্রতি বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকায় তেল সমতুল্য কিলোটন)	১০৮
সারণি ৮.১:	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	১১৬
সারণি ৮.২:	বেকারত্বের হার, অকৃষিখাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও উপার্জন	১১৮
সারণি ৮.৩:	কর্মসংস্থান, শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণ (এনইইটি) কোথাও না থাকা যুব জনগোষ্ঠীর অনুপাত	১১৯
সারণি ৮.৪:	মারাত্মক ও মারাত্মক নয়, এমন পেশাগত জখম	১২০

সারণি ৮.৫:	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচক	১২১
সারণি ৯.১:	প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটারে রাস্তার ঘনত্ব	১২৭
সারণি ৯.২:	জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের অবদান (শতাংশ)	১২৮
সারণি ৯.৩:	জনপ্রতি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন (স্থিরমূল্যে ২০১০ মার্কিন ডলার)	১২৮
সারণি ৯.৪:	মোট কর্মসংস্থান অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থান (শতাংশ)	১২৮
সারণি ৯.৫:	প্রতি মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে (পূর্ণকালীন) গবেষকের সংখ্যা	১২৮
সারণি ৯.৬:	অবকাঠামো খাতে সহায়তার ছাড় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১২৯
সারণি ৯.৭:	অবকাঠামো খাতে ২০১২ থেকে ২০১৮ সালে মোট আন্তর্জাতিক সহায়তা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১২৯
সারণি ৯.৮:	মোট মূল্য সংযোজনে মধ্য ও উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পের মূল্য সংযোজনের অনুপাত (শতাংশ)	১২৯
সারণি ৯.৯:	প্রযুক্তি দ্বারা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)	১৩০
সারণি ১০.১:	বাংলাদেশে সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে ধনী শ্রেণির জন্য নির্বাচিত সামাজিক সূচকসমূহ	১৩৭
সারণি ১০.২:	বিভিন্ন ধরন অনুযায়ী উন্নয়ন খাতে সম্পদপ্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৩৯
সারণি ১২.১:	বাংলাদেশের উপাদান পদাঙ্ক	১৬১
সারণি ১২.২:	বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভোগ	১৬১
সারণি ১২.৩:	জীবাশ্ম জ্বালানি ভর্তুকি	১৬৩
সারণি ১৩.১:	দুর্যোগের কারণে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি	১৬৯
সারণি ১৪.১:	সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকার আওতা	১৭৭
সারণি ১৪.২:	বাংলাদেশের সংরক্ষিত সামুদ্রিক অঞ্চল	১৭৭
সারণি ১৫.১:	বাংলাদেশের সংরক্ষিত এলাকাসমূহ	১৮৫
সারণি ১৫.২:	উদ্ভিদের আদি আবাসস্থলের বাইরে সংরক্ষিত অঞ্চল	১৮৬
সারণি ১৫.৩:	প্রজাতির তুলনা ২০০০ ও ২০১৫ সালে	১৮৭
সারণি ১৫.৪:	বাংলাদেশে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)	১৮৮
সারণি ১৬.১:	পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা	১৯৫
সারণি ১৬.২:	মানব পাচার ও যৌন সহিংসতার শিকার	১৯৭
সারণি ১৭.১:	বহিঃস্থ অর্থের উৎসসমূহ	২০৩
সারণি ১৭.২:	মোট সরকারি রাজস্ব ও অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	২০৪
সারণি ১৭.৩:	বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা এবং বার্ষিক বাজেট	২০৪
সারণি ১৭.৪:	বার্ষিক বাজেটে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) অনুপাত	২০৫
সারণি ১৭.৫:	জিডিপির অনুপাত হিসাবে প্রবাসী আয়	২০৫
সারণি ১৭.৬:	রপ্তানির অনুপাত হিসাবে ঋণসেবা	২০৫
সারণি ১৭.৭:	ফিক্সড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রাহক	২০৬
সারণি ১৭.৮:	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুপাত (শতাংশ)	২০৭
সারণি ১৭.৯:	বাংলাদেশকে আশ্বাস দেওয়া কারিগরি সহায়তার মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২০৮
সারণি ১৭.১০:	ওয়েইটেড শুল্ক-গড়	২০৯
সারণি ১৭.১১:	গড় শুল্কহার	২০৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র ৫.১:	নারী সংসদ সদস্যের শতাংশীয় হার	৮৯
চিত্র ৮.১:	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	১১৬
চিত্র ৮.২:	মারাত্মক ও মারাত্মক নয়, এমন পেশাগত জখম	১২০
চিত্র ৮.৩:	মারাত্মক পেশাগত জখমের হার	১২০
চিত্র ৮.৪:	প্রতি লাখ পূর্ণবয়স্ক জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ও এটিএম বুথের সংখ্যা	১২১
চিত্র ১০.১:	বাংলাদেশে আয়ের জিনিসহগ, ১৯৬৩-২০১৬	১৩৬
চিত্র ১০.২:	বাংলাদেশ পালমা রেশিও, ১৯৬৩-২০১৬	১৩৬
চিত্র ১০.৩:	জাতীয় পর্যায়ে মোট খানা আয়ে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী জনগোষ্ঠীর (ডিসাইলের)অংশ/হিস্যা, ১৯৬৩-২০১৬	১৩৭
চিত্র ১০.৪:	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়, ১৯৭৬-২০১৯	১৩৯
চিত্র ১১.১:	ঢাকায় পিএম ১০ ও পিএম ২.৫-এর প্রবণতা (২০১৩-২০১৮)	১৫১
চিত্র ১২.১:	জিডিপির শতাংশ হিসাবে ভোগের প্রবণতা	১৫৯
চিত্র ১২.২:	ভোগ ব্যয়ের প্রবণতা	১৬০
চিত্র ১২.৩:	জিডিপির প্রতি এক হাজার ডলারে প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহার	১৬০
চিত্র ১২.৪:	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যসংক্রান্ত চুক্তিতে প্রতিপালনে স্কোর	১৬২
চিত্র ১৩.১:	বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকা	১৭০
চিত্র ১৩.২:	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত খানার অনুপাত (২০০৯-২০১৪ সাল)	১৭১
চিত্র ১৫.১:	সংরক্ষিত অঞ্চলের মানচিত্র (দুটি সংরক্ষিত সামুদ্রিক অঞ্চল দেখানো হয়নি)	১৮৪
চিত্র ১৫.২:	বাংলাদেশের সংরক্ষিত অঞ্চলের প্রবণতা	১৮৬
চিত্র ১৫.৩:	বিপন্ন স্তন্যপায়ী, পাখি ও অন্য উভচর প্রাণীর বিন্যাস	১৮৯
চিত্র ১৫.৪:	হুমকিতে থাকা জলজ প্রজাতির বিন্যাস	১৮৯
চিত্র ১৬.১:	পূর্ববর্তী একমাসে ১-১৪ বছর বয়সি শিশুর হার, যারা শৃঙ্খলা শেখানোর নামে নিগৃহীত হয়েছে, বাংলাদেশ ২০১৯	১৯৬
চিত্র ১৭.১:	বাংলাদেশে ফিক্সড ব্রডব্যান্ড গ্রাহক (প্রতি এক হাজার মানুষে)	২০৬
চিত্র ১৭.২:	বাংলাদেশে চালুর এক বছর পর থ্রিজি ও ফোরজি অবলম্বনের ধারা	২০৭
চিত্র ১৭.৩:	বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (জনসংখ্যার %)	২০৭

আদ্যাক্ষর শব্দাবলী

a2i	Access to Information
ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Programme
AfT	Aid for Trade
AIMS	Aid Information Management System
AIS	Automatic Identifier System
AOI	Agriculture Orientation Index
APAs	Annual Performance Agreements
APTA	Asia-Pacific Trade Agreement
ATM	Automated Teller Machine
BANBAIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BARI	Bangladesh Agriculture Research Institute
BB	Bangladesh Bank
BBIN	Bangladesh-Bhutan-India-Nepal
BBNJ	Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy Action Plan
BCCTF	Bangladesh Climate Change Trust Fund
BCIM	Bangladesh, China, India and Myanmar Economic Corridor
BDF	Bangladesh Development Forum
BDHS	Bangladesh Demographic Health Survey
BDP	Bangladesh Delta Plan
BdREN	Bangladesh Research and Education Network
BDT	Bangladesh Taka
BEZA	Bangladesh Economic Zones Authority
BFD	Bangladesh Forest Department
BIMSTEC	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BLRI	Bangladesh Livestock Research Institute

BMET	Bureau of Manpower Employment and Training
BP	Bangladesh Police
BPFA	Beijing Platform for Action
BPS	Bangladesh Parliament Secretariat
BREB	Bangladesh Rural Electrification Board
BRIS	Birth Registration Information System
BTC	Bangladesh Tariff Commission
BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
CAMS	Continuous Air Monitoring Stations
CBHE	Cross Border Higher Education
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CLS	Child Labour Survey
CO2	Carbon dioxide
CPHS	Citizen Perception Household Survey
DAC	Development Assistance Committee
DIFE	Department of Inspection for Factories and Establishments
DoE	Department of Environment
DOTs	Directly Observed Treatments
DPE	Directorate of Primary Education
DPs	Development Partners
DRM	Disaster Risk Management
DSE	Dhaka Stock Exchange
ECA	Ecologically Critical Area
ECD	Early Childhood Education
EGPP	Employment Generation Programme for the Poorest
EMRD	Energy and Mineral Resource Division
EPI	Expanded Programme on Immunisation
EPZs	Export Processing Zones
ERD	Economic Relations Division
ESD	Education for Sustainable Development
ESP	Essential Service Package
FAO	Food and Agriculture Organisation

FD	Forest Department
FDI	Foreign Direct Investment
FFW	Food for Work
FIES	Food Insecurity Experience Scale
FTAs	Free Trade Agreements
FY	Financial Year
FYP	Five Year Plan
GAP	Global Action Programme
GATS	Global Adult Tobacco Survey
GCERF	Global Community Engagement and Resilience Fund
GCF	Green Climate Fund
GDP	Gross Domestic Product
GED	General Economic Division
GER	Gross Enrollment Rate
GHG	Greenhouse Gas
GLOF	Glacier Lake Outbursts Flooding
GNI	Gross National Income
GoB	Government of Bangladesh
GPEDC	Global Partnership for Effective Development Cooperation
GPI	Gender Parity Index
GRB	Gender Responsive Budgeting
GRS	Grievance Redress System
GSP	Generalised System of Preferences
HCWMP	health care waste management plan
HFO	Heavy Fuel Oil
HICs	High Income Countries
HIES	Household Income and Expenditure Survey
HLM	High-Level Meeting
HLPF	High Level Political Forum
HPNSP	Health, Population and Nutrition Sector Programme
HRH	Resources for Health
HSD	High Speed Diesel

ICT	Information and Communication Technologies
IDCOL	Infrastructure Development Company Limited
IHR	International Health Regulations
ILO	International Labour Organisation
IMF	International Monetary Fund
IORA	Indian Ocean Rim Association
IRF	Institutional and Regulatory Framework
IUCN	International Union for Conservation of Nature
IUU	Illegal, Unreported, and Unregulated
IWRM	Integrated Water Resources Management
JMP	Joint Monitoring Programme
LDCs	Least developed Countries
LFS	Labour Force Survey
LGD	Local Government Division
LGIs	Local Government Institutions
LMIC	low middle-income country
LNG	Liquefied Natural Gas
LNOB	Leaving No one Behind
LPG	Liquefied Petroleum Gas
MCP	Micro Credit Programmes
MDG	Millennium Development Goal
MFIs	Microfinance Institutions
MFN	Most Favored Nation
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MIS	Management Information System
MJ	Mega Joule
MMR	Maternal Mortality Ratio
MoA	Ministry of Agriculture
MoC	Ministry of Commerce
MoDMR	Ministry of Disaster Management and Relief
MoE	Ministry of Education
MoEWOE	Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment

MoHA	Ministry of Home Affairs
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MOLGRDC	Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs
MoWR	Ministry of Water Resources
MPA	Marine Protected Areas
MPI	Multidimensional Poverty Index
MRT	Mass Rapid Transit
MSMEs	Micro, Small and Medium Enterprises
MW	Megawatt
NAP	National Adaptation Plan
NAW	National Accounting Wing
NBCC	Nutrition Behaviour Change Communication
NCC	Narayanganj City Corporation
NCDs	Non-communicable Diseases
NDC	National Determined Contribution
NEET	Not in Education, Employment or Training
NFIS-B	National Financial Inclusion Strategy Bangladesh
NGOs	Non-Government Organisations
NIPORT	National Institute of Population Research and Training
NIS	National Integrity Strategy
NNS	National Nutritional Services
NPA	National Plan of Action
NPDC	National Policy on Development Cooperation
NPDM	National Plan for Disaster Management
NS	National Service
NSDES	National Strategy for Development of Education Statistics
NSSS	National Strategy for Social Protection
NTDs	Neglected Tropical Diseases
NTVQF	Vocational Qualifications Framework
ODA	Official Development Assistance

OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Institution
PA	Protected Areas
PEDP	Primary Education Development Programme
PMO	Prime Minister's Office
ppm	Parts per Million
PPP	Public-Private Partnership
PPP	Purchasing Power Parity
PSHT	Prevention and Suppression of Human Trafficking
PSMP	Power System Master Plan
R&D	Research and Development
REACT	Rights, Education, Access, Content, and Targets
RLI	Red List Index
RMGs	Ready Made Garments
ROSC	Reaching-out-of-School Children
RPP	Rental Power Producer
RTIs	Road Traffic Injuries
SCP	Sustainable Consumption and Production
SDGs	Sustainable Development Goals
SEDP	Secondary Education Development Programme
SESIP	Secondary Education Sector Investment Programme
SEZ	Special Economic Zones
SFDRR	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SHS	Solar Home System
SLR	Sea Level Rise
SME	Small and Medium-sized Enterprises
SPP	Social Protection Programmes
SSC	South-South Cooperation
SSNPs	Social Safety Net Programmes
SVRS	Bangladesh Sample Vital Statistics
SWAPNO	Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities
T&D	Transmission and Distribution

TB	Tuberculosis
TVET	Technical-Vocational Education and Training
U5MR	Under-Five Mortality Rate
UHC	Universal Health Coverage
ULGIs	Urban Local Government Institutions
UMIC	Upper Middle Income Country
UN	United Nations
UNAIDS	United Nations Programme on HIV/AIDS
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	United Nations Development Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNOSSC	United Nations office for South-South Cooperation
UNSTAT	United Nations Statistics Division
URP	Urban Resilience Project
USD/ US$	US Dollar
VAT	Value Added Tax
VAW	Violence against Women
VGD	Vulnerable Group Development
VNR	Voluntary National Review
WASAs	Water Supply and Sewerage Authorities
WASH	Water Sanitation and Hygiene
WB	World Bank
WCO	World Customs Organisation
WDI	World Development Indicators
WHO	World Health Organization
WHO FCTC	WHO Framework Convention on Tobacco Control
WPD	Women Development Policy
WTO	World Trade Organisation

নির্বাহী সংক্ষেপ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) প্রতিশ্রুতি হলো 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না'। সেই প্রতিশ্রুতি পরিপালনের পাশাপাশি এসডিজির অভীষ্টগুলো অর্জনে আরও কী কী প্রচেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়টিতেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০'-এ। মূলত ২০১৯ সাল নাগাদ অর্জনের ওপর ভিত্তি করে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, এ প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়ও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে ২০২০ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এ বছর ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রথম চার বছরের মূল্যায়ন যেমন দরকার, তেমনি ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়গুলো কর্মপদ্ধতিতে সন্নিবেশ ও সে অনুসারে চলার পথ নির্ধারণের বছর এটি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন সকল অংশীজনের কাছ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি ও তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণের অত্যাবশ্যকতা অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমরা যদি জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ কর্মসূচি ও কাউকে পেছনে ফেলে না রাখার অভীষ্ট অর্জন করতে চাই, তাহলে এই অনুধাবনগুলো অত্যন্ত জরুরি।

এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। অন্তত দুটি বিষয়ে 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এরই মধ্যে এসডিজি অর্জন প্রক্রিয়ার চার বছর অতিবাহিত হয়েছে, যা এ আন্তর্জাতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নকালের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং এ সময় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোন কার্যক্রমগুলো ফলদায়ক হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন রূপরেখা নির্ধারণের সন্ধিক্ষণ এখন। পাশাপাশি কী কী অগ্রগতি এখনো প্রয়োজন এবং সেসব ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, তা চিহ্নিত করতে হবে এখনই। দ্বিতীয়ত, ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জনে এখনো সময় আছে এক দশক। বিগত সময়ে কাজের অভিজ্ঞতা ও নীতি সংশ্লেষের শিক্ষা আগামী বছরগুলোয় এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রতিবেদনটি তৈরিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ এবং দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ ব্যাপকভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সহজলভ্য সকল সূচকের ক্ষেত্রে দেশীয় মাধ্যমিক (Secondary) উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপাত্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ। জাতীয় পর্যায়ে সহজলভ্য নয়, এমন ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার উপাত্তের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অনেক সূচকের ক্ষেত্রে উপাত্ত সহজলভ্য, কিন্তু উপাত্তের বড় ধরনের ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। উপাত্তের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সব সূচকের জন্য একই ভিত্তিবছর নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের (এমডিজি) শেষ বছর ছিল ২০১৫ সাল। ফলে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত কিছু সূচকের ক্ষেত্রে উপাত্ত সহজে পাওয়া গেছে। এ সকল উপাত্তের ক্ষেত্রে ২০১৪-১৫ সময়কে ভিত্তিবছর ধরা হয়েছে। ১২৭টি সূচকের ক্ষেত্রে উপাত্তের ভিত্তিবছর নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে ১০৮টি সূচকের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (এমঅ্যান্ডই ফ্রেমওয়ার্ক) তৈরি করা হয়েছে। কিছু সূচকের ক্ষেত্রে এখনো চূড়ান্ত মাইলফলক নির্ধারণ করা যায়নি। তবে সে সূচকগুলো গুণগত প্রকৃতির।

দেশে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে রয়েছে এ বিষয়ে গঠিত সর্বোচ্চ ফোরাম- এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি। জাতীয় পর্যায়ের এ সর্বোচ্চ কমিটিকে সহায়তা করছে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় পর্যায়ের মতামতের পাশাপাশি স্থানীয় অংশীজনদের মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেওয়া হয়। ২০১৮ সালের প্রতিবেদনের পর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যেসব উদ্যোগ সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলো হলো: (ক) মন্ত্রণালয়গুলো এসডিজি বাস্তবায়নে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে; (খ) এসডিজি অগ্রগতি পরিমাপক চালু করা হয়েছে; (গ) এসডিজির অভীষ্ট অর্জনে অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণসহ অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে; (ঘ) এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রথম জাতীয় সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে; (ঙ) উপাত্ত সমন্বয়ের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে; (চ) বাংলাদেশে জাতিসংঘের যেসব অঙ্গ সংস্থা কার্যরত, তাদের সঙ্গে সরকারের সহযোগিতা কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে; (ছ) এসডিজির স্থানীয়করণের জন্য সরকার ৪০টি (৩৯+১) সূচক অনুমোদন করেছে। ১৭টি অভীষ্টের জন্য ৩৯টি সূচককে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১১টি আছে জাতীয় সূচক। এ সূচকগুলোয় অগ্রগতি হলে তার ইতিবাচক প্রভাব অন্যগুলোর ওপরও পড়বে। এর বাইরে আরেকটি অতিরিক্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

এসডিজি অর্জনের চার বছর

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০)-তে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে উক্ত পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসডিজির অভীষ্টগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যাতে করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাস্তবায়ন এসডিজি অর্জনে সহায়ক হতে পারে। পরিকল্পনার মধ্যে একটি উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো বা ডেভেলপমেন্ট রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক (ডিআরএফ) দৃঢ়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ডিআরএফের ফলাফল ও লক্ষ্যসমূহ এসডিজির সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে।

গত চার বছর ধরে দেশে এসডিজির বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে, যে উদ্যোগে পাঁচটি 'পি' অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো–পিপল (জনসমষ্টি), প্রোসপারিটি (সমৃদ্ধি), পিস (শান্তি), পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব) ও প্ল্যানেট (ধরিত্রী)। এই সমগ্র বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন কাঠামোকে নির্দেশ করে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করাতে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে সম্পদ সংগ্রহের ওপর গুরুত্বারোপ, প্রযুক্তি জোরদার করা, সক্ষমতা গড়ে তোলা, বাণিজ্য নির্বিঘ্ন করা ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সংগতি বিধান। পদ্ধতিগত সংগতি বিধানের মধ্যে রয়েছে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন, উপাত্ত ও বহু-অংশীজন অংশীদারিত্ব এবং পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০), অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) ও দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-৪১) এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যের সন্নিবেশ ঘটানো; বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য লক্ষ্যভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন; সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রয়োগ।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

মূলত বেশ কয়েকটি উদ্যোগের সমন্বয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটেছে । এর মধ্যে অন্যতম পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন; মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement (APA)-তে এসডিজির সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলোর প্রতিফলন, নির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং তাদের সহায়তাকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ চিহ্নিতকরণ; নির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan-NAP) প্রস্তুতকরণ; প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি চিহ্নিত করে সে বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ; এসডিজির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) কাঠামো নির্দিষ্টকরণ এবং এসডিজির অর্থায়ন কৌশল গ্রহণ।

এসডিজি বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এসব পরামর্শ সভায় বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পেশাজীবী, শ্রমিক সংঘ, নারী সংঘ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে থাকেন। এসব পরামর্শ সভার প্রধান উদ্দেশ্য এসডিজি অর্জনে সকল অংশীজনদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা, আগ্রহ এবং অঙ্গীকার বাড়ানো।

'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নীতির গুরুত্বারোপ

আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী/অঞ্চলের কিছু প্রামাণ্য বিষয় ও তাদের পিছিয়ে থাকার জন্য দায়ী কিছু অন্তর্নিহিত নৈমিত্তিক অনুঘটকের ভিত্তিতে এসডিজির নিরিখে কতিপয় এজেন্ডা চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনতে প্রয়োজনীয় নীতিকাঠামো প্রণয়নে চারটি স্তম্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: (১) আয় বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; (২) শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত বিষয়ে ব্যবধান কমানো; (৩) সামাজিক ও জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ; এবং (৪) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা। এর বাইরেও 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' নীতি বাস্তবায়নে কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২৫) নির্দিষ্ট অধ্যায়ে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' কৌশলের অংশ হিসাবে সেগুলো সন্নিবেশ করা হবে। এ নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে এবং ক্রসকাটিং হিসাবে যেসব উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

নিশ্চিত করা, সামাজিক ও আয়বৈষম্য কমানো, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যথোপযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী/এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ।

বাংলাদেশে এসডিজির অগ্রগতি পরিমাপক

এসডিজি নামক ২০৩০ বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে ২০২০ সালে। কাজেই 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের সফলতা, চ্যালেঞ্জ ও কর্মোদ্যোগের ঘাটতির বিষয়ে হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরবে- যা ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

এসডিজি ১: দারিদ্র্য বিলোপ

জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাতের ভিত্তিতে জাতীয় দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে এ দারিদ্র্য ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে এবং ২০১৬ সালে তা নেমে আসে ২৪.৩ শতাংশে। সাম্প্রতিক প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, এ দারিদ্র্য ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া নিম্নদারিদ্র্য বা হতদারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার ১০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। অনুরূপভাবে সামাজিক সুরক্ষা জাল বিস্তৃতকরণ কার্যক্রমে আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতের মতো প্রধান প্রধান সেবা খাতে সরকারি ব্যয় লক্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। যদি আয় বৈষম্য বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সুফল বিপথে না যায়, তাহলে প্রত্যাশিত উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে (সাম্প্রতিক ইতিবাচক উন্নয়নের ভিত্তিতে) এসডিজি ১-এর মাইলফলক স্পর্শ করা সম্ভব হবে।

সরকার দেশে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক প্রকৃতি চিহ্নিত করে তার বিলোপ সাধনে তরান্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিঘাস সহিষ্ণু প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসডিজি ১ অর্জনে যেসব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে বড় আকারের বিনিয়োগ, 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' নীতি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষাসহ ও অন্যান্য কর্মসূচির বিস্তার, জেন্ডার সমতা অর্জন, গ্রামীণ রূপান্তর জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিতকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ। এক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো সম্পদ আহরণ; বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পদ সংহতকরণে বাধা দূর করা, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ, বিবিএসের পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানো, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভঙ্গুরতা থেকে রক্ষা এবং দারিদ্র্য বা অধিকতর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হওয়া থেকে জনগণকে রক্ষা করা। এসডিজি ১ অর্জনে বাংলাদেশ তার লড়াই অব্যাহত রাখবে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে–প্রয়োজনীয় কর্ম সৃজন, সামাজিক সুরক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যক্তি খাতের উপযোগী বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের অভিঘাত অপসারণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।

এসডিজি ২: ক্ষুধা মুক্তি

অপুষ্টি রোধে বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৭ সালে দেশে অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠীর হার নেমে আসে ১৪.৭ শতাংশে, ২০১৬ সালে যা ছিল ১৬.৪ শতাংশ। তবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের খর্বতা কমানোর ক্ষেত্রে। ২২ বছরের ব্যবধানে এটি অর্ধেকে নেমে এসেছে। ১৯৯৬-৯৭ সময়ে দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে খর্বকায় শিশুর (দীর্ঘকালীন অপুষ্টির ফল) হার ছিল ৬০ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৪ সালে কৃশতা বা ওয়েস্টিংয়ের শিকার শিশুর হার ছিল ১৪ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে তা ৯.৮ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে কম ওজনের শিকার শিশুর হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০০৭ সালে এ হার ছিল ৪১ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে তা ২২.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃষিমুখিতা সূচকে (Agricultural Orientation Index) ২০১৩ সালে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ছিল ০.২০। ২০১৬ সালে তা দ্বিগুণ হয়ে যায়, যা ইতিবাচক।

২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy-NSSS) গ্রহণ করে। সরকার বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে। এ দলিল এসডিজি-২-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সরকারের এ প্রচেষ্টা কৃষিসহ সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও বেশি অভিযোজনশীল ও গতিশীল হওয়ার বিষয়ে সহায়ক হবে। 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' বাস্তবায়ন করা হলে খাদ্য

উৎপাদন খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ভবিষ্যতে কৃষির প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাধা হিসেবে কাজ করার আশঙ্কা কম। তবে ফসল উৎপাদনে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে। যেমন: ফসলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ বৃদ্ধি, প্রটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া ও বহুমাত্রায় ক্রিয়াশীল পরজীবীর আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। এসডিজি ২ অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার এসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

এসডিজি ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

দেশে মাতৃমৃত্যুর হার নিরবচ্ছিন্নভাবে স্থিতিশীলভাবে কমে এসেছে এবং দক্ষ ধাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। একই সঙ্গে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর হার ২০১৯ সালে প্রতি হাজারে ২৮ জনে নেমে এসেছে, ১৯৯৫ সালে যা ছিল ১২৫ জন। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যু রোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জনের পরিক্রমায় অবস্থান করছে।

২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিতের হার ০.০১৫। যক্ষ্মা প্রতিরোধ যুদ্ধে বাংলাদেশ সফলভাবে ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে প্রতি লাখে যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যা ১৬১ জন। ২০১৫ সালে প্রতি হাজার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪.৩ জন। ২০১৯ সালে তা ১.৬ জনে নেমে এসেছে। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি কিশোরীদের বিবাহের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে। ১৯৯৯ সালে প্রতি হাজার নারীর মধ্যে কিশোরীকালে বিয়ে হতো ১৪৪ জনের। ২০১৯ সালে তা ৮৩ জনে নেমে এসেছে। নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসার, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও পরিণত হয়ে দেরিতে বিয়ের প্রবণতার ফলে ভবিষ্যতে কিশোরী বিবাহ হ্রাস পাওয়ার হার অব্যাহত থাকবে।

সরকার বর্তমানে চতুর্থ ধাপে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচির (এইচপিএনএসপি, ২০১৮-২২) বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি ৩ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বাংলাদেশের নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে ২০৩০ সাল নাগাদ যে তিনটি ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে, চতুর্থ এইচপিএনএসপি তার মধ্যে প্রথম। তবে শিক্ষার স্তরভেদে ও সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্য নীতিতে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য কমানো, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত ব্যয় (Out of Pocket Expense) কমানোর বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে চায় সরকার।

এসডিজি ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা

প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের অধ্যয়ন শেষে একজন শিক্ষার্থীর ন্যূনতম যে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জন করার কথা, তা পরিমাপে আন্তর্জাতিক সূচক রয়েছে। তবে সেই সূচকের জন্য যে ধরনের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত দরকার, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে তার ঘাটতি রয়েছে। যাহোক, ২০১৯ সালের বহুমাত্রিক গুচ্ছ জরিপ (Multiple Indicator Cluster Survey-MICS) অনুযায়ী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (গ্রেড) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা পঠনের ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে ২৫.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্ক কষার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে মাত্র ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। ওই জরিপে প্রত্যক্ষ করা যায়, এতে অংশ নেওয়া শিশুর ৭৪.৫ শতাংশই স্বাস্থ্য, শিক্ষণ ও মনঃসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক পথে আছে। এদের মধ্যে ছেলেশিশুর হার ৭১.৪ এবং মেয়েশিশু ৭৮ শতাংশ। এতে আরও দেখা যায়, শহরাঞ্চলের শিশুদের (৭৭.৯ শতাংশ) এমন উন্নয়নের ধারা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের (৭৩.৭ শতাংশ) তুলনায় বেশি। ব্যানবেইস ও MICS-এর হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জেন্ডার সমতা সূচকে (জিপিআই) বাংলাদেশ নির্ধারিত মানদণ্ড (১)-এর চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। টারশিয়ারি পর্যায়ের শিক্ষা স্তরেও যে বাংলাদেশ জেন্ডার সমতায় খুব পিছিয়ে আছে, তেমন নয়। এ স্তরে জিপিআই সূচকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত মান ০.৭২, যা ১-এর নিচে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলগামিতা বাড়াতে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ নিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে খাদ্য ও নগদ সহায়তা প্রদান এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তি ও টিউশন ফি কর্মসূচি। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে জিপিআই সূচকে উন্নতি করার মানসে সরকার এ ধরনের শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে নির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

পূর্ণবয়স্ক সাক্ষরতার হার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালে এ হার ছিল ৫৩ শতাংশ। ২০১৮ সালে তা ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়। এসডিজি ৪ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকা প্রায় ৪০ লাখ

শিশুর স্কুলে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এসব শিশুর সামনে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। যেসব শিশু এমন প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, তাদের মধ্যে রয়েছে- জীবিকার তাগিদে শিশুশ্রমের শিকার শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার ও দুর্গম এলাকার শিশু, বস্তিতে বসরবাসকারী শিশু এবং চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত পরিবারের শিশু। দরিদ্রদের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট সরকারি কর্মসূচি প্রয়োজন। দেশে উচ্চ মাত্রার আয়বৈষম্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা কেবল একটি রাজনৈতিক ও কারিগরি বিষয় হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত নয়। এমন পরিস্থিতি দরিদ্র পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

২০১৯ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ (Global Gender Gap Index-GGGI) সূচকে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। তাছাড়া রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে টানা পঞ্চমবার বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে। বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নে জোরালো অগ্রগতি নির্দেশ করে।

১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪ লাখ। ২০১৮ সালে তা ৮৭.৯০ লাখে উন্নীত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৯৮০ সালে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি ছিল ৩৯ শতাংশ, ২০১৭ সালে যা ৬৭ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ৪২ শতাংশ। এ পর্যায়ে পৌঁছানো শিক্ষার্থীদের মাত্র ৫৯ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে। টারশিয়ারি পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ ঝরে পড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকে। ফলে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ কমে যায়। বর্তমানে জাতীয় সংসদের ২১ শতাংশ সদস্য নারী। এছাড়া স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নারী সদস্যের অনুপাত ২৫ শতাংশের ওপরে।

২০১৯ সালের MICS জরিপে দেখা যায়, ২০-২৪ বছর বয়সি ১৫.৫ শতাংশ নারীর বিয়ে অথবা বাগদান হয়েছে ১৫ বছর বয়সের আগে। আর ৫১.৪ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের বয়সের আগে। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মেয়ে ও নারীরা তাদের বর্তমান ও পূর্বের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (স্বামী) বা ঘনিষ্ঠ নয়, এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নানা সহিংসতার শিকার হয়েছে এবং ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতার কাছে তারা বেশি মাত্রায় অসহায়।

এসডিজি ৫ অর্জনের ক্ষেত্রে নারী অধিকার রক্ষায় সরকার বেশকিছু আইনি ও নীতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বেশকিছু মৌলিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা ও সুযোগের অসমতার বিলোপ সাধন, বাল্যবিয়ে রোধ এবং নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন উৎসাহিতকরণ।

এসডিজি ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

২০১৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৪৭.৯ শতাংশ মানুষ নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ পরিষেবার সুযোগ পেয়েছে এবং ৯৮.৫ শতাংশ খানার সদস্যদের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত উৎস থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ ৮৪.৬ শতাংশ খানার সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়োনিষ্কাশন (স্যানিটেশন) সেবা গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। পাশাপাশি ৭৪.৮ শতাংশ খানার সদস্যরা জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ ও অভ্যাস (ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বা হাইজিন) গড়ে উঠেছে। এসডিজির অন্য অভীষ্টগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে এসডিজি ৬ অর্জনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দুটি উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি হলো পানির মানোন্নয়ন, অন্যটি পানির বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ। ঢাকা শহরের বুড়িগঙ্গা নদীর পানির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাজারিবাগের চামড়াশিল্প সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। হাজারিবাগের এ শিল্পের কারণে বুড়িগঙ্গার পানির মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হালদা নদীর সংরক্ষণ সময়ের আবর্তনে পানিসংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উদাহরণ হয়ে থাকবে।

এসডিজি ৭: সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি

জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়া বিদ্যুতের প্রায় ৬৮.৮৪ শতাংশ উৎপাদিত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ১৯.০৭ শতাংশ উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেল দিয়ে। এক্ষেত্রে জলবিদ্যুতের অবদান মাত্র ১.০৩ এবং সৌরবিদ্যুৎ থেকে আসে মাত্র ০.১৭ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি ব্যবহারের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজির হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মাত্র ৩.১৫ শতাংশ জ্বালানি উৎপাদিত হতো নবায়নযোগ্য উৎসের মাধ্যমে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) গৃহ সৌরবিদ্যুৎ পদ্ধতির (Solar Home System-SHS) আওতায় ৫১ হাজার ৩৬৪টি সৌর প্যানেল স্থাপন করেছে। এর বাইরে তারা ছাদের ওপরে ৩৭টি হাইব্রিড সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৪০টি সৌরচালিত সেচপাম্প, ১৪টি সৌর চার্জিং কেন্দ্র এবং ৪০টি মিটারিং পদ্ধতি স্থাপন করেছে। সৌর প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ ১৩.৩১ মেগাওয়াট (পি)।

এ অভীষ্টের অধীনে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্য হলো শতভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। সর্বশেষ হালনাগাদ উপাত্ত অনুযায়ী, ৯২ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ২০০০ সালে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ছিল ৭.২৪ শতাংশ মানুষের কাছে। ২০১৯ সালে তা ১৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

এসডিজি ৮: স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং শোভন কাজ

স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধির হাত ধরে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয় থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে সফলভাবে উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তিনটি সূচকেই ২০১৮ সালে প্রয়োজনীয় মান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দেশে মাথাপিছু প্রকৃত গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি লক্ষণীয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ হার ছিল ৫.১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা ৬.৯১ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে বর্তমানে করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনায় বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

২০১৭ সালে দেশে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মে নিয়োজিতদের ৮৫.১ শতাংশই ছিল অনানুষ্ঠানিক খাতে, যাদের কর্মের আইনি সুরক্ষা ও চাকরি সম্পর্কীয় অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা নেই। দেশে কর্মে নিয়োজনের যোগ্য মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার দীর্ঘদিন ধরে চার শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে। তবে শিশুশ্রম কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তারপরও এখনো প্রায় ১২.৮০ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, উক্ত সময় ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সিদের মধ্যে ২৯.৮ শতাংশ শিক্ষা, কর্ম বা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণে (NEET) নিযুক্ত ছিল না। এমন বাস্তবতায় বর্তমানে যেসব সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নারীদের মধ্যে উচ্চ মাত্রার বেকারত্ব, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকা, অনানুষ্ঠানিক চাকরির বাজার, দক্ষতার চাহিদা ও জোগানের মধ্যে অসংগতি, বাল্যবিয়ে এবং শ্রমিকদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত নানা সমস্যা।

এসডিজি ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

দেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার ক্রমাগতভাবে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৪.২১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যা ছিল ২২.৮৫ শতাংশ। তৈরি পোশাক, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ ও চামড়া খাতের মতো প্রধান শিল্পগুলোর প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে বহুমুখীকরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ১,৬০০-এর অধিক প্রকারের পণ্য রপ্তানি করে। আর প্রবৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করে বড় ও মাঝারি শিল্পগুলো।

সরকার অভিঘাত সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে আসছে। পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই শিল্পায়ন উৎসাহিতকরণ ও উদ্ভাবন কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা দানের মতো বিষয়কে নীতি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সড়ক খাতের জন্য তৈরি মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০) এ খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগের বিষয়টি নির্দেশ করে। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো অবকাঠামো সম্পদের মূল্য সংরক্ষণ, আন্তঃসংযোগ বাড়ানো ও সড়ক নিরাপত্তার উন্নয়ন।

দেশের টেলিযোগাযোগ পদ্ধতির আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের উপাত্ত অনুযায়ী, দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহকসংখ্যা ১৫.৭৫ কোটি। ২০১৮ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফলভাবে প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করে। দেশের প্রায় শতভাগ মানুষ টু-জি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ২০২০ সালে এ মাইলফলক অর্জনের লক্ষ্য ছিল, যা ২০১৯ সালের জুনেই অর্জিত হয়েছে। একই সময়ে থ্রি-জি ও ফোর-জি সংযোগের হার ৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়। এ খাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশ গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের উদ্ভাবন কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে।

এসডিজি ১০: অসমতার হ্রাস

বাংলাদেশে ভোগের অসমতার তুলনায় আয়ের অসমতার মাত্রা অনেক বেশি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্য বাড়লেও ভোগ বৈষম্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা (Official Development Assistance-ODA) ও সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ওডিএ পেয়েছে ৬৩৬.৯০ কোটি মার্কিন ডলার। একই সময়ে এফডিআই এসেছে ৩৬১.৩৩ কোটি ডলার।

অসমতা কমানোর মানসে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) ২০২০ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দেশের মোট জিডিপির ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে মোট জিডিপির ১.২ ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ২.৩ শতাংশ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সুশাসন জোরদার করা, ব্যবস্থাপনা ও সেবা সরবরাহের সক্ষমতা বাড়ানো এবং পিছিয়ে পড়া এলাকায় জরুরি সেবা বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

অসমতা কমনোর প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা এবং এ লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনেকগুলো উন্নয়ন কৌশল এসডিজির সঙ্গে সমন্বয় করেছে, যার ওপর ভিত্তি করে এসডিজি বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের অবশিষ্ট পর্যায়গুলো ২০৩০ সাল পর্যন্ত অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আবর্তিত হবে। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করা এবং অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষায় সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬' অনুমোদন করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) দোহা রাউন্ড আলোচনার ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে শূন্য শুল্কের বিধান নির্ধারণ করা হয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতেও তা বলবৎ রয়েছে।

এসডিজি ১১: টেকসই শহর ও জনপদ

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে এবং এসব বস্তিতে যত মানুষ বসবাস করে, শহরের মোট জনসমষ্টির অনুপাতে সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও বস্তি এলাকায় মৌলিক পরিষেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকার তাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করছে। এ বিষয়ে একটি কৌশলগত নগর পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও চলমান। শহরের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে নগর পরিকল্পনার মৌলিক সুপারিশগুলো দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে সন্নিবেশ করা হয়েছে। টেকসই নগর ও জনপদ গড়ে তোলার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০৩৫ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসমষ্টির প্রায় অর্ধেক শহরে বাস করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে নগরাঞ্চলে বসবাসকারীদের ৬০ শতাংশই বাস করে চারটি বড় মহানগরে। এগুলো হলো: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী। ঢাকা বর্তমানে মারাত্মক বায়ুদূষণের শিকার। এছাড়া জলাবদ্ধতা, বিলম্বে বর্জ্য অপসারণ ও যানজট সমস্যা তো আছেই।

এসডিজি ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

ভোগের পর্যায়ে খাদ্যক্ষতি ও অপচয় বাংলাদেশের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামীণ পর্যায়ে খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ৫.৫ শতাংশ। ৩ শতাংশ অপচয় হয় ক্রয় ও প্রস্তুতকরণ পর্যায়ে; ১.৪ শতাংশ অপচয় হয় পরিবেশন পর্যায়ে এবং ১ দশমিক ১ শতাংশ অপচয় হয় খাবারের থালায়। পাশাপাশি ফসল উত্তোলন ও উত্তোলন পরবর্তী পর্যায়ে নষ্ট হয় প্রায় ১০ শতাংশ ফসল।

শহরগুলোতে বর্তমানে কঠিন বর্জ্য ও শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বায়ুদূষণ রোধে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ। কাজেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আধুনিক পরিচ্ছন্ন শহর (Smart City) গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যশোর শহরে সম্প্রতি প্রথমবারের মতো সমন্বিত ভাগাড় ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিদিনকার নগরবর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন করা হচ্ছে। সিলেট মহানগরীও 'সবুজ শহর' ধারণা প্রবর্তন করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় নাগরিক উদ্যোগে নগরীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে সার তৈরি করা হচ্ছে।

এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম

নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে প্রতি লাখ মানুষের বিপরীতে মৃত্যুবরণ, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা বছরের পর বছর ধরে কমতির দিকে। বর্তমানে প্রতি লাখে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১২,৮৮১ জন। ২০৩০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দেড় হাজারে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। 'দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০' ও অনুস্বাক্ষর করা অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রটোকলের সঙ্গে সংগতি রেখে সরকার 'বাংলাদেশের দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন কৌশল (২০১৬-২০৩০)' প্রণয়ন করেছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রশমনে গৃহীত National Determined Contribution (NDC) প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্ব-উদ্যোগে কার্বন নির্গমন ৫ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। একই সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আরও ১৫ শতাংশ কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। অধিকন্তু সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan-BCCSAP) হালনাগাদ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund-GCF) থেকে অর্থায়ন পেয়েছে। এ তহবিল পরিচ্ছন্ন (ধোঁয়াবিহীন) রান্না কর্মসূচি, উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীদের অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানো এবং জলবায়ুর অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। তবে দুই দশক ধরে এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, কোভিড-১৯ মহামারির ফলে তা মারাত্মক হুমকিতে পড়েছে।

এসডিজি ১৪: জলজ জীবন

বঙ্গোপসাগরের 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' অঞ্চলে চারটি এলাকা চিহ্নিত করে বাংলাদেশ সফলভাবে উপকূলীয় সংরক্ষিত এলাকার আওতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল এলাকায় সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষা ও মাছ ধরার অবৈধ নৌযান পাকড়াও করার পাশাপাশি উপকূলে সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ ও সরঞ্জাম প্রয়োজন। ইলিশের অভয়াশ্রমগুলোর সুরক্ষায়ও তা গুরুত্বপূর্ণ।

যাহোক, দেশের সিংহভাগ মৎস্যজীবীর মৎস্য আহরণ পদ্ধতি সনাতনী ধাঁচের এবং তারা ছোট ছোট নৌকা দিয়ে সমুদ্র উপকূলে মৎস্য আহরণ করে। প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে যখন মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে, তখন এসব জেলে সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে জ্বালানিসহ অন্যান্য সম্পদের অনুসন্ধান, পর্যটন ও জাহাজ চলাচল প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় প্রয়োজন। মৎস্য-সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ করা; পরিমিত সম্পদ আহরণ নিশ্চিত এবং অবৈধ, অজ্ঞাত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

এসডিজি ১৫: স্থলজ জীবন

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র গুচ্ছভিত্তিক বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভূভাগ (স্থলজ), জলাভূমি এবং উপকূল ও সমুদ্রকেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্র। বংলাদেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক নিমজ্জন ভূমি। জলাভূমি বাদে মোট আয়তনের ১৫ শতাংশ বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত। ২০৩০ সাল নাগাদ বনভূমির পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি প্রধান লক্ষ্য হলো বনভূমিতে বৃক্ষের ঘনত্ব বাড়ানো। সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গেছে, সংরক্ষিত এলাকায় স্থলজ ও স্বাদুপানির জীববৈচিত্র্যের অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধির ধারায় রয়েছে। ২০১৩-১৪ সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১.৭ শতাংশ। ২০১৮ সালে তা ৩ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ যা ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা

নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু বাংলাদেশ ২০১৪ সালে দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শকুনের জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গাছ কাটায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২০২২ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের অধিকতর সংরক্ষণ নিশ্চিতকল্পে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এসডিজি ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মতো উদ্যোগ এসডিজি ১৬ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করে। দেশে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। মানব পাচারের সংখ্যাও কমে এসেছে। ২০১৫ সালে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার মানুষের হার ১.৮ জনে নেমে এসেছে। এর মধ্যে ১.৪ জন পুরুষ এবং ০.৪ জন নারী। মানব পাচারের সংখ্যাও ২০১৫ ভিত্তি বছরের তুলনায় কমে এসেছে। এ বছর প্রতি ১ লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে পাচারের শিকার হয়েছিল ০.৮৫ জন। ২০১৭ সালে তা দশমিক ০.৫৮ জনে নেমে আসে। কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সরকার এরই মধ্যে সুশাসনকেন্দ্রিক কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি দপ্তরগুলোতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চালু করা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি (জিআরএস) অনুসরণ করা।

এসডিজি ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

এসডিজি-১৭ অভীষ্টের বেশিরভাগ সূচকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে রয়েছে। জিডিপির অনুপাতে যে মাত্রায় প্রয়োজনীয় সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিল, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে রাজস্ব প্রাপ্তি তার চেয়ে বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব বাড়ানোর জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে করদাতার সংখ্যা বাড়ানো এবং বিচক্ষণ কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন। বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও পরিমিত প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জাতীয় বাজেটের অনুপাতে এ সহায়তার হার কমেছে। তবে এফডিআই ও প্রবাসী আয় প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন।

এসডিজির অর্জন অনেকাংশেই নির্ভর করবে বহিঃউৎসসহ বিভিন্ন উৎস হতে সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর। বহিঃউৎস এখানে অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সময়োপযোগী ও পর্যাপ্ত সহায়তা একান্ত আবশ্যক। বিশেষ করে বাণিজ্য ও ব্যক্তি খাতের উন্নয়ন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধাগুলো চিহ্নিত করে তার অপসারণ এবং করফাঁকি ও কর পরিহার রোধকল্পে এ সহায়তা প্রয়োজন।

পাশাপাশি স্বচ্ছতা বাড়ানো, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্জন, সরবরাহকারী, মধ্যস্বত্বভোগী ও সুবিধাভোগীর বহুমাত্রিক কর্মকুশলতা নিশ্চিত করা এবং নিজেদের অগ্রাধিকার বাছাইয়ে সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশের উন্নয়নকাজে অর্থায়ন পদ্ধতির খুঁটিনাটি নতুনভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ভবিষ্যৎ করণীয়

প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতির বিষয়ে সরকার সজাগ রয়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী ও গুণগত উপাত্ত প্রস্তুতকরণ ও তা হালনাগাদ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' অগ্রাধিকারের সমন্বয়সাধন ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সংস্কার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবে, যা এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা অনুধাবন ও সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন থাকতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি এ প্রতিবেদন বাংলাদেশের সকল অংশীজনের কাছ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণের অত্যাবশ্যকতা অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডায় স্বাক্ষর করে এটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মুখে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে টেকসই উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় রূপরেখা ও কমসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

অধিকন্তু এ প্রতিবেদন এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সঠিক পথে পরিচালনের লক্ষ্যে অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া জোরদার করার ক্ষেত্রে এ প্রতিবেদন প্রেরণা জোগাবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো এসডিজির নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ব্যবহার করে প্রকৃত অগ্রগতি তুলে ধরা (অর্জনে পিছিয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করা), যাতে পরবর্তীকালে বিদ্যমান দুর্বলতা চিহ্নিত করে সময়োপযোগিতা ও গুণগত মান নিশ্চিত এবং পুনরাবৃত্তি ও বাহুল্য বর্জন করে উপাত্ত তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

গত চার বছরে দেশে এসডিজি অর্জনে অগ্রগতি হয়েছে সত্য, তবে এক্ষেত্রে অসম অগ্রগতি বিদ্যমান। এমডিজি অর্জনে যেসব বিষয় অসম্পূর্ণ ছিল, সেগুলো সম্পন্ন করার সুযোগ এনে দিয়েছে এসডিজি। বিশেষ করে এসডিজি কিছু বিষয় অর্জনের জন্য পুনরায় তাগিদ দিচ্ছে, যা এমডিজিতেও ছিল। এগুলো হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসৃজন, শিল্পায়ন,অসমতা বিলোপ, সুশাসন, শান্তি ও ন্যায়বিচার এবং টেকসই বাস্তুসংস্থান। এর বাইরে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতির জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে।

এ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, ২০২০ সাল নাগাদ পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যুহার যে পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে। তামাক সেবনের ব্যাপকতা কমিয়ে আনা ও পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন সঠিক পথে এগোচ্ছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য কমার হারও প্রত্যাশিত পথে অগ্রসরমাণ। সরকার সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং এর আওতা সম্প্রসারণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা এরই মধ্যে পূরণ হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এরই মধ্যে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মূল্য সংযোজনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরই মধ্যে এ প্রতিশ্রুতির ৯৬ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বেশকিছু চ্যালেঞ্জও চিহ্নিত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে স্থিতিশীলতা অর্জিত হলেও আয় বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করেনি। যদিও স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তথাপি সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এখনো অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় গুণগত মান নিশ্চিত করাও বেশ কঠিন। দ্রুতগতিতে নগরাঞ্চলের প্রসার ঘটায় নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোও দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ুগত দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের বিষয়টিও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া এসডিজির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ, অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, উপাত্তের ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' নীতির বাস্তবায়নও প্রধান কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ। এজন্য এসডিজি অর্জনে সঠিক পথ অনুসন্ধানে অংশীজনদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ আয়োজনের বিষয়ে এ প্রতিবেদনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সরকার এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য ফলাফলভিত্তিক ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণে কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ ও পরিবর্তনশীল নিয়মকানুনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বাজারভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা ও মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসডিজি অর্জনের সকল পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সকল পর্যায়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার গুরুত্বও অপরিসীম।

২০৩০ এজেন্ডা অর্জনে বাংলাদেশে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বিত বৈদেশিক সহায়তা প্রয়োজন। বাস্তবায়ন উপায় হিসাবে আন্তর্জাতিক সহায়তার বিষয়ে এসডিজির একাধিক অভীষ্টে নির্দেশনা আছে, বিশেষ করে এসডিজি ১৭-তে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। তাছাড়া উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন বিষয়ে আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা (AAAA)-তেও সামষ্টিক সহায়তার বিষয়টি উঠে এসেছে। সহযোগিতার এ ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে: অর্থ, প্রযুক্তি, সক্ষমতা বিনির্মাণ, বাণিজ্য, নীতি সমন্বয়, তথ্য-উপাত্ত, পরিবীক্ষণ এবং অংশীজনের অংশগ্রহণ

এ প্রতিবেদনে সারাংশে যে বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো বাংলাদেশে এসডিজির ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়কারী সংস্থাগুলো ও ফলাফলভিত্তিক প্রক্রিয়ার অভিযোজন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের কার্যকর ক্ষমতায়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অংশগ্রহণ আবশ্যক। এ মুহূর্তে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সক্ষমতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে অর্থায়ন, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহির ঘাটতি চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধান করা প্রয়োজন। এসডিজি অর্জনে অতিরিক্ত যে অর্থ প্রয়োজন হবে, তার জোগান নিশ্চিত করতে করজালের আওতা বাড়ানো, কর কাঠামোয় সংস্কার, উদ্ভাবনী কর ব্যবস্থা প্রচলন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) অবারিত করা এবং বৈশ্বিক/আঞ্চলিক সহায়তার আওতায় বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা বাড়ানো ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। এ সহযোগিতার পাশাপাশি বাংলাদেশের সীমিত প্রকৌশল সক্ষমতা ব্যবহার করে প্রযুক্তি সহজীকরণের বিষয়ে টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এ ধরনের সহযোগিতা পরিসংখ্যানগত সামর্থ্যের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন কৌশল, জাতীয় স্বতঃপ্রণোদিত পেনশন প্রকল্প, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং ক্ষুদ্র চাষিদের মধ্যে বাণিজ্যিক কৃষির প্রচলন ঘটাতে বাংলাদেশের বাড়তি অর্থায়ন সহায়তা প্রয়োজন হবে। সরকারি কর্মচারী, উদ্যোক্তা, পেশাজীবী ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সকল পর্যায়ে সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, অপচয় হ্রাস, আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ও সেগুলোর টেকসহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর আবশ্যক।

'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' প্রণয়ন দেশীয় পর্যায়ে ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের প্রতিফলন ঘটেছে। এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যেসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে, তা হলো এর আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ; বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।

ভূমিকা অধ্যায়

বাংলাদেশ: এসডিজি বাস্তবায়নে চার বছর

পটভূমি

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) টেকসই বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন, সমন্বিত ও রূপান্তরমুখী দর্শন। এ অভীষ্ট অর্জন করতে হলে একটি দেশের সরকার, ব্যক্তি খাত, সুশীল সমাজসহ প্রত্যেককে তার জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়া সবাইকে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার পাশাপাশি স্থায়িত্বশীল বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এসডিজির লক্ষ্যগুলো অর্জনে সরকার একটি সহায়ক ও পরিবীক্ষণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সুশীল সমাজ এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে জোরালো ভূমিকা রাখছে; বিজ্ঞজন (একাডেমিকস) ও গবেষকরা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন দিয়ে সহায়তা করছেন, আর ব্যক্তি খাত মূল বাস্তবায়ন কাজে সরাসরি যুক্ত হয়ে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। এই ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্বের বণ্টন প্রমাণ করে, এ বিশাল উন্নয়ন অভীষ্ট একা অর্জন করা সম্ভব নয়। বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশীদারিত্ব একদিকে যেমন জবাবদিহিমূলক হতে হবে, অন্যদিকে তা যেন মানুষ ও ধরিত্রীর কল্যাণ সাধন করে, তা খেয়াল রাখতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে ২০৩০ কর্মসূচি

টেকসই উন্নয়নের জন্য গৃহীত ২০৩০ এজেন্ডার উদ্বোধনী ঘোষণায় বিশ্বনেতারা বলেছিলেন, 'আমরা যেহেতু একত্রে এই মহান যাত্রায় শামিল হয়েছি, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি এ অভিযাত্রায় কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না। ব্যক্তিমানুষের আত্মমর্যাদার স্বীকৃতিসহ আমরা চাই সবার জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যের সফল রূপায়ণ–সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল মানুষের জন্য এবং সমাজের প্রতিটি অংশের জন্য। যে সবার পেছনে রয়েছে, তার কাছে সবার আগে পৌঁছাতে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে।' (জাতিসংঘ, ২০১৬)

এই 'কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না' প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্য হলো কতিপয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমস্যা মোকাবিলা করা। সেই সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে সব আঙ্গিকের চরম দারিদ্র্য। যারা সবচেয়ে পেছনে পড়ে রয়েছে (আপেক্ষিক ও চরম), তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাগ্রে উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে দারিদ্র্য থেকে উত্তোরণ লাভ করে সাফল্য অর্জনকারী মানুষদের পাশাপাশি তারাও এগিয়ে যেতে পারে। যারা সবচেয়ে পেছনে অবস্থান করছে, তাদের জন্য দ্রুত বাস্তবায়নোপযোগী (ফাস্টট্র্যাকভিত্তিক) কর্মপন্থা গ্রহণের পাশাপাশি ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

২০৩০ এজেন্ডায় ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুধা, অসমতা ও দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন; জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ; স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় প্রবেশগম্যতার উন্নয়ন ঘটানো; মানুষ ও ধরিত্রীর কল্যাণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা। সুযোগ ও গুরুত্ব বিবেচনায় এসডিজি একটি অভূতপূর্ব উদ্যোগ। এই এজেন্ডা সকলের জন্য টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, টেকসই নগরায়ণ, উদ্ভাবন, অগ্রগতির পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সৃষ্টি এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

১৭টি অভীষ্টের প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সব মিলে এমন লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যা ১৬৯টি, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো সর্বজনীন এবং এগুলো অর্জনের জন্য সমাজের প্রতিটি অঙ্গের- সরকার, ব্যবসায়ী মহল, সুশীল সমাজ, সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশ ও এসডিজি

২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুতকরণের বৈশ্বিক উদ্যোগে বাংলাদেশ ছিল খুবই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দেশ। আর তাই দেশটি এ এজেন্ডার বাস্তবায়নও শুরু করে ঘোষণার ঊষালগ্নে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় এসডিজিকে সম্পৃক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে (7FYP, 2016-2020) এসডিজির সমন্বয় ঘটানো হয়। পাশাপাশি সপ্তম পরিকল্পনায় বিভিন্ন অগ্রাধিকার নির্ধারণে এসডিজিকে বিবেচনায় রাখা এবং পরিকল্পনাটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে সেগুলোর বাস্তবায়ন এসডিজি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি সপ্তম পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়নে ফলাফলভিত্তিক সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডসম্পন্ন একটি মূল্যায়ন ও

পরিবীক্ষণ কাঠামোও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়, যা Development Results Framework (DRF) নামে পরিচিত। ডিআরএফের ফলাফল ও লক্ষ্যগুলো এসডিজির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে। ডিআরএফে যেসব বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে–সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিলোপ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়োনিষ্কাশন, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও সমুদ্রসম্পদ, জেন্ডার ও অসমতা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), নগর উন্নয়ন, সুশাসন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

এসডিজি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন কাজ তদারকির জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার সভাপতি করা হয়েছে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি-সংক্রান্ত) প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়-কে, তিনি এসডিজি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সমন্বয় করবেন। ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের সমন্বয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা কমিটি গঠিত। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে। জিইডি নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয়ের পাশাপাশি পরিবীক্ষণের ভিত্তিতে হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।

এরই মধ্যে কমিটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বৈশ্বিক অভীষ্টসমূহের সংগতিবিধান সম্পন্ন করেছে। মন্ত্রণালয়গুলো নির্ধারিত অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো চিহ্নিত করে খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (অচঅ) তার প্রতিফলন সন্নিবেশ ঘটিয়েছে।

মন্ত্রণালয়সমূহে এসডিজির ম্যাপিং

যেহেতু এসডিজির লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওপর ন্যাস্ত, তাই নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে তারা যৌথভাবে দায়বদ্ধ। প্রত্যেক লক্ষ্যের নির্দিষ্ট দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বণ্টনের নিমিত্ত অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলোর ম্যাপিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে একটি লক্ষ্য অর্জনে প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা সংস্থার ওপর নেতৃত্বের ভূমিকা অর্পণ করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্বে থাকা মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহায়তার দায়িত্বে থাকবে একটি সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ। অন্য যেসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে, তারা সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। কর্মপরিকল্পনা কার্যবিধি অনুসারে এসডিজি ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে, যা পরিকল্পনার সময়কাল, বিদ্যমান নীতিকাঠামো এবং সম্পাদিত কর্ম মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচককে নির্দেশ করে।

কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

ম্যাপিং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলো নিজেদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রাসঙ্গিক অভীষ্ট বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালি ও নেতৃত্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এসডিজি অর্জনে জিইডি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাপ) বা National Action Plan (NAP) প্রস্তুত করেছে। এটি এসডিজি অর্জনে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকা ৪৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় করে থাকে। প্রয়োজন মাফিক ধারাবাহিক পরামর্শ সভা, পর্যালোচনা ও প্রাপ্ত প্রতি-উত্তর (Feedback) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়। যেসব চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচি এসডিজির নির্দিষ্ট অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখছে, ন্যাপ-এর তালিকায় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ে নতুন কী কী প্রকল্প ও কর্মসূচি নেওয়া যায়, তা চিহ্নিত করে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন সম্ভাব্য যেসব নীতি বা কৌশল দরকার হতে পারে, তাও NAP-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এসডিজি অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাকে তাদের নির্দিষ্ট বিনিয়োগ অধিক্ষেত্র নির্ধারণ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে NAP-এ। একই সঙ্গে অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কর্মের মূল্যায়ন করে। ন্যাপ একটি জীবন্ত ও চলমান দলিল, যা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তৎপরবর্তী পরিকল্পনার প্রস্তুতিকালে সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে।

উপাত্তের ঘাটতি পর্যালোচনা

দেশের প্রচলিত নীতিমালা ও কার্যক্রমে এসডিজি ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুণবাচক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর রূপান্তর ঘটাতে হলে যথাযথ পরিবীক্ষণ, অবহিতকরণ ও যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অবশ্যই অগ্রগতির হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে সূচকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ সূচক প্রাসঙ্গিক অগ্রগতির ধারা বিষয়ে উপলব্ধি, টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও গৃহীত পদক্ষেপগুলোর উন্নতি সাধনে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে নতুন করণীয় নির্ধারণে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বার্তা দেয়। বাংলাদেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় পর্যায়ে এসডিজির সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে বিদ্যমান পরিমাপ পদ্ধতির আলোকে। তবে এসডিজির নিরিখে সেগুলো পরিমার্জন করা হয়েছে।

এসডিজির অগ্রগতি পরিবীক্ষণে প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও পরিসংখ্যানের চাহিদা পূরণের জন্য দুটি পৃথক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো (বিবিএস), অন্যটি নিয়েছে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)। দুটি সংস্থার নেওয়া উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান বাস্তবতায় সহজলভ্য উপাত্তগুলো চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজন কিন্তু নেই, এমন উপাত্তগুলোর প্রকৃতি ও ঘাটতির মাত্রা পরিমাপ করা। এর আলোকে ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডা বাস্তবায়নে নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করাও এ উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এরই অংশ হিসেবে জিইডি ২০১৭ সালে দেশে বিদ্যমান উপাত্তের ভাণ্ডার পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়। এতে বিভিন্ন উৎসে কোন কোন উপাত্তের লভ্যতা বিদ্যমান এবং নতুন উপাত্ত তৈরির মাধ্যমে কোন ঘাটতিগুলো পূরণ করতে হবে, সেসব বিষয় চিহ্নিত করা হয়। এ কাজে বিবিএসসহ উপাত্ত প্রণয়নকারী সকল সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জিইডির পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সূচকগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (১) যেসব সূচকের উপাত্ত বিদ্যমান বা সহজলভ্য; (২) যেসব সূচকের ক্ষেত্রে আংশিক উপাত্ত আছে, বা আংশিক সহজলভ্য। অর্থাৎ, বিদ্যমান শুমারি বা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো এসডিজির সূচকের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করতে হলে সেগুলোর কিছু পরিমার্জন, সংযোজন ও পর্যালোচনার প্রয়োজন পড়বে এবং (৩) কিছু সূচকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে। এসব উপাত্ত সৃষ্টির জন্য নতুন শুমারি বা জরিপের প্রয়োজন পড়বে। সম্পূর্ণ উপাত্তগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৭০টি সূচক (২৯ শতাংশ) উপাত্ত প্রথম শ্রেণির। অর্থাৎ, তাৎক্ষণিকভাবে এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রস্তুত ছিল। ৬৩টি সূচক (২৬ শতাংশ) তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ, এগুলোর জন্য কোনো উপাত্ত প্রস্তুত ছিল না। আর ১০৮টি সূচক (৪৫ শতাংশ) ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ, বিদ্যমান উপাত্ত পরিমার্জন করে তা সূচকের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এতে বোঝা যায়, উপাত্তের প্রাপ্যতা, সময়োপযোগিতা ও গুণগত মান এসডিজির কার্যকর পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছে। পর্যালোচনায় প্রাপ্ত এ চিত্র নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছে।

অন্যদিকে বিবিএস উপাত্তের ঘাটতি পর্যালোচনায় ২০১৬ সালে একটি অনুশীলন হাতে নেয়। এতে তারা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার Development Results Framework (DRF) ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উপাত্তের ভিত্তি ও রেফারেন্স বছর নিয়ে জটিলতার বিষয়টি চিহ্নিত করে। বিবিএসের পর্যালোচনায়ও উপাত্তের তিনটি শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়। এগুলো হলো–বিবিএসে লভ্য, বিবিএসের বাইরে অন্য সংস্থার কাছে লভ্য এবং যে উপাত্তের উপস্থিতি বর্তমানে নেই বা লভ্য নয়।

বিবিএস নির্ধারিত প্রথম শ্রেণির উপাত্ত তাৎক্ষণিকভাবে নিজেরাই সরবরাহ করতে পারবে। আর দ্বিতীয় ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে তা এসডিজির জন্য ব্যবহার-উপযোগী করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবিএস-এর তত্ত্বাবধানে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে। আর সর্বশেষ ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উপলব্ধি হলো সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতি মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় একটি সুদৃঢ় তথ্যসূত্র ও ভিত্তিবছর নির্ধারণ করা সম্ভব।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

দেশে এসডিজির বাস্তবায়ন ও অর্জন অগ্রগতি অনুসরণের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) প্রস্তুত করা হয়েছে (জিইডি, ২০১৮)। ২০৩০ সাল পর্যন্ত এ কাঠামোর মাধ্যমে অগ্রগতি অনুসরণ করা হবে। প্রথমত, এসডিজির অগ্রগতি বিষয়ে ধারণা পেতে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও সেগুলোর অন্তর্নিহিত সক্ষমতা পরিমাপ করা দরকার। তবে এ পরিমাপের প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সূচকগুচ্ছ বহুমাত্রিক ও জটিল। অনেক ক্ষেত্রে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রাটির বিস্তৃতি অনুসারে অনেক ধরনের সংখ্যা প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত, বিবিএস অর্থনীতির অনেকগুলো বিষয়ের উপাত্ত প্রস্তুত করে না। ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও এসডিজির অনেক সূচকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত মিলছে না। তৃতীয়ত, সাধারণত বিবিএস অথবা অন্যান্য সরকারি সংস্থা নির্দিষ্ট সময় অন্তর জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে বেশিরভাগ উপাত্ত প্রস্তুত করে। সচরাচর পাঁচ বছর অন্তর খানা আয়-ব্যয় জরিপ (হায়েস) বা Household Income and Expenditure Survey (HIES) ও তিন বছর অন্তর বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা (বিডিএইচএস) পরিচালিত হয়। বিবিএস প্রান্তিক ভিত্তিতে শ্রমশক্তি জরিপের ফল প্রকাশ করে। প্রথাগতভাবে তিন বছরের বিরতি দিয়ে এক্ষেত্রে নতুন জরিপ চালানো হয়। চতুর্থত, ঘনঘন জরিপ পরিচালনা ও বহুমাত্রিক উপাত্ত (যেমন: ভৌগোলিক অবস্থান বা স্পেস সংক্রান্ত, জেন্ডার, বয়সভিত্তিক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও কর্মসংস্থানের অবস্থা সংক্রান্ত উপাত্ত) প্রস্তুত করতে বাড়তি অর্থ ও জনবল, বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দরকার পড়ে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্কটি লভ্য প্রত্যেক সূচকের জন্য ভিত্তিবছর ও এসডিজির শেষ বছর অর্থাৎ ২০৩০ সালের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করে। এ সময়ের মধ্যে ২০২০ ও ২০২৫–এ দুটি মাইলফলক থাকবে, সেগুলোর উপাত্তও থাকবে ফ্রেমওয়ার্কটিতে। এক্ষেত্রে দ্রুত ও সহজে উপাত্তের উৎস জানার সুবিধার্থে উপাত্ত প্রস্তুতকারী সংস্থা ও তাদের নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রকাশনার নাম উল্লেখের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপাত্তের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন সব সূচকের জন্য একই ভিত্তিবছর নির্ধারণ করা যায়নি। তাই এমডিজির শেষ বছর, অর্থাৎ ২০১৪-১৫ সময়ে যেসব সূচকের জন্য উপাত্ত পাওয়া গেছে, সেগুলোর জন্য ওই বছরকেই ভিত্তিবছর বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব সূচকের জন্য ২০১৪-১৫ বছরের উপাত্ত পাওয়া যায়নি, সেগুলোর বেলায় সর্বশেষ পরিচালিত জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে বছরে ওই জরিপটি পরিচালিত হয়েছে, সে বছরকে উপাত্তটির জন্য ভিত্তি বিবেচনা করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, ১২৭টি সূচকের জন্য ভিত্তিবছরের উপাত্ত প্রস্তুত ছিল। তবে এমঅ্যান্ডই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল ১০৮টি সূচকের জন্য।

উপাত্ত ঘাটতি পর্যালোচনার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসকৃত সূচকগুলোকেও তিনভাবে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো সহজে লভ্য, আংশিক লভ্য ও লভ্য নয়। এই শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে বর্তমানে ৬৪টি সূচক সহজে লভ্য, ৫৮টি আংশিক লভ্য এবং ১১০টি সূচক লভ্য নয় শ্রেণির আওতাভুক্ত। যেহেতু দেশীয় উৎসগুলোয় উপাত্তের ঘাটতি বিদ্যমান, তাই ২২টি সূচকের ভিত্তিরেখা নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও)। সহজলভ্য নয় ক্যাটেগরিতে ৮১টি সূচক রয়েছে। এগুলোর জন্য এখনো আইএইজি-এসডিজি মেটাডেটা চূড়ান্ত করতে পারেনি। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উপাত্ত প্রস্তুত করতে বাংলাদেশকে বিরাট কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করতে হবে।

উপাত্তের সহজলভ্যতা ও উৎসের বিষয়ে আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, অভীষ্টভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, এসডিজি ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯ ও ১৭ অভীষ্টের ক্ষেত্রে উপাত্তের লভ্যতা মোটামুটি সন্তোষজনক। আর এসডিজি ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ অভীষ্টের উপাত্ত প্রাপ্তি চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এসডিজির জন্য প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ উপাত্ত পাওয়া যাবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) থেকে। মোট ২৪৪টি সূচকের মধ্যে ১০৫টির উপাত্ত সরবরাহ করবে এসআইডি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় বৃহৎ উপাত্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। তারা ৪২টি সূচকের উপাত্ত প্রদান করবে। উপাত্ত প্রদানে এর পরের অবস্থানে আছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। তারা ৩৪টি সূচকের উপাত্ত দেবে। এছাড়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ২৮টি ও অর্থবিভাগ (এফডি) ২০টি সূচকের জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করবে। তৃতীয়ত, এসডিজির তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতকরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের অধীনস্থ সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি বিবেচনা করে দেখা যায়, দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বিবিএসই নির্ধারিত সময়ে নির্ভরযোগ্য ও বিভাজিত উপাত্ত প্রস্তুতকরণে প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিবিএসের পরে যেসব প্রতিষ্ঠান এমন উপাত্ত সরবরাহের সক্ষমতা রাখে, সেগুলো হলো পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস), বন অধিদপ্তর (বিএফডি), জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) ও বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি)।

এসডিজির অর্থায়ন কৌশল

এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ দরকার হবে, তা জোগাড় ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ বিশাল উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে কী পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হবে, এসডিজির অর্থায়ন কৌশলের আওতায়

বাংলাদেশ তা প্রাক্কলন করেছে। একই সঙ্গে অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস, কৌশল ও সম্পদ সংগ্রহের উপায় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জিইডি এরই মধ্যে 'এসডিজি অর্থায়ন কৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এ প্রতিবেদনে সম্পদের বার্ষিক ঘাটতি এবং সরকারের সম্পদ ব্যয়ের কৌশল ও প্রক্রিয়া সংশোধনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সময়ের স্থির মূল্যের ভিত্তিতে এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারি ও সরকারি বহির্ভূত খাতে মোট ৯২ হাজার ৮৪৮ কোটি (৯২৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়বে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত এসডিজি বাস্তবায়নে এ অর্থ লাগবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বর্ধিত প্রবৃদ্ধি হিসাব অনুযায়ী, এ অর্থ দেশের পুঞ্জীভূত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এসডিজি অর্জনে গড়ে প্রতিবছর অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে৬ হাজার ৬৩২ কোটি (৬৬ দশমিক ৩২ বিলিয়ন) মার্কিনডলার (স্থির মূল্যে)। এ পরিমাণ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে এসডিজির ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশই অর্জন করা সম্ভব হবে।

অর্থায়নের ঘাটতি মেটাতে জিইডি প্রণীত অর্থায়ন কৌশলে সম্ভাব্য পাঁচটি উৎসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো: বেসরকারি খাতের অর্থায়ন; সরকারি খাতের অর্থায়ন; সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি); বৈদেশিক অর্থায়ন- যার মধ্যে রয়েছে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগসহ (এফডিআই) সহায়তা ও অনুদান; এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) অর্থায়ন। এসডিজি অর্জনে বাড়তি যে অর্থের প্রয়োজন হবে, তাতে সরকারি খাত থেকে গড়ে ৩৪ শতাংশ অর্থায়ন প্রয়োজন। এসডিজির অনেক অভীষ্ট ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সঙ্গে সরকারি পণ্যের (Public Goods) নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে এগুলো অর্জনে বেসরকারির তুলনায় সরকারি ব্যয় বেশি প্রয়োজন হবে। এসডিজি অর্জনের ঘাটতি অর্থায়ন নিশ্চিতে পিপিপি খাত থেকে গড়ে দরকার হবে ৬ শতাংশ। বৈদেশিক উৎস থেকে দরকার হবে ১৫ শতাংশ, যার মধ্যে ১০ শতাংশ এফডিআই এবং ৫ শতাংশ বৈদেশিক সহায়তা। সবশেষে এনজিও খাতকে বিনিয়োগ করতে হবে ৪ শতাংশ।

কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্তকরণ

সরকারি সংস্থাগুলোর কাজে অধিকতর জবাবদিহি ও কার্যকারিতা নিশ্চিতে ফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, সংক্ষেপে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা Annual Performance Agreement (APA) নামে পরিচিত। আপার উদ্দেশ্য হলো সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যাবলির পদ্ধতিগত পর্যালোচনা। এ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। আপার ফলে এসডিজি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মসম্পাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

এসডিজি অর্জনে 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতি

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি দলিল ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়নকালে বাংলাদেশ সরকার সংগতিপূর্ণভাবে 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এসডিজি অর্জনে প্রস্তুতি গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়ায়ও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, '২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা: জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রস্তাব' *(the Post-2015 Development Agenda: Bangladesh Proposal to UN)* (এউউ ২০১৩) প্রস্তুতকালে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তি খাত ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিলো।

উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন এজেন্ডা এসডিজি বাস্তবায়নেও সরকার সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার এই ধারা অব্যাহত রেখেছে। এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তকরণের অংশ হিসেবে এনজিও, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, উন্নয়ন সহযোগী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পেশাজীবী সম্প্রদায়, শ্রমিক সংঘ, বিভিন্ন নারী সংগঠন ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের নিয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শক সভা সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব সভার ফলে এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীজনদের মাঝে সচেতনতা, আগ্রহ ও অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসডিজি অর্জনে ব্যক্তি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এ পর্যন্ত 'এসডিজি অর্জনে ব্যক্তি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক তিনটি পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় সরকার, ব্যক্তি খাত ও জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। এ ধরনের আয়োজন ব্যক্তি খাতের গুরুত্বের বিষয়ে ভালো ধারণা প্রদান করে। ২০৩০ সালের মধ্যে যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, তা যে টেকসই উন্নয়ন হবে, সে বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং সরকার গণমাধ্যমের এ ভূমিকা সানন্দে স্বীকার করে। ভবিষ্যতে এসডিজি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও এসডিজির ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কার্যকর ও সংগঠিত ভূমিকা দরকার হবে।

‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ নীতির ওপর গুরুত্বারোপ

ওপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান, এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে, যা ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়। ভিশন-২০৪১ অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ২০২১ থেকে ২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এছাড়া বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) প্রণয়নের কাজ চলমান, তার উদ্দেশ্য ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ নীতির বাস্তবায়ন এবং সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। যারা পেছনে অবস্থান করছে (সুবিধাবঞ্চিত সামাজিক গোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় বসবাসকারী), তাদের দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো ছাড়া বিদ্যমান বৈষম্য কমানো যাবে না। উন্নয়ন না হলে ওইসব জনগোষ্ঠী ও এলাকা আরও পিছিয়ে পড়বে। এ কারণেই অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে–‘যে সবার পেছনে রয়েছে, তার কাছে সবার আগে পৌঁছাতে হবে।’

এখন দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ চরম দারিদ্র্যরেখার নিচে অবস্থান করছে। অন্যদিকে সবচেয়ে ওপরের দিকে অবস্থানকারী ১০ শতাংশের দখলে মোট আয়ের ৩৮ শতাংশ। এছাড়া কিছু এলাকা, যেমন দেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকা, দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকা, হাওর অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা পিছিয়ে রয়েছে। এর বাইরে দেশে বেশকিছু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চা শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ভূমিহীন কৃষক, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, যৌনকর্মী, পরিবেশগত শরণার্থী, প্রথাগত জেলে সম্প্রদায়, কাঠ খোদাই মিস্ত্রি (ছুতার সম্প্রদায়), চরমভাবে অসুস্থ দরিদ্র মানুষ, গ্রামীণ চরম দরিদ্র মানুষ; বিশেষ করে বয়স্ক নারী, গৃহহীন বেকার ও তাদের পরিবার, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্র নারী প্রধান খানা (Household)।

আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী/অঞ্চলের পিছিয়ে পড়ার সুনির্দিষ্ট কারণ ও অন্তর্নিহিত কিছু প্রামাণ্য বিষয় ও তাদের পিছিয়ে থাকার জন্য দায়ী কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে এসডিজির নিরিখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২৫) জন্য কতিপয় এজেন্ডা চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনার নীতি কাঠামোতে চারটি স্তম্ভের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: (১) আয়বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; (২) শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যখাতে বৈষম্য কমানো; (৩) সামাজিক ও জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ; এবং (৪) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

এছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় LNOB বিষয়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য ছয়টি নির্দিষ্ট কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। **কর্মসূচি ১:** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কৌশলগতভাবে এলএনওবি তহবিল সংযুক্ত করা এবং এসব জনগোষ্ঠীর জন্য একটি জাতীয় উপাত্তভাণ্ডার তৈরির নিমিত্ত সমন্বিত কৌশল গ্রহণ; **কর্মসূচি ২:** কোনো নির্দিষ্ট এলাকা ও সম্প্রদায়ের প্রান্তিক পর্যায়ে পতিত হওয়া ঠেকাতে নির্দিষ্ট কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন; **কর্মসূচি ৩:** পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের উপার্জন ও উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রাপ্যতা বাড়াতে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; **কর্মসূচি ৪:** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির ব্যবস্থা করা; **কর্মসূচি ৫:** সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থ-রাজনৈতিক কার্যক্রমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানো; এবং **কর্মসূচি ৬:** সকল জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলপত্রে পিছিয়ে পড়া এলাকা ও জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ গুরুত্ব নিশ্চিতকরণ।

উল্লিখিত বিষয়গুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এলএনওবি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। সরকারের জাতীয় পর্যায়ের বেশকিছু বিষয়ের সঙ্গে এ কর্মসূচিগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; যেমন: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, সামাজিক ও আয়বৈষম্য কমানো, গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, যথাযথ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ, পিছিয়ে পড়া সামাজিক গোষ্ঠী ও এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে এলএনওবি নীতির বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

এলএনওবি নীতি বাস্তবায়নে কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক কাঠামোগত রূপান্তর জোরদার করতে বাংলাদেশ শিল্প ও কৃষিনীতিসমূহ কাজে লাগাবে। এটা করতে হলে অবকাঠামো খাতে বৃহৎ সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। এছাড়া অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) মতো নির্দিষ্ট উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে সুসমন্বিত কৃষি ও শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

কর্মসংস্থান কাঠামোর রূপান্তর ঘটাতে বাংলাদেশ তার কার্যকর সুশাসন ব্যবস্থাকে কাজে লাগাবে। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার এবং চাহিদা ও উৎপাদনের সঙ্গে সংগতি বিধান করে এ দুটি খাতের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীলতার

প্রতি যত্নশীল হবে। পাশাপাশি আয়বর্ধক কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীল পেশার সুযোগ সৃষ্টি এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও এলাকার কল্যাণার্থে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক নীতি গ্রহণ করবে।

জেন্ডারসহ অন্যান্য অসমতা দূর করার পাশাপাশি এ নীতিসমূহ এলএনওবির অন্তর্নিহিত মূল্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করবে। বাস্তব কারণে অষ্টম পরিকল্পনা নীতিসমূহ ফলাফলের (Outcome) সমতার চেয়ে সুযোগের সমতার ওপর বেশি জোর দেবে। যারা পেছনে পড়ে আছে, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ পরিকল্পনার কর্মকাঠামো ন্যায়ভিত্তিক প্রক্রিয়া কার্যকরে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং এলএনওবির প্রতিফলন নিশ্চিতে অধিকতর সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সমান সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য গুরুত্বারোপ করবে।

পিছিয়ে পড়া ও অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং পিছিয়ে থাকা ও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি অর্জনকারী এলাকার মধ্যকার তুলনামূলক চিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে নিয়মিতভাবে অগ্রগতির পরিবীক্ষণ আবশ্যক। অধিকন্তু গৃহীত যথোপযুক্ত বহুমাত্রিক সূচক দ্বারা পরিমাপ করা অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি সরকারের বরাদ্দ ও নীতি বাস্তবায়নের ধারা পিছিয়ে পড়াদের জন্য কতটা সহায়ক ভূমিকা রাখছে, তাও নজরে রাখা হবে। এলএনওবি নীতি বাস্তবায়নে সাফল্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক এলাকার বিষয়ে বিভাজিত সূচকসমূহের জন্য সময়মতো প্রয়োজনীয় উপাত্তের লভ্যতা প্রধান চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে উপাত্ত লভ্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

সবশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এলএনওবির ইস্যুগুলো স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। সর্বজনীনতা বজায় রেখে সমন্বিতভাবে এলএনওবি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হলে যে উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তা হলো এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত সকল স্থানীয় অংশীজনকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা বাড়াতে উপযুক্ত আইনি ও আর্থিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

এক্ষেত্রে চারটি বিষয় নজরে আনা প্রয়োজন। যথা: (১) স্থানীয় কর্মকৌশল ও নীতি/কর্মসূচিতে এলএনওবি দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ; (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত এলএনওবির অগ্রগতি বিশ্লেষণে কাজে লাগানো; (৩) তৃণমূল পর্যায়ে সমন্বিত পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে সক্ষমতা বাড়ানো এবং এলএনওবি বাস্তবায়নে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টিতে স্থানীয় সরকারকে সহায়তা প্রদান; এবং (৪) এলএনওবি বাস্তবায়নকারী সকল অংশীজন ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।

স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা–এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান–এমএফআই) এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এলএনওবি ধারণা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে তারা সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করছে। এলএনওবির স্থানীয়করণ স্থানীয় অংশীজন, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই) ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার অংশ। স্থানীয় প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে আরও বেশি ফলদায়ক করার ক্ষেত্রে এ ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বাস্তবায়ন, কর্মসূচি নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ কাজে সর্বাত্মকভাবে অংশ নেয়, তাহলেই কেবল এলএনওবির অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এলএনওবি কাঠামোর সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০

ব্যাপক পদ্ধতিগত কাঠামো অনুসরণ করে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ এসডিজির প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। ওই প্রতিবেদন মূলত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জিইডি কর্তৃক প্রণীত এসডিজি-সংক্রান্ত অন্যান্য কাঠামোবদ্ধ নীতিমালার বাস্তবায়িত অগ্রগতির সমাবেশ। এ দলিলাদির মধ্যে রয়েছে এসডিজির বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২০১৮), এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮), এসডিজির উপাত্তের ঘাটতি পর্যালোচনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২০১৭) এবং এসডিজির অর্থায়ন কৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (২০১৭)। এছাড়া প্রতিবেদনটিতে এসডিজির বিভিন্ন সূচকের বিষয়ে বিবিএস ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের প্রচেষ্টার কথা জানানো হয়। আর ঘাটতি মেটাতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎস, যেমন: বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ওইসিডি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ওই মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাথমিক খসড়া অভ্যন্তরীণভাবে পর্যালোচনা

করে জিইডি কিছু সংশোধনী এনেছিল। যেকোনো প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তিকরণে জিইডির দীর্ঘদিনের চর্চার অংশ হিসেবে প্রতিদেনটির প্রণয়ন পর্যায়ে অংশীজনদের সঙ্গে দুটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরামর্শ সভায় প্রাপ্ত মতামতগুলো প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

মোটাদাগে বাংলাদেশ ও বিশ্ব সম্প্রদায় এসডিজি বাস্তবায়নের পঞ্চম বর্ষে অবস্থান করছে। এ বৈশ্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে ২০২০ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এ বছরে ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রথম চার বছরের মূল্যায়ন যেমন দরকার, তেমনি ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়গুলো কর্মপদ্ধতিতে সন্নিবেশ ও সেই অনুসারে চলার পথ নির্ধারণের বছর এটি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন অংশীজনদের থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণের অত্যাবশ্যকতা অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমরা যদি জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ কর্মসূচি ও কাউকে পেছনে ফেলে না রাখার অভীষ্ট অর্জন করতে চাই, তাহলে এই অনুধাবনগুলো অত্যন্ত জরুরি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' নীতির বাস্তবায়ন ও এসডিজি অর্জনে আগামী বছরগুলোয় কী মাত্রায় প্রচেষ্টার দরকার হতে পারে, সে বিষয়ে একটি ধারণার ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির আলোকে 'বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৮' প্রণয়নে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল, 'বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০' প্রণয়নেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য অন্তত দুটি কারণে 'এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এরই মধ্যে এসডিজি অর্জন প্রক্রিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং এ সময়ে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোন উদ্যোগগুলো ফলদায়ক হয়েছে, কোনগুলো পরিমার্জন করা প্রয়োজন, কোনগুলো বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন রূপরেখা নির্ধারণের এটাই উপযুক্ত সময়। দ্বিতীয়ত, ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জনে এখনো সময় আছে এক দশক। বিগত সময়ে কাজের অভিজ্ঞতা ও নীতি সংশ্লেষের অভিজ্ঞতা আগামী বছরগুলোয় এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এসডিজি অর্জন করতে হলে দেশগুলোয় এতদিন ধরে যে ধারা চলে আসছে, তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে, তার মধ্যে রয়েছে অসমতা কমানো, উৎপাদন ও ভোগের টেকসই ধারা উৎসাহিতকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা। স্বভাবতই এসব দেশ এসডিজি অর্জনে শুরুর বছরগুলোয় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে না। তবে এক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এসডিজি অর্জনে দেশগুলো তাদের সম্ভাব্য কর্মপন্থার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ চলার পথের পাথেয় ঠিক করতে পেরেছে কি না। প্রত্যেক অভীষ্টের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কী মাত্রায় অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা 'সারণি-১'-এ দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, 'এসডিজি-১' অর্জনের ক্ষেত্রে সব দেশ পরিমিত বা ভালো অবস্থানে আছে এবং সঠিক পথেই এগোচ্ছে। এসডিজি অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ ও কর্মসম্পাদন মোটামুটি পরিমিত পর্যায়ের এবং এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এসডিজির অভীষ্টগুলো অর্জন করতে হলে বাস্তবায়নের অগ্রগতি আরও তরান্বিত করতে হবে। কিছু অভীষ্টের ক্ষেত্রে আবার অধিকাংশ দক্ষিণ এশীয় দেশের অগ্রগতি স্থবির অবস্থায় রয়েছে অথবা কোনো অগ্রগতিই হয়নি।

কিছু সূচকের অগ্রগতির ধারা ইতিবাচক পর্যায়ে থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় অগ্রগতির যে গতিধারা চলমান, তা অব্যাহত থাকলে ১৭টি অভীষ্টের অনেকগুলোই অনর্জিত থেকে যেতে পারে (এসকাপ, ২০১৯)। এক্ষেত্রে এসব দেশে আয়বৈষম্য, বিদ্যুৎপ্রাপ্তি, বিভিন্ন সেবায় প্রবেশগম্যতা এবং নাগরিক মর্যাদাকেন্দ্রিক যেসব বাধাবিপত্তি রয়েছে, তার অবসান করতে হবে। ভোগের ক্ষেত্রে অসমতা তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশেই এক ধরনের পদ্ধতিগত বৈষম্য বিদ্যমান। এসব বৈষম্য একটি অপরটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, যা এক ধরনের জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। এসব বৈষম্যের মধ্যে জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রিক অসমতাগুলো প্রকটভাবে দৃশ্যমান। এ ধরনের বৈষম্য নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি আবাসনের সহজলভ্যতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক সেবার প্রাপ্যতা এবং সুপেয় পানি ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রাপ্তির পথেও তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যাহোক, দক্ষিণ এশিয়ায় অসমতা দূর করা খুবই জটিল এবং এর সঙ্গে অনেকগুলো বিষয় জড়িত। অসমতা বিলোপের এ অভীষ্ট অর্জনে সঠিক কৌশল নেওয়া হলে এসডিজি অর্জনের পুরো চিত্রই বদলে যাবে, যা ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে সুবর্ণ সুযোগ এনে দেবে।

সারণি ১: এসডিজি বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষিত

অভীষ্টভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র						
	ভুটান	শ্রীলঙ্কা	নেপাল	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান
১. দারিদ্র্য বিলোপ	ভালো ও সঠিক পথে অগ্রসরমাণ	ভালো, সঠিক পথে	পরিমিত, সঠিক পথে	পরিমিত, সঠিক পথে	পরিমিত, সঠিক পথে	পরিমিত, সঠিক পথে
২. ক্ষুধামুক্তি	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	পরিমিত মাত্রায় দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ
৩. সুস্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	পরিমিতভাবে দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, স্থবির
৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা	পরিমিত, চলমান	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, স্থবির
৫. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	পরিমিত মাত্রায় দুর্বল, অগ্রসরমাণ	----------	দুর্বল, স্থবির
৬. নিরাপদ পানি ও পয়োনিষ্কাশন	অপ্রতুল উপাত্ত	ভালো, সঠিক পথে অগ্রসরমাণ	ভালো, সঠিক পথে অগ্রসরমাণ	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত
৭. সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	পরিমিত মাত্রায় দুর্বল, অগ্রসরমাণ	----------	দুর্বল, স্থবির
৮. স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং শোভন কাজ	অপ্রতুল উপাত্ত	ভালো, সঠিক পথে অগ্রসরমাণ	ভালো, সঠিক পথে	দুর্বল, স্থবির	পরিমিত মাত্রায়, সঠিক পথে	দুর্বল, স্থবির
৯. অভিঘাত-সহিষ্ণু অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	পরিমিত মাত্রায় দুর্বল, অগ্রসরমাণ	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, স্থবির
১০. অসমতা হ্রাস	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত
১১. টেকসই নগর ও জনবসতি	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির
১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত	অপ্রতুল উপাত্ত
১৩. জলবায়ু কার্যক্রম	ভালো, উদ্যোগ চলমান	ভালো, উদ্যোগ চলমান	ভালো, সঠিক পথে	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির	পরিমিত মাত্রায়, স্থবির
১৪. জলজ জীবন	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, স্থবির	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, স্থবির
১৫. স্থলজ জীবন		দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, স্থবির	খুবই দুর্বল, অবনতিশীল	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির
১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান	অপ্রতুল উপাত্ত	দুর্বল, অবনতিশীল	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির
১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব	দুর্বল, উদ্যোগ চলমান	দুর্বল, অবনতিশীল	দুর্বল, অগ্রসরমাণ	দুর্বল, স্থবির	দুর্বল, স্থবির	অপ্রতুল উপাত্ত

সূত্র: এসডিজি ইনডেক্স অ্যান্ড ড্যাশবোর্ডস রিপোর্ট, ২০১৮

শিল্পায়ন (এসডিজি ৯) ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি ৮) দারিদ্র্য দূরীকরণ (এসডিজি ১) ও অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল উপ-অঞ্চল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু এখানকার প্রবৃদ্ধি যুবসমাজের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে না। আর শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশই নিয়োজিত অনানুষ্ঠানিক খাতে। দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ঘটেছে তাতে দেখা যায়, এখানে অর্থনীতি কৃষি থেকে সরে গিয়ে শিল্পকে পাশ কাটিয়ে একলাফে সেবা খাতের দিকে ধাবিত হয়েছে। ফলে শিল্পের অগ্রসরমুখী (ফরওয়ার্ড লিংকেজ) ও পশ্চাৎমুখী (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ) কর্মকাণ্ডে যে বিপুলসংখ্যক স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল, তা হাতছাড়া হয়েছে। সমন্বিত আঞ্চলিক শিল্পায়ন কৌশল এ অঞ্চলের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উৎপাদনশীলতার সক্ষমতা ব্যাপকহারে বাড়াতে পারে, যা সীমানা ছাপিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অভিন্ন আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো: এখানে অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা অনেক বেশি। এসব অপ্রতুল অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে পরিবহন অবকাঠামো (এসডিজি ৯) এবং সুপেয় পানির সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন অবকাঠামো (এসডিজি ৬), বিদ্যুৎ (এসডিজি ৭) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ (এসডিজি ৩) এবং সবার জন্য গুণগত শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের সৃষ্টির (এসডিজি ৪) মানব উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ বাড়ালে তা দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলের যুব জনগোষ্ঠীর থেকে আরও বেশি মাত্রায় জনমিতিক লভ্যাংশ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের পড়ালেখা শেষে একজন শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনের যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড আছে, এ উপ-অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা সে পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে ২০২০ সালের মধ্যে।

দারিদ্র্য বিলোপ (এসডিজি ১) ও অসমতা দূরীকরণে (এসডিজি ১০) সামাজিক সুরক্ষা ও কৌশল এবং আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিনিয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। গত দশকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় সরাসরি নগদ সহায়তা, কর্মের নিশ্চয়তা ও শর্তসাপেক্ষ নগদ সহায়তার মতো সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বিস্তৃত হয়েছে। এ কার্যক্রম আরও যুগোপযোগীভাবে বাড়ানো যেতে পারে। আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষুদ্রঋণের মতো কর্মসূচির পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবার মতো আরও উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ক্ষুধা মুক্তি (এসডিজি ২) দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। চরম দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন ও খাদ্যের অধিকতর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং অসমতা কমানো, উচ্চমাত্রার রক্তস্বল্পতা ও ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতি মোকাবিলা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে খানাপ্রতি উপার্জন ও ভোগ বাড়ানো এবং ক্ষুদ্রাকৃতির কৃষি উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় নীতি-কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা খাতে জেন্ডার সমতা অর্জিত হলেও দক্ষিণ এশিয়া এখনো নারীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনে (এসডিজি ৫) পিছিয়ে আছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি জেন্ডার সমতার জন্য সহায়ক নীতি গ্রহণ, প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য 'ওয়ান স্টপ শপ' চালু, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনামূলক ঋণ সুবিধা প্রদান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য ও তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করেও নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা সম্ভব।

দক্ষিণ এশিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের উচ্চ ঝুঁকিতে আছে। এ পরিস্থিতিতে টেকসই উন্নয়নের ধারা চালু রাখতে বিবর্তনমূলক উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করতে হবে। কার্বন নিঃসরণ নীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তা কমানোর জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় বিভিন্ন ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে। নবায়নযোগ্য এসব শক্তির মধ্যে রয়েছে জলবিদ্যুৎ, সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ; গ্যাসভিত্তিক জ্বালানি এবং বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে নতুন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার।

শিল্প খাতে টেকসই উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। এ লক্ষ্যে জ্বালানি দক্ষতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পদ আহরণ এবং সহ-উৎপাদন কার্যক্রম চালু করতে হবে। টেকসই ভোগব্যবস্থা জোরদারকরণে জীবনধারায় ৩-আর (প্রশমন, পুনর্ব্যবহার ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার বা reduce, reuse and recycle) ব্যবস্থার চর্চা বাড়ানোর পাশাপাশি নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন প্রয়োজন। আগামী তিন দশক ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্রুতগতির নগরায়ণের ধারা অব্যাহত থাকবে। কাজেই এ উপ-অঞ্চলের দেশগুলোয় টেকসই, আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার সুযোগ রয়েছে, যেখানে থাকবে পরিবেশবান্ধব ও অত্যধিক ঘাতসহনশীল ভবন ও নগর অবকাঠামো এবং আধুনিক নগর পরিবহন ব্যবস্থা।

সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

'বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০'-এর বেশকিছু সীমবদ্ধতা রয়েছে। এ প্রতিবেদনে এসডিজির সব অভীষ্টের জন্য একই মাপের মূল্যায়ন উপস্থাপন করা যায়নি। এর কারণ অনেক সূচকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও হালনাগাদ উপাত্ত সহজলভ্য ছিল না। যেসব ক্ষেত্রে এসডিজি শুরুর প্রথম দুই বছরের উপাত্ত ধারাবাহিকভাবে পাওয়া গেছে, সেক্ষেত্রে ২০২০ মাইলফলক পর্যন্ত কী পরিমাণ অর্জন সম্ভব, সে বিষয়ে একটি সরল ভবিষ্যদ্বাণী দাঁড় করানো হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এমডিজির শেষ দিকের কিছু উপাত্তের সঙ্গে এসডিজি চলাকালে প্রস্তুত হওয়া উপাত্ত সমন্বয় করে তা ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেসব ক্ষেত্রে উপাত্তের উৎস একটি, সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনে পরিমাণগত কোনো ধারণা প্রদান করা হয়নি।

উপাত্তের ঘাটতির বিষয়ে সরকার সদা সজাগ। আর সে কারণেই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সময়মতো ও গুণগত উপাত্ত প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ২০৩০ উন্নয়ন কর্মসূচির প্রথম চার বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে জিইডি 'বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২০' প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রতিবেদন এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান সমস্যা উপলব্ধি ও সীমাবদ্ধতাগুলোর বিষয়ে সচেতন হতে সহায়তা করবে। তথাপি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন সকল অংশীজন থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডায় স্বাক্ষর করে এটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মুখে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে টেকসই উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় রূপরেখা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। অধিকন্তু এ প্রতিবেদন এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সঠিক পথে পরিচালনের লক্ষ্যে অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সন্নিবেশ করতে সহায়তা করবে। ২০৩০ সময়সীমার মধ্যে এসডিজি অর্জনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া জোরদার করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি প্রেরণা জোগাবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো এসডিজির নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ব্যবহার করে প্রকৃত অগ্রগতি তুলে ধরা (অর্জনে পিছিয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করা), যাতে পরবর্তীকালে বিদ্যমান দুর্বলতা চিহ্নিত করে সময়োপযোগিতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করে বিভাজিত উপাত্ত তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

১ দারিদ্র্য বিলোপ

সকল পর্যায়ে সব ধরনের দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন

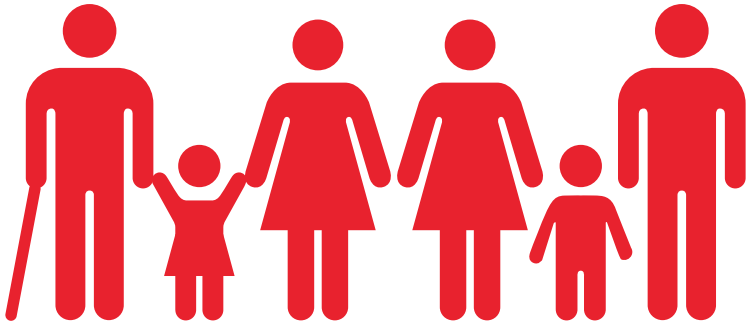

১.১ এসডিজি ১ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিলোপের ক্ষেত্রে বিশ্ব বেশ দ্রুত অগ্রগতি সাধন করছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভ করেছে। সাম্প্রতিক প্রাক্কলন অনুযায়ী, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৮ দশমিক ৬ শতাংশ বা ৭৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, যাদের দৈনিক মাথাপিছু রোজগার ১ দশমিক ৯০ ডলারের নিচে। একজন মানুষের দৈনিক উপার্জন এবং জীবনধারণের জন্য মৌলিক পণ্য ও সেবার ক্রয়ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে এ সংখ্যা পরিগণনা করা হয়েছে। তবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) ২০১৮ সালের এক জরিপের তথ্যমতে, কেবল আয়ের বিষয়টি বিবেচনা না করে যদি স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, শিক্ষা ও উন্নত জীবনমানের অসমতা ও বঞ্চনার কথা বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে বিশ্বের ১৩০ কোটি (১.৩ বিলিয়ন) মানুষ বহুমাত্রায় দারিদ্র্যের শিকার।

বিশ্বের মোট হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি বাস করে সাব-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলে। সেখানে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪১ কোটি ৩০ লাখের মতো (৪১৩ মিলিয়ন)। অন্যদিকে সিরিয়া ও ইয়েমেন সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে হতদরিদ্রের সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লাখে (১৮.৬ মিলিয়ন) পৌঁছেছে। পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া–এ দুটি অঞ্চলে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৩ শতাংশের নিচে। এ দুটিঅঞ্চল২০৩০ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় ২৪ কোটি ৮৮ লাখ (২৪৮.৮ মিলিয়ন) মানুষ চরম দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেওসারা বিশ্বের মধ্যে এ অঞ্চলে বসবাসকৃত হতদরিদ্রের অনুপাত বেড়েছে। ১৯৯০ সালের বিশ্বের মোট হতদরিদ্র মানুষের ২৭ দশমিক ৩ শতাংশের উপস্থিতি ছিল এ অঞ্চলে, ২০১৩ সালে যা বেড়ে হয়েছিল ৩৩ দশমিক ৪ শতাংশ।

বহুমাত্রিকতার বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করে দক্ষিণ এশিয়ায়। ২০১৭ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের মোট বহুমাত্রিক দরিদ্র মানুষের প্রায় অর্ধেকই (৪৮ শতাংশ) দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্যের অনুপাত ৩ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে সাব-সাহারা আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোয় যথাক্রমে ৮ ও ২ শতাংশ হারে দরিদ্র মানুষ বেড়েছে।

এসডিজি ১ অর্জন করতে হলে বিশ্বের সব অঞ্চলেই সকল প্রকার দারিদ্র্যের বিলোপ সাধনে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যবিরোধী যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সাব-সাহারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চল, যেখানে দারিদ্র্য কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, সেখানে এ ধরনের নীতি প্রণয়ন অতীব জরুরি। কম উপার্জনই দারিদ্র্যের একমাত্র নির্ধারক নয়, বরং দারিদ্র্যের নানামুখী নিয়ামক বিদ্যমান। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূর করতে হলে সমাজের একদম প্রান্তিক স্তরে যেসব দরিদ্র মানুষ রয়েছে, তাদের আগে চিহ্নিত করতে হবে। সমাজের একদম প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ যারা বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে বংশপরম্পরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং সব সময়ই অবহেলিত থাকছে, তাদের খুঁজে বের করে দারিদ্র্য নিরসনে উদ্যোগ নিতে হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে কারও পেছনে পড়ে না থাকা নিশ্চিত করা ও চরম দারিদ্র্যের বিলোপ সাধনে তিনটি প্রধান বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। প্রথমত, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে তার সুফল সমাজের সব স্তরে পৌঁছে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে নানা ধরনের ঝুঁকি ও সমস্যা বিদ্যমান। এসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে যাতে উন্নয়ন করা যায়, সে বিষয়ে নজর দেওয়া। তৃতীয়ত, সমাজের যে অংশের মানুষ প্রচলিত পদ্ধতির ত্রুটির কারণে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বঞ্চিত রয়েছে, তাদের উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে কার্যকর নীতি গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি জেন্ডার অসমতা কমাতে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

১.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১ অগ্রগতি পর্যালোচনা

সূচক: ১.১.১ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও এখনো জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দরিদ্র। দৈনিক ১ দশমিক ৯ ডলারের কম উপার্জন করা মানুষের অনুপাতকে দারিদ্রের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হলে ৩০ বছর ধরে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের অনুপাত ধারাবাহিকভাবে কমেছে। দারিদ্র্যের এ পরিমাপের ক্ষেত্রে ২০১১ সালের আন্তর্জাতিক মূল্যের ভিত্তিতে ডলারের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার সমতার (পিপিপি) মডেলের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়ে থাকে। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের দারিদ্র্য কমার চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ সময়ে প্রতিবছর গড়ে দশমিক ৮৭ শতাংশ (০.৮৭%) হারে দারিদ্র্য কমেছে।

সারণি ১.১: আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত (%)

দারিদ্র্য পরিমাপ	১৯৯২	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
১.৯ ডলার জনপ্রতি (দৈনিক)	৪৪.২	৩৩.৭	২৪.৫	১৮.৫	১৪.৭

সূত্র: পোভক্যালনেট, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬

সূচক ১.২.১: জাতীয় দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

১৯৯১-৯২ সাল থেকেই বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাতের ভিত্তিতে জাতীয় দারিদ্র্য হার নিরূপণ করা হয়। এ হিসাব অনুযায়ী, উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত ধারাবাহিকভাবে কমে ২০১০ সালে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসে এবং ২০১৬ সালে তা নেমে আসে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী দারিদ্র্য হার আরও নিম্নগামী হয়ে ২০১৯ সালে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণি ১.২)।

সারণি ১.২: উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা, ১৯৯২-২০১৯ (শতাংশ)

	১৯৯২	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৯ (প্রাক্কলিত)
জাতীয়	৫৬.৭	৪৮.৯	৪০	৩১.৫	২৪.৩	২০.৫
শহর	৪২.৮	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩	১৮.৯	...
গ্রাম	৫৮.৮	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	২৬.৪	...

সূত্র: বিবিএস, খানা আয়-ব্যয় জরিপ, পরিকল্পনা কমিশন

গত ৩০ বছরের পুরো সময়জুড়ে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ার ধারা অব্যাহত থাকলেও ২০১০ থেকে ২০১৬ সময়ে ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের তুলনায় দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ার হার কিছুটা কমেছে। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালে প্রতিবছর ১ দশমিক ৭ শতাংশীয় পয়েন্ট হারে দারিদ্র্য কমেছে। ২০১০ থেকে ২০১৬ সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের এ হার ১ দশমিক ২ শতাংশীয় পয়েন্টে নেমে আসে। প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য কমার হার নিম্ন হওয়ার অর্থ হলো, আয় বণ্টনে অসমতা বাড়ছে। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে স্বাধীনতার প্রথম দশকের তুলনায় বিগত দশকে আয়বৈষম্য বেড়েছে। আয়বৈষম্য পরিমাপের বৈশ্বিক পরিমাপক জিনি সহগে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল শূন্য দশমিক ৩৬ (০.৩৬)। ২০১৬ সালে তা বেড়ে গিয়ে শূন্য দশমিক ৪৮৩ (০.৪৮৩) হয়েছে।

২০১৬ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ওই সময়ে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে অধিকতর দ্রুতগতিতে। এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, উল্লিখিত সময়কালে কেবল দারিদ্র্য হারই কমে আসেনি, বরং দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যাও কমে এসেছে। ১৯৯২ সালে যেখানে দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৩০ লাখ ৬০ হাজারের মতো (৮৩.০৬ মিলিয়ন), ২০১৬ সালে তা নেমে আসে ৩ কোটি ৯৬ লাখে (৩৯.৬ মিলিয়ন)। এ সময়ের ব্যবধানে লাখ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে। কয়েক বছর ধরে স্থিতিশীলভাবে ৮ শতাংশের কাছাকাছি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ার ধারা এখনো অব্যাহত আছে এবং আগামী বছরগুলোয়ও তা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা। এ প্রবৃদ্ধির হাত ধরে দারিদ্র্যও দ্রুতগতিতে কমে আসবে, যা এক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

হতদারিদ্র্যের (নিম্ন দারিদ্র্য রেখা) চিত্র বিশ্লেষণ করেও এ মাত্রার দারিদ্র্য ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ মেলে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালে হতদারিদ্র্য বা নিম্নদারিদ্র্য বছরে শূন্য দশমিক ৭২ শতাংশ পয়েন্ট হারে কমেছে। অবশ্য এর আগের ছয় বছর ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে এ হ্রাস পাওয়ার হার কিছুটা বেশি ছিল; শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ (সারণি ১.৩)।

সারণি ১.৩: নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য প্রবণতা, ১৯৯২-২০১৯ (শতাংশ)

	১৯৯২	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৯ (প্রাক্কলিত)
জাতীয়	৪১	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯	১০.৫
শহর	২৪	১৯.৯	১৪.৬	৭.৭	৭.৬	...
গ্রাম	৪৩.৮	৩৭.৯	২৮.৬	২১.১	১৪.৯	...

সূত্র: বিবিএস, খানা আয়-ব্যয় জরিপ, পরিকল্পনা কমিশন

সূচক ১.২.২: বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর অনুপাত

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) ব্যবহার করে সকল প্রকারের দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য জিইডি সম্প্রতি এমআইসিএস (২০১৯) উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এমপিআই সূচক প্রণয়ন করেছে। এখানে দারিদ্র্যের তিনটি প্রধান মৌলিক বঞ্চনার ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের মাত্রা কেমন হতে পারে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি বিষয় হলো–স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মান। সূচক প্রণয়নকালে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত পানি, পয়োনিষ্কাশন, উপযুক্ত পুষ্টি ও প্রাথমিক শিক্ষার অভাব কী মাত্রায় ছিল, তা পরখ করা হয়েছে। যেসব সুবিধার অভাবের ওপর ভর করে এমপিআই প্রণয়ন করা হয়েছে, তার এক-তৃতীয়াংশও যদি কারও গ্রহণের সুযোগ না থাকে, তাহলে তাকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৪, ২০০৭ ও ২০১৪ সালের ডিএইচএস ব্যবহার করে অক্সফার্ড দারিদ্র্য ও মানব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (ওপিএইচআই) বা The Oxford Poverty and Human Development Institution (OPHI) এমপিআই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয় করেছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশ এমপিআই দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে এমপিআই দারিদ্র্যের শিকার মানুষের হার ছিল ৬৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে তা নেমে আসে ৪১ দশমিক ৭ শতাংশে। পরবর্তীকালে তা আরও কমে ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এমপিআই সূচকে আরও দেখা যায়, জীবনধারণের নানা বিষয়ে বাংলাদেশে বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন: রান্নার জ্বালানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ মানুষ বৈষম্যের শিকার। উপযুক্ত বাসস্থানের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে এ হার ৩৮ দশমিক ৭ শতাংশ। এছাড়া স্যানিটেশন সুবিধার ক্ষেত্রে ৩০ দশমিক ৭, সম্পদের ক্ষেত্রে ২৮ দশমিক ৩, উপযুক্ত পুষ্টি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ২৫ দশমিক ৬ এবং স্কুলগামিতার ক্ষেত্রে ২৫ দশমিক ২ শতাংশ মানুষ বৈষম্যের শিকার।

সারণি ১.৪: বহুমাত্রিক সূচকে দারিদ্র্য প্রবণতা, ২০০৪-২০১৯

	২০০৪	২০০৭	২০১৪	২০১৯
এমপিআই				
জাতীয়	০.৩৬৫	০.২৯২	০.১৯৮	০.১৮
শহর	...	...	০.১০৩	...
গ্রাম	...	...	০.২৩৩	...
মাথাগুনতি এমপিআই (%)				
জাতীয়	৬৭.২	৫৭.৮	৪১.৭	৩৭.৫১
শহর	...	...	২৩.০	...
গ্রাম	...	...	৪৮.৬	...
এমপিআই তীব্রতা (প্রত্যেক ব্যক্তির গড় বঞ্চনার মাত্রা), (%)				
জাতীয়	৫৪.৩	৫০.৪	৪৭.৫	৪৬.৮৪
শহর	...	...	৪৪.৯	...
গ্রাম	...	...	৪৭.৯	...

সূত্র: ওপিএইচআই কান্ট্রি ব্রিফিং ২০১১ ও ২০১৯–বাংলাদেশ ডিএইচএস ২০০৪, ২০০৭, ২০১৪; জিইডি, ২০১৯

সূচক ১.৩.১: সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি দ্বারা আচ্ছাদিত জনসংখ্যার অনুপাত

দারিদ্র্য, ঝুঁকিপূর্ণতা ও প্রান্তিকীকরণের সমস্যা দূর করতে বাংলাদেশ ব্যাপক বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি (এসপিপি) গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য পেনশন, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য ভাতার ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা কর্মসূচি, কর্মসৃজন কার্যক্রম এবং মানব উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি। সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়ন করে। এ কৌশলের উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে মানুষের জীবনচক্রের নানা ঝুঁকি প্রশমন এবং সবচেয়ে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ২০০৫ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপ শুরুর পর থেকে বিবিএস সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচির (এসএসএসপি) জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহ করে আসছে। পরবর্তী ধাপে পরিচালিত জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে এসএসএনপি কর্মসূচির সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসএসএনপির আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও সুবিধাভোগী খানার অনুপাত বাড়ানো হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সময়ের মধ্যে এ কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে দেশের মোট দরিদ্র খানার ২৮ শতাংশ এসএসএনপি সুবিধার আওতায় ছিল। ২০১৯ সালে ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয় (সারণি ১.৫)। লক্ষণীয়, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সময়ের মধ্যে শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিস্তৃতি অনেক দ্রুততর হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সব দেশই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এক্ষেত্রে প্রবক্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে অধিকতর সুচারুভাবে এ কর্মসূচির উত্তরোত্তর অগ্রগতি হয়েছে।

সারণি ১.৫: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণ প্রবণতা, ২০০৫-২০১৯%

	জাতীয়	শহর	গ্রাম
২০১৯	৫৮.১	৫৩.১	৫৯.৫
২০১৬	২৭.৮	১০.৬	৩৪.৫
২০১০	২৪.৬	৯.৪	৩০.১
২০০৫	১৩.০৬	...	...

সূত্র: বিবিএস, বিভিন্ন বছরের হায়েস প্রতিবেদন, এমআইসিএস, ২০১৯

সূচক ১.৪.১: খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে মৌলিক সেবাসমূহ লভ্যতার অনুপাত

মৌলিক সেবাসমূহ লভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো সাধারণত মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসমূহ এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধার প্রাপ্যতা নির্দেশ করে। জনসাধারণের মৌলিক সেবায় অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে (সারণি ১.৬)। ২০১৯ সাল নাগাদ মানসম্মত পয়োনিষ্কাশন সেবা প্রাপ্তির সুযোগ পৌঁছেছে ৮৪ শতাংশ খানার দোরগোড়ায়। ২০১২ সালে এ হার ছিল ৫৬ শতাংশ। অনুরূপভাবে প্রসূতি ও মাতৃত্বকালীন সেবা প্রাপ্তি এবং পরিষ্কার জ্বালানি প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এমআইসিএস ২০১৯ অনুসারে, ৭৫ শতাংশ খানার ক্ষেত্রে প্রসূতি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার অনেকটা স্থবির পর্যায়ে রয়ে গেছে। ২০১২ থেকে ২০১৯ সময়কালে প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হারে অগ্রগতি হয়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৬৫ (০.৬৫) শতাংশীয় পয়েন্ট। নিরাপদ পানযোগ্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ খানার ক্ষেত্রে। আর বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছেছে ৯২ দশমিক ২৩ শতাংশ খানায়।

সারণি ১.৬: মৌলিক সেবা প্রাপ্তির প্রবণতা

	২০১২	২০১৯
মানসম্মত পয়োনিষ্কাশন সুবিধাপ্রাপ্ত খানা সদস্যের অনুপাত	৫৫.৯	৮৪.৬
পরিষ্কার জ্বালানি সুবিধা পাওয়া খানার অনুপাত	৯.৯	১৯
প্রসূতি ও মাতৃত্বকালীন সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে খানার অনুপাত	৫৮.৭	৭৫.২
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার	৭৯.৫	৮২.৬
মানসম্মত সুপেয় পানির সুবিধা পাওয়া খানা	...	৯৮.৫
বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় থাকা খানার অনুপাত	...	৯২.২৩

সূত্র: বিবিএস ও ইউনিসেফ: এমআইসিএস

সূচক ১.৫.১: দুর্যোগের ফলে প্রতি লাখ জনসংখ্যায় মৃত্যু, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অনুপাত

ভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ স্বভাবতই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। বাংলাদেশের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালার উপস্থিতি আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এখানে প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে নদীকেন্দ্রিক বন্যা, নদীভাঙন, আকস্মিক বন্যা (উজানের ঢল), গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা, খরা ও ভূমিধস। ভূমিকম্পও বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকি। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির শিকার, বাংলাদেশ তার অন্যতম। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা ও ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

একটি ব্যাপকভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠায় সরকার বহু বছর ধরেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। দুর্যোগকেন্দ্রিক ঝুঁকি কমানো ও এর প্রভাব প্রশমনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ও স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিকদের গৃহীত নানা পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। ২০১৫ সালে বিবিএস প্রণীত 'মানবজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৪ সালে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ১২ হাজার ৮৮১ জন জলবায়ু-সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সূচক ১.৫.২: প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বৈশ্বিক জিডিপির অনুপাতে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতি

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বিদ্যমান ভৌত সম্পদের সামগ্রিক বা আংশিক ক্ষতির আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত ভৌত সম্পদের মধ্যে রয়েছে ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, বাণিজ্যিক ও সরকারি ভবনসমূহ, পরিবহন, জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও অন্যান্য অবকাঠামো; বাণিজ্যিক সম্পদ ও শিল্পকারখানা; এবং কৃষি অবকাঠামো, প্রাণিসম্পদ ও ফসলহানি। ২০১৫ সালে বিবিএস প্রণীত বাংলাদেশের দুর্যোগ-সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০১৪ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে পরিমাণ সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল, তা ছিল ওই বছরের মোট জিডিপির ১ দশমিক ৩ শতাংশ (দুর্যোগের ক্ষতি হিসাব করার ক্ষেত্রে ক্ষতির এ চিত্রকেই বর্তমানে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়)।

সূচক ১.৫.৩: দুর্যোগঝুঁকি কমাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রণীত সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০-এর সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

টেকসই উপায়ে দুর্যোগঝুঁকি কমানোর বিষয়ে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার আওতায় সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হলো–ব্যক্তি, বাণিজ্য, জনসমষ্টি সর্বোপরি দেশের জীবনজীবিকা, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনীতি এবং ভৌত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগঝুঁকি প্রশমিত করা। এ চুক্তিতে সাতটি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও চার ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। চুক্তিতে দেশগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি; বরং সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার যাতে নিজ দেশের দুর্যোগঝুঁকি কমানোর বিষয়ে ছক নির্ধারণে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তবে এ দায়িত্বগুলোয় অন্যান্য অংশীজন, যেমন স্থানীয় সরকার ও ব্যক্তি খাতের সঙ্গে ভাগাভাগির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে 'দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক (এসএফডিআরআর, ২০১৫-২০৩০) ও অন্য যেসব আন্তর্জাতিক প্রটোকলে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে, সেগুলোর নির্দেশনার আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনা (এনপিডিএম, ২০১৬-২০২০) প্রস্তুত করেছে। এনপিডিএম ২০১৬-২০২০ হচ্ছে কতগুলো কৌশলগত লক্ষ্যের সমষ্টি, যেটিতে এসএফডিআরআর-এর বিভিন্ন নির্দেশনা স্থান পেয়েছে। কৌশলটিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সম্ভাব্য বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও দুর্যোগঝুঁকি কমাতে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচির বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এনপিডিএমে কিছু কর্মপন্থার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করা, ঝুঁকি প্রশমনে অন্তত ২০টি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ বাস্তবায়নের পন্থা নিরুপণ, খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা, সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি করা, উদ্যোগের অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করা, সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন অংশীজনের গৃহীত যে কার্যক্রম সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দর্শনকে প্রতিফলিত কওে, তা নিশ্চিত করা।

সূচক ১.ক.২: বিভিন্ন সেবায় মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাত (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা)

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার মতো জরুরি সেবা প্রদানের বিষয়ে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার এসব খাতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে মোট সম্পদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ নিশ্চিত করেছে। এসব খাতে সরকারি ব্যয়ে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাতে বিভিন্ন বছর এ খাতের বরাদ্দের অঙ্কে কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব জরুরি সেবায় সরকারি ব্যয়ের অনুপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বছরটিতে মোট সরকারি ব্যয়ের ৪ দশমিক ৮১ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে, ১২ দশমিক ৮২ শতাংশ শিক্ষায় এবং ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারি ব্যয়ের অনুপাত বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ফের ব্যয়ের অনুপাত হ্রাস পেয়ে ৪ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের অনুপাত ছিল ১৫ দশমিক ১৫ শতাংশ। তবে এর পরের অর্থবছরই তা আবার কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরকারের মোট ব্যয়ের কমবেশি ১৫ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয়িত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ ব্যয়ের অনুপাত কিছুটা কমে ১৪ দশমিক ২ শতাংশে নেমে আসে।

সারণি ১.৭: মোট ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিভিন্ন সেবায় সরকারি ব্যয়ের অনুপাত (শতাংশ)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৯-২০
ডশক্ষা	১২.৮২	১৫.১৫	১৪.৪২	১৫.২০
স্বাস্থ্য	৪.৮১	৪.৮০	৬.৫৩	৪.৯০
সামাজিক সুরক্ষা	১২.৭২	১৩.৬০	১৫.২৫	১৪.২০

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

১.৩ এসডিজি-১ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

এসডিজি-১ অর্জনে সরকারের গৃহীত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ রয়েছে তার মধ্যে নানা আন্তঃসংযোগ বিদ্যমান। দারিদ্র্যবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাফল্য এক্ষেত্রে অধিকতর উন্নয়নের সম্ভাব্য সুযোগের ইঙ্গিত প্রদান করে। ক্রমবর্ধমান অসমতা দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে। অনুরূপভাবে সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দারিদ্র্য দূরীকরণের গতি ত্বরান্বিত করাও মানব উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের কার্যক্রম দারিদ্র্যের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিশেষত চরম আয়বৈষম্যের শিকার মানুষের অভিঘাত-সহনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণে প্রধান দুটি উপায় হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক শ্রমশক্তি অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আবর্তন জাল বিস্তৃত করে তাদের এ কর্মসূচির আওতায় আনা গেলে তা এসডিজি-১ অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

দ্রুততর, অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও ঘাতসহনশীল প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশ দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সংবেদনশীল ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজনশীল করতে সহায়ক নীতি গ্রহণ করেছে। বিনিয়োগ হার বাড়ানো, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, দক্ষ শ্রমশক্তি বৃদ্ধিকরণ, অবকাঠামো খাতে মৌলিক অগ্রগতি এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য নতুন ধরনের প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়ে সহায়ক নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এলএনওবি নীতির বাস্তবায়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিনিয়োগ: প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর উদ্যোগের পাশাপাশি তা অন্তর্ভুক্তিমূলক করার বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: সমৃদ্ধি বাড়ানো ও সবার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে সকলের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করণে 'জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল–বাংলাদেশ (এনএফআইএস-বি)' বা National Financial Inclusion Strategy Bangladesh, ২০২০-২০২৪ সফলভাবে প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন ঘটাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এলএনওবি নীতির বাস্তবায়নে পৃথক তহবিল সৃষ্টি, এ খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, সামাজিক ও জেন্ডার অসমতা দূরীকরণ এবং বৈষম্য রোধের নীতি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা: বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি কাঠামোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যা দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক হবে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের ঘরে সীমিত রাখা, নিম্ন বাজেট ঘাটতি বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের উন্নয়ন এবং অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি তৈরি করে যা টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়েছে।

দারিদ্র্য বিলোপে সরকারি উদ্যোগ 'স্বপ্ন'

'উৎপাদনশীল নতুন সুযোগের নিমিত্ত নারীর সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ (স্বপ্ন) বা Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) হচ্ছে চরম দরিদ্র নারীদের অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে সরকারের একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন ঘটাতে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হয়। প্রধানত এ প্রকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেয়। বিশেষ করে ভবিষ্যতে যাতে এসব গ্রামীণ হতদরিদ্র নারী বিভিন্ন ধরনের কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়, সে বিষয়ে এ প্রকল্প কাজ করে। দারিদ্র্য বিলোপ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টিকে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'স্বপ্ন' বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ ও সেগুলোর কার্যকারিতা নিরীক্ষা করে। পাশাপাশি এক ধরনের অনুকরণীয় মডেলের উন্নয়ন ঘটিয়ে সামাজিক সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। মূলত সুশাসন নিশ্চিত করা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে শক্তিশালী করাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। স্বপ্নের প্রধান উদ্দেশ্য- মানবসম্পদ, জীবিকা ও জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটিয়ে ৬৫ হাজার গ্রামীণ হতদরিদ্র পরিবারের ইতিবাচক উন্নয়ন।

অভিবাসন ও প্রবাসী আয়: বাংলাদেশে গ্রামীণ মজুরি এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অসচ্ছল পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রবাসে শ্রমিক শোষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নারী কর্মীদের ওপর সহিংসতার ঝুঁকিও বিদ্যমান। নারীসহ বিদেশ গমনেচ্ছু সকল কর্মীর নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক ও আইনসিদ্ধ বিদেশযাত্রা নিশ্চিত করতে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' প্রণয়ন এবং 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬' গ্রহণ করা হয়েছে। রপ্তানির জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং নির্বিঘ্ন বিদেশযাত্রা ও অভিবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার এসব নীতি গ্রহণ করেছে। ২০১৯ সালে বার্ষিক রেমিট্যান্স ১ হাজার ৮৩২ কোটি (১৮.৩২ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

জেন্ডার সমতা: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জেন্ডার সমতা অর্জিত হলেও শ্রমবাজারে তার প্রতিফলন এখনো দেখা যাচ্ছে না। গ্রামীণ শ্রমবাজারে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৭ সালে শ্রমবাজারে পুরুষের বিপরীতে নারীর অংশগ্রহণের হার ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়, ২০১৬ সালে যা ছিল ৪১ শতাংশ। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এখনো প্রধান খাত কৃষি। এ খাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যকার মজুরির ব্যবধান কমাতে সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: আর্থিক ব্যবস্থাপনা সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা দারিদ্র্য বিলোপে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যেসব দরিদ্র মানুষ আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার বাইরে অবস্থান করছে, তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশকিছু উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ভ্রাম্যমাণ আর্থিক সেবা চালু করা (মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আর্থিক সেবাদান), ব্যাংকের অন্তত ৫০ শতাংশ শাখা গ্রামাঞ্চলে স্থাপন, এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু করা, কৃষকদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা এবং শিশুদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা গড়ে তুলতে স্কুল ব্যাংকিং চালু করা। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া জোরদার করতে দেশে সম্প্রতি জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (২০২০-২০২৪) প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ্রামীণ রূপান্তর: চলমান গ্রামীণ রূপান্তর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামাঞ্চলে উপার্জনের নামামুখী উৎস সৃষ্টি করা। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত খাতে উচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা, রেমিট্যান্সের প্রবাহ ও প্রকৃত শ্রম মজুরি বাড়ানো, আন্তঃজেলা পরিবহন সংযোগের উন্নয়ন এবং ভ্রাম্যমাণ আর্থিক সেবা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সরকার সহায়ক নীতি গ্রহণ করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) গ্রামীণ সমৃদ্ধির এসব নিয়ামককে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি উপার্জনের নানামুখী উৎস সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আয়বৈষম্য হ্রাসকরণ: সামষ্টিক অন্তর্ভুক্তি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য প্রধান অন্তরায়। আয়বৈষম্য কমাতে সরকারের নীতিকাঠামোয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো উন্নয়নের সুফল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও বণ্টনব্যবস্থার জন্য সহায়ক আর্থিক (ফিসক্যাল) নীতি গ্রহণ, যাতে একটি প্রগতিশীল ব্যক্তিগত আয়কর পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনচক্রভিত্তিক রোজগার নিশ্চিত করা যায়।

১.৪ এসডিজি ১ অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ

দারিদ্র্য, বিশেষ করে চরম দারিদ্র্য অত্যন্ত জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যাগুলোর একটি। এ থেকে উত্তরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সমন্বয়ে প্রত্যেক দেশের জন্য নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। হতদরিদ্র মানুষ সব সময় পিছিয়ে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশের অভাবে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। চরম দারিদ্র্যের অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব কোনো পছন্দ বা সুযোগ প্রাপ্তির সক্ষমতা থাকে না। তারা মৌলিক মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত এবং সমাজের কর্মকাণ্ডে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে না। একজন হতদরিদ্র মানুষ যেসব সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করে, তার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়া, পর্যাপ্ত খাদ্য ও পোশাকের অভাব, জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজের অভাব অথবা খাদ্য উৎপাদনের জমির সংকট এবং ঋণ প্রাপ্তিতে অক্ষমতা। এসবের অর্থ হলো ক্ষমতাহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিবার ও সমাজ থেকে বিযুক্তি। এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে প্রান্তিক পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য এবং স্বচ্ছ পানি ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি ১ অর্জনে সমন্বিত সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। এসডিজি অর্জনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনে যে ম্যাপিং করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, এ অভীষ্ট অর্জনে ৪৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সংযুক্ত। কাজেই এ অভীষ্টে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এসডিজি ১ এর সাথে সম্পর্কিত মূল চ্যালেঞ্জ সমূহ:

- সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষ করে বৈদেশিক উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ;
- জাতীয় অর্থায়ন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন ও জুতসই প্রচেষ্টার পাশাপাশি লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথার্থতা অবলম্বন করতে হবে;
- মধ্যম আয়ের ফাঁদ বাংলাদেশের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের (এলএমআইসি) মর্যাদা লাভ করে। এখন যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এ মধ্যম আয়ের ফাঁদ অতিক্রম করে উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধি ও এমডিজি ১ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া;
- এসডিজি ১-এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন আরেকটি চ্যালেঞ্জ। চরম দারিদ্র্য নিরসনে ২০১৭ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ১৪ বছর ধরে প্রতিবছর এ খাতে অতিরিক্ত ৩ হাজার ৯৪০ কোটি (৩৯.৪ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার ব্যয় করার প্রয়োজন পড়বে;
- এসডিজি ১-এর অগ্রগতি পরিমাপ করতে প্রয়োজনীয় গুণগত মানসম্পন্ন উপাত্ত প্রস্তুত করা ও অন্য সংস্থার উপাত্ত ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পেশাগত সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়াতে হবে;
- বাংলাদেশে বহু পরিবার দারিদ্র্য রেখার কাছাকাছি অবস্থান করছে এবং যেকোনো ধরনের অভিঘাত এসব পরিবারকে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিতে পারে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণের সফলতাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে;
- বাংলাদেশে প্রায়ই বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। এসব দুর্যোগ এসডিজি ১ বাস্তবায়নে বিরাট চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার জন্য এ চ্যালেঞ্জ আরও বেশি। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট মোকাবিলা এ অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

দেশের জন্য উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি সব পর্যায়ের দারিদ্র্য নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় আনতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সকল নারী-পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি মৌলিক সেবায় অভিগম্যতা, সম্পদের মালিকানা ও ভূ-সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ এবং আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে নারী-পুরুষের সমতা বিধান করতে হবে।

দরিদ্র ও যারা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির শিকার, তাদের অভিঘাত মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট অভিঘাতসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট দারিদ্র্য ও ঝুঁকিপূর্ণতা থেকে রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিভিন্ন উৎস থেকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সম্পদের সংগ্রহ বাড়াতে হবে। সকল মাত্রার দারিদ্র্য বিলোপে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও নীতির বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত ও সম্ভাব্য উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে বিচক্ষণ নীতি কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এমন একটি চাকরি কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যা কেবল দক্ষতাভিত্তিক হবে না; চাকরির নতুন উৎস চিহ্নিত করাও হবে সে কৌশলের লক্ষ্য। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অব্যাহতভাবে বর্ধিত মাত্রায় চাকরি সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ (এসইজেড), রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহ (ইপিজেড), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), ক্ষুদ্র উদ্যোগ, স্বকর্মসংস্থান (আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক) এবং কৃষি খাত (মৎস্যচাষ ও প্রাথমিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের যেকোনো নীতি-কৌশলে শ্রমবাজারে যুবসমাজ ও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী, আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভৌগোলিক বৈষম্যের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। উপাত্তভাণ্ডার, কর্মীদের প্রোফাইল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নও জরুরি। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ চাকরি সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। সেতু, সড়ক ও বিমানবন্দরের মতো প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে গুণগত কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্তারোপ করা প্রয়োজন। শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সংস্কার দরকার। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মে নিয়োগের উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো এবং বাজারমুখী কর্মের জন্য গুণগত প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে।

'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়ন দরকার। এ ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং দলিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিতে তাদের জন্য কোটাসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা এবং উপযুক্ত চাকরি সৃষ্টি করতে হবে।

জীবিকা, কৃষি ও অবকাঠামোর ওপর ভয়াল প্রভাব বিস্তার করে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। এ পরিস্থিতি থেকে মানুষকে রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনার সঙ্গে উপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগাড় করার উদ্যোগ নিতে হবে।

যদিও সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশের উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে, তথাপি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তারা এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তৃণমূল পর্যায় ও দুর্গম এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় মানুষকে সহায়তা করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোও (এনজিও) এসডিজি অর্জনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির বিষয়ে সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে ভূমি উন্নয়ন, জ্বালানি, বাণিজ্য সেবাসমূহ, কার্যকর চুক্তি সম্পাদন ও কর ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এসব নিশ্চিত করা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার হলেও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। অবকাঠামো ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান ঘাটতি ও বাণিজ্য সেবাসমূহের উন্নয়ন ঘটাতে সরকারি খাতেও বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। এ জন্য বাড়তি সম্পদ আহরণের বিষয়ে জোর দিতে হবে।

চরম দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন এবং অসমতা ও ঝুঁকিপূর্ণতা কমাতে সরকারের গৃহীত ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (এনএসএসএস) সময়মতো বস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার সরাসরি কর্মসৃজনে কিছু কর্মসূচি চালু রেখেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (এফএফডব্লিউ) বা কাবিখা কর্মসূচি ও জাতীয় সেবা (এনএস)। এসব কর্মসূচি দরিদ্রদের কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে ভূমিকা রাখছে।

১.৬ সারকথা

১৯৯১-৯২ সালের পর থেকে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগী অগ্রগতি অর্জন করেছে। উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাতের ভিত্তিতে জাতীয় দারিদ্র্য ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে, ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে এবং ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে নেমে আসে। এছাড়া নিম্ন দারিদ্র্য বা চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাতও ১০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। একইভাবে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আচ্ছাদনের আওতা এবং মোট সরকারি ব্যয়ে প্রধান সেবাসমূহের (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা) জন্য বরাদ্দ অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোর ইতিবাচক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আগামী বছরগুলোয় উচ্চ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যদি বিদ্যমান আয়বৈষম্য দারিদ্র্য নিরসনে প্রবৃদ্ধির ভূমিকাকে বাধাগ্রস্ত না করে, তাহলে এসডিজি-১ অর্জনের মাইলফলক স্পর্শ করা কঠিন হবে না।

দ্রুতগতির অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ঘাতসহনশীল প্রবৃদ্ধি জোরদার করার মাধ্যমে দেশে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকার নানা নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মানব উন্নয়নে উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ, এলএনওবি নীতির বাস্তবায়নে সামাজিক নিরাপত্তা জাল ও অন্যান্য কর্মসূচি জোরদারকরণ, জেন্ডার সমতা অর্জন, গ্রামীণ রূপান্তর শক্তিশালীকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিতকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এসডিজি অর্জনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাগুলোর অন্যতম। সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষ করে বৈদেশিক উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা, এনএসএসএস বাস্তবায়ন, বিবিএসের পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানো, মধ্যবিত্তের ভঙ্গুরতা রোধ এবং দারিদ্র্য বা গভীর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হওয়ার ঝুঁকি রোধ করা আগামী দিনের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসডিজি ১ অর্জনে বাংলাদেশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এসব প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে কর্মসৃজনে গুরুত্ব প্রদান, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের অভিঘাত প্রশমিত করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

২

ক্ষুধামুক্তি

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

২.১ এসডিজি ২ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২০১৯ (State of Food Security and Nutrition in the World 2019 Report)-এর হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮২ কোটি (৮২০ মিলিয়ন) মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করে। এ পরিস্থিতি ২০৩০ সালের মধ্যে ধরিত্রী থেকে ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্য অর্জনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্ম দিয়েছে। আফ্রিকার প্রায় সব উপ-অঞ্চলে ক্ষুধার সমস্যা বাড়ছে। তবে লাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় সমস্যাটির প্রকটতা কিছুটা কম। দক্ষিণ এশিয়া ক্ষুধামুক্তিতে ভালো অগ্রগতি অর্জন করলেও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এ উপ-অঞ্চলে পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি।

২০১৯ সালের বৈশ্বিক প্রতিবেদনমতে, ভারতে উচ্চ মাত্রার বেকারত্ব ও পাকিস্তানে অর্থনৈতিক নিম্নগামিতা এ অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় এক দশকের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকলেও গত তিন বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে প্রায় ৮২ কোটি ১৬ লাখ (৮২১.৬ মিলিয়ন) মানুষ অপুষ্টির শিকার হয়েছিল, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ। অপুষ্টির শিকার এ জনসমষ্টির মধ্যে এশিয়াতেই রয়েছে ৫১ কোটি ৩৯ লাখ (৫১৩.৯ মিলিয়ন), আর আফ্রিকায় ২৫ কোটি ৬১ লাখ (২৫৬.১ মিলিয়ন)।

আরেকটি উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ সহনীয় মাত্রা অথবা চরম মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সম্মুখীন। এসব মানুষ প্রতিনিয়ত পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাবারের অভাবের মুখোমুখি হয়, যা অপুষ্টিজনিত সমস্যা ও ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করছে। সাধারণত এ সমস্যা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে বিরাজমান থাকলেও উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মতো উচ্চ আয়ের অঞ্চলেও ৮ শতাংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার সহনীয় মাত্রা অথবা চরম ঝুঁকিতে থাকে। আর সর্বত্রই পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে উক্ত ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব বেশি। পুষ্টি সূচকের বিচারেও পরিস্থিতি বেশি ভালো নয়। ২০১৮ সালের প্রাক্কলন অনুযায়ী, বৈশ্বিক মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ দশমিক ২ শতাংশ (৭০ কোটি ওপরে) চরম মাত্রার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। এ ঝুঁকির কারণে নির্দিষ্ট মাত্রায় খাদ্য গ্রহণের অভাবে এ সকল মানুষ প্রায় ক্ষুধার্ত থেকেছে।

২০১৫ সালে স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেওয়া প্রতি ৭ জন শিশুর ১ জন (বিশ্বব্যাপী ২ কোটি ৫ লাখ) কম ওজন নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কম ওজনের শিশু জন্ম দেওয়া বেশিরভাগ মা ছিল কিশোরী বয়সের। স্থূলতা ও বাড়তি ওজনের হারও অতিরিক্ত উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে। বিশ্বের সব অঞ্চলেই স্থূলতা ও বাড়তি ওজনের প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষ করে স্কুলগামী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ হার বেশি। স্থূলতা বছরে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০ লাখ (৪ মিলিয়ন) মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং সব বয়সের মানুষের মধ্যে এটি রুগ্ণতার বিস্তার ঘটাচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের যেসব দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে রয়েছে, সেখানে ক্ষুধাজনিত সমস্যার প্রবণতা বাড়ছে। খাদ্য সংকটের বিচারে বলা যায়, অর্থনৈতিক অভিঘাত ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার তীব্রতাকে আরও দীর্ঘায়িত এবং চরম মাত্রা দান করে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিচক্ষণতার সঙ্গে বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা কমানো ও সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে করে খুব সহজেই যেকোন অর্থনৈতিক মন্দা দ্রুততার সাথে প্রতিহত করা যায়। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা যেন দারিদ্র্যবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোগত রূপান্তরের সহায়ক হয়, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যার কেন্দ্রবিন্দু হবে সকল শ্রেণির জনগণ ও সম্প্রদায়। এতে করে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা কমানোর পাশাপাশি কাউকে পেছনে না ফেলে ক্ষুধামুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সব ধরনের পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ সম্ভব হবে।

অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদানের তুলনায় এ খাতে সরকারি ব্যয় কমেছে প্রায় ৩৭ শতাংশ। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী এ অনুপাত হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.২৬; ২০০১ সালে যা ছিল ০.৪২। এছাড়া আশির দশকের মাঝামাঝি উন্নয়নশীল দেশগুলোয় আন্তর্জাতিক দাতাদের প্রদত্ত অনুদানের ২৫ শতাংশ বরাদ্দ থাকত কৃষিতে। ২০১৭ সালে তা মাত্র ৫ শতাংশে নেমে আসে। অর্থাৎ কৃষিতে মোট আন্তর্জাতিক অনুদান কমেছে ১ হাজার ২৬০ কোটি (১২.৬ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার।

এসডিজি-২-এর লক্ষ্য হলো ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা অবসানের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও ক্ষুদ্র আকারে খাদ্য উৎপাদনকারী জনগোষ্ঠীর আয় বাড়াতে হবে। এ অভীষ্ট অর্জনের প্রধান উপায় টেকসই খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি ও ঘাতসহনশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন। যেসকল টেকসই কৃষি ব্যবস্থায় জীববৈচিত্র্য ও জিনগত বৈশিষ্টসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়, তা ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ টেকসই কৃষি প্রবর্তন করতে হলে পল্লী অবকাঠামো এবং কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বর্ধিত

কৃষি উৎপাদন খাদ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করলেও মানসম্মত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজন বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, রপ্তানি ভর্তুকি হ্রাস ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেখাদ্যের দক্ষ বাজার ব্যবস্থা প্রচলন। ন্যায্যতাভিত্তিক খাদ্যপণ্য বাজার নিশ্চিত করতে হলে বাজারের প্রকৃত তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে হবে, যাতে পণ্যের দাম খুব বেশি ওঠা-নামা না করে।

২.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ২-এর অগ্রগতি পরিমাপ

সূচক ২.১.১: পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা

যেসকল উপাদান দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখে, পুষ্টিহীনতা তার মধ্যে অন্যতম। কম বয়সে পুষ্টিহীনতার শিকার শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এতে তাদের শিক্ষণের সক্ষমতাও কমে যায়। একজন পুষ্টিহীনতার শিকার মানুষ খুব সহজেই বিভিন্ন রোগশোকে আক্রান্ত হয়। এছাড়া তাদের চিকিৎসা ব্যয়ও পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা পরিবারিক দারিদ্র্যকে অধিকতর খারাপ করে তোলে। পুষ্টিহীনতা কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ২০১৯ সালের হিসাবমতে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার শিকার মানুষের অনুপাত ১৪ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে, ২০১৬ সালে যা ছিল ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ। ওই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে স্থূলতাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশে। তবে নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কমেছে। এছাড়া ২০১২ সালে রক্তস্বল্পতায় ভোগা নারীর হার ছিল ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশে।

সারণি ২.১: পুষ্টিহীনতার হার

	২০১৬	২০১৮
জনসমষ্টির মধ্যে পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতার হার	১৬.৪	১৪.৭

সূত্র: এফএও, দ্য স্টেট অব ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ২০১৯

২.১.২ ফুড ইনসিকিউরিটি এক্সপেরিয়েন্স স্কেলের (এফআইইএস) ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে সহসীয় ও চরম মাত্রার খাদ্য ঘাটতির প্রবণতা

একটি দেশের জনসংখ্যার কত শতাংশ খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহনীয় ও চরম মাত্রার ঘাটতির মুখোমুখি হয়, তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করার ব্যবস্থা করে এ সূচক। একটি খানা বা একজন ব্যক্তি কী ধরনের খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়, তা ফুড ইনসিকিউরিটি এক্সপেরিয়েন্স স্কেলে (এফআইইএস) পরিমাপ করা হয়। এফএও'র ২০১৯ সালের প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ বছরটিতে সহনীয় অথবা চরম মাত্রার খাদ্য ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছে।

সূচক ২.২.১ ও ২.২.২: পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে খর্বতার ব্যাপকতা (বয়সের তুলনায় উচ্চতা <-২ বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ-সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি) এবং ৫ বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে কৃশতা ও কম ওজন (বয়সের তুলনায় উচ্চতা >+২ অথবা <-২ বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ-সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি)

খর্বতা দীর্ঘ সময় ধরে পুষ্টির অপ্রাপ্যতাকে নির্দেশ করে এবং এটি দীর্ঘস্থায়ী রোগের অন্যতম ঝুঁকির কারণ। পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের খর্বতা কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৯৯৬-৯৭ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে খর্বকায় শিশুর হার অর্ধেকের বেশি হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে ৬০ শতাংশ খর্বকায় সমস্যার শিকার ছিল। ২০১৯ সালে এ হার নেমে এসেছে ২৮ শতাংশে (এমআইসিএম, ২০১৯)। এছাড়া কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কৃশতার শিকার শিশুর হারও অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০১৯ সালে দেশে কৃশতার শিকার শিশুর হার ৯ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে আসে, ২০১৪ সালে যা ছিল ১৪ শতাংশ। আর ২০০৭ থেকে ২০১৯ সময়ের মধ্যে বয়স অনুপাতে কম ওজনের শিশুর হারও প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০০৭ সালে কম ওজনের শিশুর অনুপাত ছিল ৪১ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা ২২ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসে। ২০১৯ সালের এমআইসিএস প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে অতিরিক্ত ওজনের শিকার শিশুর অনুপাত ২ দশমিক ৪ শতাংশ।

সারণি ২.২: পাঁচ বছরের নিচে শিশুর পুষ্টিগত অবস্থানের প্রবণতা (শতাংশ)

নির্দেশক	১৯৯৬-১৯৯৭	১৯৯৯-২০০০	২০০৪	২০০৭	২০১১	২০১৪	২০১৭	২০১৯
খর্বিত বিকাশ	৬০	৪৫	৫১	৪৩	৪১	৩৬	৩১	২৮
রুদ্ধ বিকাশ	১৭.৭	১০	১৫	১৭	১৬	১৪	৮	৯.৮
কম ওজন	...	...	...	৪১	৩৬	৩৩	২২	২২.৬
স্থূলতা	...	...	...	...	...	...	...	২.৪

সূত্র: নিপোর্ট, বাংলাদেশ ডিএইচএস, ২০১৮ ও এমআইসিএস ২০১৯

সূচক ২.৫.১: খাদ্য ও কৃষির জন্য মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষিত বিভিন্ন শস্য/গাছ ও প্রাণীর জিনগত সম্পদের ভান্ডার

খাদ্য ও কৃষির জন্য মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে শস্য/গাছ ও প্রাণীর জিনগত সম্পদের ভান্ডার সংরক্ষণ বলতে বিশ্বব্যাপী জিনগত সম্পদ সংরক্ষণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমকে নির্দেশ করে। প্রাণী ও গাছ/ফসলের বিভিন্ন জাত সংরক্ষণে একটি দেশ কোন মাত্রায় গুরুত্ব দিচ্ছে, তার ধারণা পাওয়া যায় সে দেশের জিনগত সম্পদ সংরক্ষণের চিত্র থেকে। মূলত ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদনে কাজে লাগানোর জন্য এগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে চিরতরে বিলুপ্ত না হয়ে যায়। বাংলাদেশে খাদ্য ও কৃষির জন্য মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন শস্য/গাছ ও প্রাণীর জিনগত সম্পদের সংরক্ষিত ভান্ডারের আওতা সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) হিসাবমতে, ২০১৫ সালে দেশে ১০ হাজার ১৫৭টি জিনগত সম্পদ সংরক্ষিত ছিল। ২০১৯ সালে তা ১১ হাজার ৮১টিতে উন্নীত হয়েছে।

সূচক ২.৫.২: ঝুঁকিগ্রস্ত, ঝুঁকিবিহীন বা বিলুপ্তি ঝুঁকির অজানা পর্যায়ভুক্ত–এমন শ্রেণিবিন্যাসে প্রাণিজাতের অনুপাত

দেশে বর্তমান প্রাণিজাতের মধ্যে কতগুলো দেশীয় প্রজাতির এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেগুলো বিলুপ্তির কী মাত্রার জ্ঞাত ঝুঁকিতে আছে ও প্রাণিজাতের মধ্যে তাদের অনুপাত কেমন–সেসব বিষয় নির্দেশ করে এ সূচক। দেশীয় প্রজাতির মূল্যবান প্রাণিসম্পদের জাত রক্ষায় এ সূচক গুরুত্বারোপ করে। এ সংরক্ষণ ভবিষ্যতে বৈশ্বিক জনসমষ্টির জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় বহুমাত্রিক ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার প্রাপ্তিতে সহায়তা করে।

বহুমাত্রিক জিনগত সম্পদ সংরক্ষণ করা হলে তা ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী জাত উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি ও পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক বাস্তবতায় কী ধরনের প্রাণিজাত উপযুক্ত হবে, তা বাছাই করার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক জিনসম্পদ সংরক্ষণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঝুঁকিগ্রস্ত, ঝুঁকিবিহীন বা বিলুপ্তি ঝুঁকির অজানা পর্যায়ভুক্ত দেশীয় প্রাণিজাতের অনুপাত ও ঝুঁকির প্রবণতা জানা গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ওই সময় ঝুঁকিতে থাকা দেশীয় প্রজাতির সংখ্যা ৬৪টি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালে তা পাঁচটিতে নেমে আসে।

সূচক ২.ক.১: সরকারি ব্যয়ের জন্য কৃষিমুখিতা সূচক বা এগ্রিকালচারাল অরিয়েন্টেশন ইনডেক্স (এওআই)

এসডিজি ২ অর্জন করতে হলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এটা বাড়াতে হলে কৃষিতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগও প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকার কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, সংস্কার ও কৃষকদের জন্য প্রযুক্তির লভ্যতা নিশ্চিত করতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছে। অর্থনীতির অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষিতে সরকারি ব্যয়ের প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি কেমন, সে বিষয়ে ধারণা দেয় কৃষিমুখিতা সূচক (এওআই) ।শস্য, বনসম্পদ, মৎস্য ও শিকার মিলে কৃষি খাত। দেশের অর্থনীতিতে এসব খাতের যে মাত্রার অবদান, সে অনুপাতে সরকার এ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করছে কি না, সেটাই এওআই তুলে ধরে। যেভাবে এটি হিসাব করা হয়:

এওআই = ((কৃষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়/মোট সরকারি ব্যয়)/(কৃষিমূল্য সংযোজন/জিডিপি))

এওআইয়ের মান যদি ১-এর অধিক হয়, তাহলে বুঝতে হবে সরকার অর্থনীতিতে কৃষির অবদানের তুলনায় এ খাতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। আর যদি সূচকের মান ১-এর নিচে হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয়, অর্থনীতির অন্যান্য খাত সরকারের কাছে কৃষির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

কৃষিমুখিতা সূচকে ২০০১ সালে বাংলাদেশে প্রাপ্ত মান ছিল শূন্য দশমিক ০.২। ২০১৬ সালে এ মান দ্বিগুণ হয়। তবে ২০১১ সালের পর থেকে এটা বর্তমানে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে। এ চিত্র নির্দেশ করে, জিডিপিতে অবদানের ক্ষেত্রে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের তুলনায় সরকারি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে কৃষি কম গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থাৎ, বাজেট বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষিবহির্ভূত খাত বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। উন্নয়নশীল ও উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে এওআইয়েরমানে একটি বিশাল ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত,উন্নয়নশীল দেশগুলোয় যেখানে অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অংশ তুলনামূলক বেশি হয়, সেখানে এওআইয়ের মান খুবই ছোট হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অংশ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে এবং এখানে এওআইয়ের মান তুলনামূলক বেশি হয়। তবে পুষ্টিহীনতার সঙ্গে এওআইয়ের সরাসরি কোনো সংযোগ নেই। একই ধরনের পুষ্টিহীনতা বিরাজমান থাকা বিভিন্ন দেশের এওআই মান ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। আর কোনো দেশে এওআইয়ের মান কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। তবে এওআইতে মান অনেক নিচে থাকা দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের স্থায়িত্ব, কৃষি-সম্পর্কিত গবেষণা ও গণ-অবকাঠামো ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

সারণি ২.৩: বাংলাদেশে কৃষিমুখিতা সূচকের প্রবণতা, ২০০১-২০১৬

	২০০১	২০০৫	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
এওআই	০.২০	০.২৮	০.৫২	০.৫৮	০.৭৮	০.৫৬	০.৫৩	০.৪১

সূত্র: ইউএনস্ট্যাস্টস: এসডিজি সূচকসমূহ যঃঃঢ়ং://হংঃধঃং.ঁহ.ড়ৎম/ংফমং/রহফরপধঃড়ৎং/ফধঃধনধংব/?রহফরপধঃড়ৎ=২.ধ.১

সূচক ২.ক.২: কৃষি খাতে মোট বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ (সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দসহ অন্যান্য বরাদ্দ)

উন্নয়নশীল দেশে কৃষিতে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার এবং সংশ্লিষ্ট দেশের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা থাকে, এ দুইয়ের ব্যবধান কমাতে উন্নত দেশগুলো সহায়তা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের কৃষিতে মোট বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন বছর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ২০১৪ সালে কৃষিতে মোট বৈদেশিক অর্থপ্রবাহ ছিল ৩৬ কোটি ৩০ লাখ (৩৬৩ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। কিন্তু ২০১৭ সালে তা নেমে আসে ১৯ কোটি ২৫ লাখ ৮০ হাজার (১৯২ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন) ডলারে। ২০১৮ সালে এটা কিছুটা বেড়ে ১৯ কোটি ৪৪ লাখ ২০ হাজার (১৯৪ দশমিক ৪২ মিলিয়ন) ডলারে উন্নীত হয়। ২০১৯ সালে তা পুনরায় নেমে আসে ১৩ কোটি ১০ লাখ (১৩১ মিলিয়ন) মার্কিন ডলারে।

সারণি ২.৪: কৃষি খাতে মোট বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোট সরকারি ব্যয় (ঋণ ও অনুদান)	৩৪.৯৯	৬৫.০১	৩৬৩.০২	২১০.৫৭	১৭৭.৮৩	১৯২.৫৮	১৯৪.৪২	১৩১.০৯

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) এইমস ওয়েব পোর্টালের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে লেখকের নিজস্ব হিসাব

২.৩ এসডিজি ২ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়ন করে। উক্ত কৌশলের সঙ্গে এসডিজি-২ এবং ২০১৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর গভীর সংযোগ বিদ্যমান। সরকারের এ প্রচেষ্টা কৃষি ও সামগ্রিক পরিকল্পনাকে প্রগতিশীল করে তুলবে যাতে তা জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে সহায়তা করে।

স্বাভাবিক পুষ্টিসেবা প্রদানে দেশের নির্ধারিত পুষ্টিসেবা কর্মসূচির আওতায় সরকার জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস) বা National Nutritional Services (NNS) শিরোনামে একটি পরিচালন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া পুষ্টি উপাদান-সমৃদ্ধ যেসব শস্য উদ্ভাবিত হয়, সেগুলো সম্প্রসারণের দায়িত্ব পালন করে কৃষি মন্ত্রণালয় (এমওএ)।

প্রসবোত্তর ভিটামিন 'এ' প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি শিশুদের মাঝেও ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ জোরদার করা হয়েছে। লবণে আয়োডিন সংমিশ্রণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ শক্তিশালী করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রসূতি ও স্তন্যদানকারী মা এবং কিশোরীদের মধ্যে আয়রন-ফলিক এসিডসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য উপাদান (Food Supplement) বিতরণ

অব্যাহত আছে। কর্মজীবী নারীদের জন্য সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি তিন মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাস নির্ধারণ করেছে। এছাড়া পৃথক কর্মসূচির মাধ্যমে কৃমিনাশক (অ্যালবেনডাজল) ট্যাবলেট ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে জিংক ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচির আওতায় পুষ্টিগুণসম্পন্ন (ফরটিফাইড) চাল বিতরণ, নারীদের জন্য নগদ সহায়তা এবং পুষ্টিসংক্রান্ত আচরণগত পরিবর্তন (বিসিসি) চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের পুষ্টিমান অনেকটাই নির্ভর করে পানি, পয়োনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার গুণগত মানের ওপর। এ তিনটির সমন্বিত রূপকে বলা হয় 'ওয়াশ'। ওয়াশের এই তিন উপাদানের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে পয়োনিষ্কাশনে (স্যানিটেশন)। অগ্রগতির দিক দিয়ে পরের অবস্থানে আছে নিরাপদ পানযোগ্য পানির নিশ্চয়তা বিধানের বিষয়টি (যদিও আর্সেনিক এক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষতি সাধন করেছে)। তবে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (হাইজিন) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো প্রত্যাশিত মান থেকে পিছিয়ে আছে। ২০১৯ সালের এমআইসিএস প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে ৭৫ শতাংশ খানা হাত ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করে। গ্রামাঞ্চলে এ হার আরও কম; ৭১ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায়, গ্রামাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আরও অনেক বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে।

২.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

'জাতীয় খাদ্য কর্মসূচির নীতি পরিকল্পনা' (২০০৮-২০১৫) বা 'National Food Policy Plan of Action' ও 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ। খাদ্যশস্য উৎপাদন খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, যা ভবিষ্যতে টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন আগামী দিনে ফসল উৎপাদনে প্রধান ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ফসলে কীটপতঙ্গের আক্রমণসহ প্রটোজোয়া (আদ্যপ্রাণী), ব্যাকটেরিয়া ও বহুমাত্রায় ক্রিয়াশীল পরজীবীর আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। নানা ধরনের জটিলতার উদ্ভব হওয়ায় অনেক দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে আছে। বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা এমন ৬৪টি স্থনীয় প্রজাতির মাছ চিহ্নিত করেছে সরকার। কৃষিতে বৈদেশিক অর্থ সহায়তা বর্তমানে অত্যন্ত হ্রাস-বৃদ্ধিপূর্ণ প্রবণতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নানা কারণে প্রতিবছর শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে কৃষিজমি হারিয়ে যাচ্ছে। এটা কমে যাওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে কৃষিপ্রধান ভূমিতে নগরের সম্প্রসারণ, সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, জলাবদ্ধতা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া ও মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস, নদীভাঙন এবং লবণাক্ততা। এফএও ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী, গত তিন দশকে লবণাক্ততার কারণে ১ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর জমি চাষযোগ্যতা হারিয়েছে। সর্বোপরি কৃষি খাতের গবেষণা ও উন্নয়নে সরকারের বাজেট বরাদ্দ খুবই সীমিত। কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ কমে যাওয়ার ফলে মেধাবী কৃষিবিজ্ঞানীরা অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। কম বরাদ্দ একদিকে মেধাপাচার (ব্রেইন ড্রেইন) উৎসাহিত করছে, অন্যদিকে দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না। সীমিত অর্থ বরাদ্দের কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন কৃষি উপাদান প্রস্তুত ও সরবরাহ করা যাচ্ছে না, যা বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বীজ, সেচ, সার ও কীটনাশক। কৃষি খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ খাতে অর্থ সংকটের বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন।

অঞ্চলভেদে দেশে ক্ষুধার ব্যাপকতায় ভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগে ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্য নিরসনে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। ওই অঞ্চলের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে এবং অর্ধেক জনসমষ্টি চরম দারিদ্র্যের শিকার। এক-তৃতীয়াংশ শিশু এখনো খর্বতার শিকার এবং খাদ্যঘাটতির কারণে নারীরা এখনো বেশ দুর্দশার মধ্যে আছে।

নারীদের অপুষ্টি দূর করতে দেশে এখনো নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি। খর্বতা ও কৃশতার পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে স্থূলতা বৃদ্ধি নতুন সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। শহরাঞ্চলে কিছু সমস্যা কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাবারের সংকট (খাদ্যে ভেজাল), স্থূলতা বৃদ্ধি (বিশেষ করে নারীদের মধ্যে) এবং সংসার সামলে ঘরের বাইরে কাজ করা নারীর জন্য কঠিন হয়ে উঠছে, যা শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

এসডিজি-২ অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে জোর দিতে হবে, যা উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আয়ের অধিকতর সুষম বণ্টন, দ্রুত শিল্পায়ন ও শক্তিশালী বহিঃখাত প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। এ কৌশলের আওতায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সঙ্গে কৃষির শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ সংযোগ প্রয়োজন। চাহিদা ও জোগান উভয় দিক থেকেই এ সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। এতে দেশের অভ্যন্তরেই কৃষির বিশাল চাহিদা সৃষ্টি হবে, যা এ খাত থেকে অধিক মাত্রায় সুফল পেতে সহায়তা যোগাবে।

এসডিজি ২ অর্জনের বিষয়টি বাস্তবে রূপ দিতে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিষয় হলো আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। বেসরকারি ও সরকারি উভয় খাতই কৃষিপ্রযুক্তির সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারের বড় দায়িত্ব হলো গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো। প্রযুক্তি উন্নয়নের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা ব্যক্তি খাতের জন্য কঠিন। তাই স্থানীয় পর্যায়ে কোন অবস্থায় কোন ধরনের প্রযুক্তি উপযোগী হবে, তা কাজে লাগাতে জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতির উদ্যোগ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তির কার্যকর সম্প্রসারণে সরকারকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। উল্লেখ্য, এসডিজি-২ অর্জনের জন্য কৃষি-খাদ্য খাত, জনগণের জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সমন্বিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে কেবল এসডিজির অভীষ্ট অর্জনই মুখ্য নয়, বরং কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী ভিত্তির ওপর স্থাপনের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ উদ্দেশ্য সফল করতে বাংলাদেশের এমন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, যা প্রত্যাশিত রূপান্তর প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এই প্রত্যাশিত রূপান্তরের লক্ষ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে। যথা: উৎপাদনমুখী সম্পদ, অর্থ ও প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; উৎপাদন ও উপার্জন বহুমুখীকরণের উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ; কৃষি ও খাদ্য খাতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সৃষ্টি ও সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো; মাটির শস্য উৎপাদন গুণাগুণ ঠিক রাখা ও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ; টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার প্রচলন; এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

২.৬ সারকথা

দেশে পুষ্টিহীনতার অবস্থান ধীরে ধীরে নিম্নগামী হচ্ছে। ২০১৬ সালে মোট জনসমষ্টির মধ্যে ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল পুষ্টিহীনতার শিকার। ২০১৭ সালে তা ১৪ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে আসে। এ চিত্র থেকে এটি সহজেই অনুমেয় যে, এসডিজি-২ অর্জন পরিক্রমায় ২০২০ সালে পুষ্টিহীনতা ১৪ শতাংশে নামিয়ে আনার যে মাইলফলক নির্ধারণ করা হয়েছে, এ চিত্র থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সে লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। অনুরূপভাবে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে কৃশতার হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রেও ভালো অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৪ সালে কৃশতার শিকার শিশুর হার ছিল ১৪ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা ৯ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে আসে। তবে কৃষিমুখিতা সূচকে (এওআই) কিছুটা অবনতি হয়েছে; এ সূচকে বাংলাদেশের মান শূন্য দশমিক ৫ (০.৫) থেকে শূন্য দশমিক ৪-এ (০.৪) নেমে এসেছে। এ নিম্নগামিতা নির্দেশ করে, দেশের মোট জিডিপিতে কৃষির যে অবদান, সেই অনুপাতে এ খাত সরকারি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে কম গুরুত্ব পাচ্ছে। কৃষিতে মোট বৈদেশিক সহায়তা কমতে থাকার কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতার ধরন ও প্রাধিকার পরিবর্তন হওয়া। এসডিজিতে কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর উচিত এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সে অনুসারে তাদের সহায়তার ধরন নির্ধারণ করা। নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার মাপকাঠিতে পুষ্টিহীনতার যে পরিমাপ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, দেশে ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে তাদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার প্রবণতা কমেছে। ২০১২ সালে অপুষ্টির শিকার নারীর হার ছিল ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০১৭ সালে তা ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে আসে। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্থূলতা উদীয়মান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১২ সালে স্থূলতার হার ছিল ২ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করেছে, যা এসডিজি-২-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে এরই মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসডিজি-২ অর্জনে গৃহীত সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ, প্রসূতি ও স্তন্যদানকারী মা এবং কিশোরীদের মধ্যে আয়রন-ফলিক এসিডসমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য উপাদান (Food Supplement), শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক বিতরণ, লবণ আয়োডিন-সমৃদ্ধকরণ, স্তন্যদান নির্বিঘ্ন করতে মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়ানো এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে 'ওয়াশ' কর্মসূচি জোরদারকরণ।

'জাতীয় খাদ্য কর্মসূচির নীতি পরিকল্পনা' (২০০৮-২০১৫) বা 'National Food Policy Plan of Action' ও 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ। খাদ্যশস্য উৎপাদন খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, যা ভবিষ্যতে টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন আগামী দিনে ফসল উৎপাদনে প্রধান ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ফসলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ বৃদ্ধি এবং প্রটোজোয়া (আদ্যপ্রাণী), ব্যাকটেরিয়া ও বহুমাত্রায় ক্রিয়াশীল পরজীবীর আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। নানা ধরনের জটিলতার উদ্ভব হওয়ায় ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কৃষি খাতে বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহে ব্যাপক হারে হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এসডিজি ২ অর্জনে সরকার কৃষির অর্থায়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী নীতি প্রণয়ন করেছে।

৩ সুস্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ

সকল বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান, উন্নত পুষ্টির ব্যবস্থা করা এবং টেকসই কৃষি উৎসাহিতকরণ

৩.১ এসডিজি ৩ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বৈশ্বিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় দেখা যায়, লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি হয়েছে। এছাড়া প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করা এবং প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সারাবিশ্ব বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে এখনো বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নৈমিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং অনেকেই চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে বড় ধরনের অর্থসংকটে পতিত হয়, যা তাদের চরম দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত করে। সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সবার সম্মিলিত প্রয়াস ও টেকসই বিনিয়োগ প্রয়োজন। পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যসেবাসহ অসংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসার পথে উদ্ভূত প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা, জীবাণু ও বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মতো সুস্বাস্থ্যের নির্ধারকের উন্নয়ন ঘটাতে উদ্যোগ নিতে হবে।

২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী ৮১ শতাংশ শিশুর জন্ম দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় হয়েছিলো। কিন্তু সাব-সাহারা আফ্রিকায় এ হার ছিল মাত্র ৫৯ শতাংশ। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী প্রতি হাজার জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুর মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৯ জনে নেমে এসেছে। এসব মৃত্যুর অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য ছিল। এর মধ্যে অর্ধেক বা প্রায় ২৫ লাখ (২ দশমিক ৫ মিলিয়ন) শিশুর মৃত্যু হয়েছে এক মাস বয়সের আগে। শিশুদের জন্মের পর প্রথম মাসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী নবজাতক মৃত্যুর হারও দীর্ঘদিন ধরে কমতির ধারায়। ২০০০ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে নবজাতক মৃত্যুর হার ছিল ৩১। ২০১৭ সালে তা ১৮ জনে নেমে আসে। বিশ্বব্যাপী সন্তান ধারণের জন্য নারীদের সাধারণ বয়সসীমা ১৫ থেকে ৪৯ বছর। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, এ বয়সি নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্মনিরোধ পদ্ধতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৭৬ শতাংশ নারী। ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী, ওই সময় প্রতি হাজার গর্ভধারণকারীর মধ্যে ৫৬ জন ছিল কিশোরী। কিশোরী বয়সে সন্তানধারণের এ হার ২০১৯ সালে হাজারে ৪৪ জনে নেমে আসে। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৪০ শতাংশ দেশের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ হাজার মানুষের বিপরীতে ১০ জনেরও কম চিকিৎসক রয়েছেন। আর ৫৫ শতাংশেরও বেশি দেশের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ হাজার জনের বিপরীতে সেবিকা ও দক্ষ ধাত্রী আছেন ৪০ জনেরও কম। বিশ্বের সব স্বল্পোন্নত দেশেই প্রতি ১০ হাজার জনগোষ্ঠীর বিপরীতে ১০ জনের কম ডিগ্রিধারী ডাক্তার, পাঁচজনের কম মেডিকেল পাস করা ডেন্টিস্ট ও পাঁচজনের কম বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা ফার্মাসিস্ট আছেন। স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ দেশে ১০ হাজার জনগোষ্ঠীর বিপরীতে সেবিকা ও দক্ষ ধাত্রী আছেন ৪০ জনের কম।

২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে প্রকৃত হিসাবে বিশ্বব্যাপী মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে সকল উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা (ওডিএ) বেড়েছে প্রায় ৬১ শতাংশ। ২০১৭ সালে এ সহায়তার পরিমাণ দাঁড়ায় এক হাজার ৭০ কোটি (১০ দশমিক ৭ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ব্যয় করা হয়েছিল প্রায় ২০০ কোটি (দুই বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। এছাড়া যক্ষ্মা নিরাময়ে ১০০ কোটি (এক বিলিয়ন) এবং এইচআইভি এইডস ব্যতীত অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা হয়েছিল ২৩০ কোটি (২ দশমিক ৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। বর্তমানে কোভিড-১৯ নব্য বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ রোগ প্রতিরোধে সরকার, ব্যক্তি খাত ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব সমন্বয় প্রয়োজন। অর্থনীতিতে ঘাতসহনশীলতা বাড়ানোর জন্য ব্যক্তি খাতকে সহায়তা দিতে বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের কোভিড অ্যাকশন প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং বাংলাদেশ কীভাবে এ সংকট মোকাবিলা করছে, সে অভিজ্ঞতা ফোরামে অবহিত করা উচিত।

এসডিজি-৩ অর্জনে সকল বয়সের মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। অনেক রোগ পুরোপুরি নির্মূল এবং বিদ্যমান ও নতুন নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করতে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচেষ্টা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যব্যবস্থার আধুনিকায়নে বিচক্ষণতার সঙ্গে বিনিয়োগ বাড়িয়ে স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, সহজে চিকিৎসকের সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক দূষণ রোধে জনসাধারণকে সচেতন করার কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ নিতে হবে। এসব উদ্যোগ লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে ভূমিকা রাখবে, যা প্রকারান্তরে এসডিজি-৩ অর্জনে সহায়ক হবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নানা ধরনের দুর্ভোগ ও অনেক মৌলিক বিষয়ে বঞ্চনার জন্ম দেয়। অনেক বছর ধরেই মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বাড়াতে এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর জন্য দায়ী কিছু প্রচলিত রোগ দমনের লক্ষ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি স্বত্ত্বেও, দক্ষিণ এশিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার এখনও ঊর্ধ্বগামী। ২০০০ সালের পর থেকে প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগের উপস্থিতি ধীরে ধীরে কমেছে। এসব রোগের মধ্যে রয়েছে এইচআইভি এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা। কিন্তু এসব রোগ ছাড়াও নতুন নতুন মহামারির চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়াসহ গোটা বিশ্ব। নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন, টিকা আবিষ্কার

ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

৩.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৩ অগ্রগতি পর্যালোচনা

সূচক ৩.১.১: মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি লাখ জীবিত জন্মে)

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবজনিত কারণে প্রতি লাখ জীবিত সন্তান প্রসবের বিপরীতে কতজন প্রসূতি নারী মৃত্যুবরণ করে, তার ভিত্তিতে মাতৃমৃত্যু অনুপাত (এমএমআর) নির্ধারণ করা হয়। যেসব মা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে, এটি তাদের মরণশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এমএমআর কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রতি লাখ জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ২০১৯ সালে ১৬৫ জনে নেমে এসেছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিলাখে এ হার ছিল ৪৪৭ জন। তবে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে এ অনুপাত অনেক বেশি। সেখানে প্রতি লাখ জীবিত জন্মের বিপরীতে মৃত্যুর সংখ্যা শহরের তুলনায় ৬৮ জন বেশি। যদিও পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় এ ব্যবধান কমে এসেছে।

সারণি ৩.১: মাতৃমৃত্যুর অনুপাত, ১৯৯৫-২০১৯

	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
জাতীয়	৪৪৭	৩১৮	৩৪৮	২১৬	১৮১	১৭৮	১৭২	১৬৯	১৬৫
গ্রাম	৪৫২	৩২৯	৩৫৮	২৩০	১৯১	১৯০	১৮২	১৯৩	১৯২
শহর	৩৮০	২৬১	২৭৫	১৭৮	১৬২	১৬০	১৫৭	১৩২	১২৩

সূত্র: বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস (২০১৮)

সূচক ৩.১.২: প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত

প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত এসডিজি-৩-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো স্বাস্থ্য খাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৯৯৪ সালে সন্তান জন্মদানকালে দক্ষ ধাত্রীর সহায়তাপ্রাপ্তির হার ছিল মাত্র ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৯ সালে এটা ৭৫ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান এবং এ ব্যবধান কমানো বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০১৯ সালের এমআইসিএস সূচক অনুযায়ী, শহরাঞ্চলের ৮৬ শতাংশ জনসমষ্টি দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা লাভের সুযোগ পান। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৭২ শতাংশের মতো।

সারণি ৩.২: প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি, ১৯৯৪-২০১৯ (শতাংশ)

১৯৯৪	২০০৪	২০০৭	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১৩	২০১৪	২০১৬	২০১৯
৯.৫	১৫.৬	২০.৯	২৪.৪	২৬.৫	৩১.৭	৩৪.৪	৪২.১	৫০.০	৫৯

সূত্র: এমআইসিএস (২০১৯)

সূচক ৩.২.১ ও সূচক ৩.২.২: অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ও নবজাতকের মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)

১৯৯৫ থেকে ২০১৯ সময়ের মধ্যে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যুর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী প্রবণতা (প্রায় চারগুণের বেশি) পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে জীবিত জন্ম নেওয়া পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যুহার ছিল ১২৫; ২০১৯ সালে যা ২৮ জনে নেমে এসেছে। এ অগ্রগতির ফলে বাংলাদেশ ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত এসডিজির মাইলফলক (প্রতি হাজারে ৩৪ জন) অর্জনে সঠিক পথেই রয়েছে। অনুরূপভাবে নবজাতকের মৃত্যুহারও ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯ সালের এসভিআরএস উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৪ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার ছিল ২৮ জন। ২০১৯ সালে তা ১৫ জনে নেমে এসেছে, যা ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ। তবে, পাঁচ বছর ধরে শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

সারণি ৩.৩: শিশুমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)

	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০০৭	২০১১	২০১৪	২০১৯
নবজাতকের মৃত্যুহার	...	...	...	৩৭	৩২	২৮	১৫
শিশু মৃত্যুহার	...	...	...	৫২	৪৩	৩৮	২১
পাঁচ বছরের নিচে মৃত্যুহার	১২৫	৮৪	৬৮	৬৫	৫৩	৪৬	২৮

সূত্র: এসভিআরএস ও ডিএইসচএস, বিভিন্ন বছর, এমআইসিএস (২০১৯)

সূচক ৩.৩.১: জেন্ডার, বয়স ও মূল জনসংখ্যা অনুসারে প্রতি হাজার অসংক্রমিত মানুষের মধ্যে নতুন এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা

যেসব দেশে এইচআইভি/এইডসের উপস্থিতির হার অপেক্ষাকৃত কম, বাংলাদেশ তার অন্যতম। ইউএনএইডসের ২০১৮ সালের তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতি হাজার মানুষের বিপরীতে এইচআইভি সংক্রমিতের হার শূন্য দশমিক ০.০১৫ জন। এই নিম্নহারের কারণ হলো বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী, প্রতিবেশি দেশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আসা শহরাঞ্চলের নারী যৌনকর্মী, অরক্ষিত যৌনসঙ্গী ও বিদেশফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গৃহীত বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

সূচক ৩.৩.২: প্রতি লাখে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা

বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে সফলতার সঙ্গে যক্ষ্মা প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ সালে দেশে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যক্ষ্মায় সংক্রমিতের সংখ্যা ছিল ২৮৭ জন। ২০১৮ সালে তা ১৬১ জনে নেমে এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবমতে, যেসব দেশে যক্ষ্মার উপস্থিতি বেশি, তেমন শীর্ষ ৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। খণ্ডকালীন প্রবাসী শ্রমিক- যারা কম বায়ু নির্গমন সুবিধাযুক্ত জনাকীর্ণ ঘরে বসবাসকরে, যাদের যক্ষ্মা সংক্রমণ ও এর বিনামূল্যের চিকিৎসা (ডট) বিষয়ে সচেতনতা এবং মানসম্পন্ন রোগ শনাক্ত সেবার সুযোগের অভাব রয়েছে; তাদের মধ্যে যক্ষা সংক্রমণের বিস্তারই যক্ষার উচ্চ প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী।

সারণি ৩.৪: প্রতি লাখ মানুষের বিপরীতে যক্ষ্মা সংক্রমণের অবস্থা

২০১৬	২০১৭	২০১৮
২৮৭	১৪৮.৫৬	১৬১

সূত্র: ডিজিএইচএস

সূচক ৩.৩.৩: প্রতি হাজার জনে ম্যালেরিয়া রোগের অবস্থা

দক্ষিণ এশিয়ার যেসব দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি, বাংলাদেশ তার একটি। ডব্লিউএইচও'র ২০১৯ সালের এসডিজি-সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রোফাইল অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৯ সালে প্রতি হাজার জনসমষ্টির মধ্যে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হার ১ দশমিক ৬ জনে নেমে এসেছে, ২০১৫ সালে যা ছিল ৪ দশমিক ৩। ম্যালেরিয়া নির্মূলে সরকারের একক ও এনজিও'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে রোগটির সংক্রমণের হার অনেক কমে এসেছে। তবে যেসব এলাকায় এটির স্থানীয়করণ ঘটেছে, (দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলো) সেখানে রোগটির সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়নি।

সূচক ৩.৩.৪: প্রতি লাখে হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা

অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের মতো বাংলাদেশেও হেপাটাইটিস বি-এর প্রাদুর্ভাব সহনীয় মাত্রায় রয়েছে। বাংলাদেশ এসডিজি ট্র্যাকার অনুসারে, ২০১২ সালে এক লাখ জনসমষ্টির বিপরীতে হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৮০ জন। আর ডব্লিউএইচও'র ২০১৯ সালের এসডিজি-সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রোফাইল অনুযায়ী, সম্প্রতি এটি ১৩৮ জনে নেমে এসেছে।

সূচক ৩.৩.৫: গুরুত্ব না দেওয়া উষ্ণমণ্ডলীয় রোগের (এনটিডি) কারণে চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়া মানুষের সংখ্যা

এসডিজির শেষ বছর ২০৩০ সালের মধ্যে গুরুত্ব না দেওয়া উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ (এনটিডি) বা neglected tropical diseases (NTD)-এর কারণে প্রতিবছর চিকিৎসা ও সেবার প্রয়োজন হওয়া মানুষের সংখ্যার গড় হার শূন্যের কোঠা অথবা নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে। এনটিডির কারণে চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়া মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নে অন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন (ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, সহায়ক জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা), তা ২০৩০ সালের অনেক আগেই সম্পন্ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অন্যান্য সূচক, যেমন সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (ইউএইচসি) নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য নিরাপদ পানি ও উপযুক্ত স্যানিটেশন নিশ্চিত করার উদ্যোগ সম্পন্ন করতে হবে। ডব্লিউএইচও'র ২০১৯ সালের এসডিজি-সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রোফাইল অনুযায়ী, ২০১৯ সালে গুরুত্ব না দেওয়া উষ্ণমণ্ডলীয় রোগের কারণে দেশে পাঁচ কোটি ৬৩ লাখ ৪০ হাজার (৫৬ দশমিক ৩৪ মিলিয়ন) মানুষকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।

সূচক ৩.৪.১: হৃদরোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিস অথবা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগে মৃত্যুর হার (৩০ থেকে ৭০ বছর বয়সি)

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও অসংক্রামক রোগে (এনসিডি) আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বার্ধক্যজনিত কারণ ছাড়াও এ রোগ বৃদ্ধির কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্যাভ্যাস, প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি ও শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা। এনসিডিভুক্ত রোগগুলোর মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ, ক্যানসার ও দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগ। এসব রোগ দেশের জন্য বড় ধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ৩০ বছর বয়সি কত মানুষ তাদের ৭০তম জন্মদিনের আগেই মৃত্যুবরণ করে, সেই সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ৩০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাব্যতার অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। ডব্লিউএইচও'র ২০১৯ সালের এসডিজি-সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রোফাইল অনুযায়ী, এনসিডিতে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার মোটামুটি স্থিতিশীল। ২০১৫ সালে দেশে এনসিডিতে মৃত্যুর হার ছিল ২১ শতাংশ। ২০১৯ সালে তা কিছুটা বেড়ে হয়েছে ২১ দশমিক ৬ শতাংশ।

সূচক ৩.৪.২: আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর হার (প্রতি লাখ জনসংখ্যায়)

দেশে যেসব কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটে, আত্মহত্যা তার অন্যতম। আর নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। যদিও অধিকাংশ সমাজেই হতাশা ও অবসাদ থেকে সৃষ্ট মানসিক ভারসাম্যহীনতাই আত্মহত্যার প্রধান কারণ। তবে বাংলাদেশে নারীদের আত্মহত্যার অন্য কারণও আছে। এসব কারণের মধ্যে শারীরিক ও পারিবারিক নির্যাতন অন্যতম। বাংলাদেশে আত্মহত্যাজনিত কারণে মৃত্যুর হার মোটামুটি স্থির পর্যায়ে রয়েছে। প্রতি লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে আত্মহত্যায় মৃত্যু হয় সাতজনের। বাংলাদেশ পুলিশের ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে আত্মহত্যার প্রবণতা কমেছিল। ওই বছর প্রতি লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে আত্মহননকারীর সংখ্যা ছিল চারজন। কিন্তু ২০১৯ সালে তা আবার বেড়ে হয়েছে ৭.৫৬ জন।

সারণি ৩.৫: আত্মহত্যায় মৃত্যুর হার (প্রতি লাখ জনসংখ্যায়)

২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৯
৭.৬৮	৭.৮৪	৩.৭৯	৭.৫৬

সূত্র: বাংলাদেশ এসডিজি ট্র্যাকার, বাংলাদেশ পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (২০১৯)

সূচক ৩.৫.১: মাদকাসক্তিজনিত ভারসাম্যহীনতা নিরাময়ে চিকিৎসার হার (ওষুধ প্রয়োগ, মনস্তাত্ত্বিক ও পুনর্বাসন এবং নিরাময়-পরবর্তী সেবা)

মাদকাসক্তিজনিত ভারসাম্যহীনতার চিকিৎসাসেবা বলতে বোঝায়, তাদের জন্য মেডিকেল-সংক্রান্ত চিকিৎসাসেবার অবস্থা এবং মাদকসেবী ও তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। বাংলাদেশ এসডিজি ট্র্যাকার অনুসারে, বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ ২০১৯ সালে চিকিৎসাসেবা নিয়েছে।

সূচক ৩.৫.২: ক্ষতিকর মাত্রায় অ্যালকোহল গ্রহণ, দেশীয় প্রেক্ষিতে ১৫ বছরের উর্ধ্বে মাথাপিছু অ্যালকোহল সেবনের হার (বছরে কত লিটার)

দেশীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশে অ্যালকোহল সেবনের হার সব সময়ই অনেক কম। ফলে এখানে ক্ষতিকর মাত্রায় অ্যালকোহল সেবনের হার একপ্রকার স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। গত চার বছরের হিসাবে দেখা যায়, ক্ষতিকর মাত্রায় অ্যালকোহল সেবনের হার অপরবির্তিত। এ সময়ে ১৫ বছরের উর্ধ্বে বছরে মাথাপিছু অ্যালকোহল সেবনের মাত্রা ০.০৮ লিটার।

সারণি ৩.৬: বছরে মাথাপিছু পিওর অ্যালকোহল গ্রহণের হার (লিটার)

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
মাথাপিছু অ্যালকোহল গ্রহণ	০.০৮৩	০.০৮৫	০.০৮৪	০.০৮৩

সূত্র: বাংলাদেশ এসডিজি ট্র্যাকার: http://www.sdg.gov.bd/page/indicator-wise/1/40/3/0#1

সূচক ৩.৬.১: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার (প্রতি এক লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে)

সড়ক দুর্ঘটনায় জখম বা রোড ট্রাফিক ইনজুরি (আরটিআই) বিশ্বব্যাপী মানুষের মৃত্যুর ক্ষেত্রে অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল একটি কারণ। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রবণতা অনেক বেশি। সড়কে যানবাহনের সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতার অভাব সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু, অসুস্থতা ও পঙ্গুত্বের হার বাড়িয়ে তুলছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার হলো প্রতি এক লাখ জনে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মারাত্মক আহত ও নিহত হওয়া মানুষের একটি হিসাব। ২০১৫ সালে দেশে প্রতি এক লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২ দশমিক ৪৮ জন, ২০১৮ সালে যা ১ দশমিক ৬৪ জনে নেমে আসে। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) হিসাবে, এ মৃত্যুহার অনেক বেশি। সংস্থাটির হিসাবমতে, ২০১৭ সালে দেশে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যু হয় ১৫ দশমিক ৫৬ জনের। ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৩ দশমিক ৬ জন।

সারণি ৩.৭: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার (প্রতি এক লাখ জনসংখ্যায়)

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার	২.৪৮	২.৬৫	১.৩৭	১.৬৪

সূত্র: বাংলাদেশ এসডিজি ট্র্যাকার: http://www.sdg.gov.bd/page/indicator-wise/1/48/3/0#1

সূচক ৩.৭.১: প্রজনন সক্ষম নারীদের (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি) মধ্যে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের সন্তুষ্ট জনগোষ্ঠীর হার

আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি একজন নারী ও তার সঙ্গীর স্থিতিশীল পারিবারিক জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ব্যবস্থা একদিকে অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ রোধ করে মা ও বর্তমান শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, অন্যদিকে বিরতি দিয়ে পরিকল্পনামাফিক সন্তান গ্রহণে সহায়তা করে। যদি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি সংখ্যক নারী সন্তোষ প্রকাশ করে, তাহলে বুঝতে হবে এ পদ্ধতির সফলতা অনেক উচ্চ। আর যদি ৫০ শতাংশ বা তার কমসংখ্যক নারী এ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তাহলে বুঝতে হবে এটির সফলতার হার নিম্ন। ২০১৯ সালের MICS উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে যে কোনো আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারী ৭৭ দশমিক ৪ শতাংশ নারী তাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছে।

সূচক ৩.৭.২: প্রতি এক হাজার নারীর মধ্যে কিশোরী বয়সে সন্তানধারণকারীর হার (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছরে গর্ভধারণের প্রবণতা)

নির্দিষ্ট কোনো বছরে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি নারীর জীবিত সন্তান জন্মদানের সংখ্যাকে ওই বয়স সীমার ভিতরে থাকা মোট নারীর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায়, সেটিই কৈশোরিক জন্মহার হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে কিশোরীকালে গর্ভধারণের হার চমকপ্রদভাবে কমে এসেছে। ১৯৯৯ সালে ১৫-১৯ বছর বয়সি প্রতি এক হাজার নারীর মধ্যে ১৪৪ জন সন্তান ধারণ করেছিলেন। ২০১৯ সালে এ হার নেমে এসেছে ৮৩ জনে। নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার বিস্তার, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

ও দেরিতে বিয়ে করার সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটার ফলে ভবিষ্যতে কিশোরীকালে গর্ভধারণ হার কমার প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। তবে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কিশোরীকালে গর্ভধারণের হারে বেশ ব্যবধান রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজার কিশোরীর মধ্যে গর্ভধারণ সংখ্যা ৮৭, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ সংখ্যা ৭০ জন।

সারণি ৩.৮: ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি প্রতি হাজার কিশোরীর মধ্যে গর্ভধারণের হার

১৯৯৯	২০০৪	২০০৭	২০১১	২০১৪	২০১৯
১৪৪	১৩৫	১২৬	১১৮	১১৩	৮৩

সূত্র: বিবিএস: গওঈঝ (২০১৯)

সূচক ৩.৮.১: জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অবস্থান (জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অবস্থান বলতে বোঝায় প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগের সেবাদানে সক্ষমতা এবং সাধারণ মানুষ ও সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সেসব সেবাপ্রাপ্তির সুযোগের মাত্রা)

স্বাস্থ্যসেবা খাতের ১৪টি সূচকের অবস্থানগত মাত্রার গাণিতিক গড়ের নির্দেশক হচ্ছে এ সূচক, যা শূন্য থেকে ১০০ স্কেলে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ ওই সেবার কোনোটির ক্ষেত্রে একটি দেশের অবস্থান কেমন, সেই অবস্থানের গড়ের ভিত্তিতে সূচকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ওই ১৪টি সূচক চারটি উপাদানের সমষ্টি। এ চারটি উপাদানের প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য; দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত সংক্রামক ব্যাধি; তৃতীয়টির অন্তর্ভুক্ত অসংক্রামক ব্যাধি এবং চতুর্থটির অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যসেবা দানে সক্ষমতা এবং এ সেবাপ্রাপ্তিতে মানুষের অভিগম্যতা। ডব্লিউএইচও'র ২০১৯ সালের এসডিজি-সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রোফাইল অনুযায়ী, এ সূচকে ১০০ পয়েন্টের বিপরীতে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ৫৪, যা এসডিজির ২০২০ সালের মাইলফলক থেকে বেশ পিছিয়ে। ওই মাইলফলক অনুযায়ী, এ মান ৬৫ হওয়া প্রয়োজন।

সূচক ৩.৮.২: সংসারের মোট ব্যয়ের অনুপাতে স্বাস্থ্যসেবায় বড় অঙ্কের ব্যয় হওয়া জনসংখ্যার অনুপাত (সংসারের মোট ব্যয় অথবা আয়ের >১০%)

স্বাস্থ্যসেবায় উচ্চমাত্রার ব্যয় একটি পরিবারকে চরম আর্থিক দীনতায় ফেলে দেয়; বিশেষ করে যখন পরিবারের পূর্বানুমিত মাত্রা অতিক্রম করে স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় মেটানোটা অক্ষমতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমন পরিস্থিতির যখন উদ্ভব হয়, তখন একটি পরিবার মহাবিপর্যয়ের মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে। ডব্লিউএইচও'র ২০১৯ সালের এসডিজি-সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রোফাইল অনুযায়ী, ২০১৬ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ২৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ তাদের মোট উপার্জনের ১০ শতাংশেরও বেশি ব্যয় করেছিল স্বাস্থ্যসেবায়। গ্রামে এমন ব্যয় করা জনসংখ্যার হার ২৬ দশমিক ০৫ শতাংশ আর শহরাঞ্চলে ২১ শতাংশ। অথচ ২০০০ সালে রোজগারের ১০ শতাংশের বেশি স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করা জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১৫ শতাংশ।

সারণি ৩.৯: মোট পারিবারিক ব্যয়ের অনুপাতে স্বাস্থ্যসেবায় বড় অঙ্কের ব্যয় করা জনসংখ্যার অনুপাত (%)

২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৯
১৪.৮৫	১২.৩৪	১৩.৮৬	২৪.৬৭

সূত্র: হেলথ এসডিজি প্রফাইল বাংলাদেশ, ডব্লিউএইচও (২০১৯)

সূচক ৩.৯.১: খানা ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের ফলে সংঘটিত মৃত্যুহার (প্রতি এক লাখ জনে)

রান্নার কাজে ব্যবহৃত জ্বালানি থেকে নির্গত ধোঁয়ার মাধ্যমে বাসস্থানের ভেতরে ও বাইরে বায়ুদূষণজনিত কারণে মৃত্যুর হার দেশে বাড়ছে। ডব্লিউএইচও'র হিসাবমতে, ২০১২ সালে এক লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে বায়ুদূষণে মৃতের সংখ্যা ছিল ৬৮ দশমিক ৬। আর ইউএনস্ট্যাট: এসডিজি সূচকের ২০১৬ সালের হিসাবমতে, বাংলাদেশে বায়ুদূষণে ওই বছর প্রতি লাখে মৃতের সংখ্যা ছিল ৭৪ জন।

সূচক ৩.৯.২: দূষিত পানি, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনযাত্রার (ওয়াশ) অভাবজনিত মৃত্যুর হার

অপর্যাপ্ত পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির ঘাটতির কারণে যে মৃত্যু ঘটে, তা এ-সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সহজেই রোধ করা যায়। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে, কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি খাতে অগ্রগতি সেই অনুপাতে নয়। আর এ খাতে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ২০১২ সালে দেশে অনিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার (ওয়াশ) অভাবের ফলে প্রতি লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে মৃত্যুর হার ছিল ৫ দশমিক ৯৬ জন। আর ইউএনস্ট্যাট: এসডিজি সূচকের ২০১৬ সালের হিসাবমতে, ওই বছর অনিরাপদ ওয়াশ কর্মকাণ্ডের কারণে প্রতি লাখে মৃতের সংখ্যা ছিল ১১ দশমিক ৯ জন।

সূচক ৩.৯.৩: অনিচ্ছাকৃত বিষপ্রয়োগজনিত বায়ুদূষণে মৃত্যুহার (প্রতি লাখ জনসংখ্যায়)

দেশে অনিচ্ছাকৃত বিষপ্রয়োগজনিত বায়ুদূষণে মৃত্যুর বিষয়টি ফলপ্রসূ স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবকে নির্দেশ করে। ডব্লিউএইচও'র ২০১৯ সালের এসডিজি-সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্য প্রোফাইল অনুযায়ী, ২০১৯ সালে অনিচ্ছাকৃত বিষপ্রয়োগজনিত বায়ুদূষণে দেশে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে মৃত্যুর হার ছিল শূন্য দশমিক ৩।

সূচক ৩.ক.১: বয়স অনুযায়ী ১৫ বছর বা তদূর্ধ্বদের মধ্যে তামাক সেবন পরিস্থিতি

অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) এবং এ ধরনের রোগের কারণে সংঘটিত মৃত্যুর প্রধান কারণ তামাক সেবন। উচ্চমাত্রায় তামাক সেবনের হারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের একটি। তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ২০০৩ সালে ডব্লিউএইচও প্রণীত তামাক নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী প্রথম উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ।২০১৫ সালের তামাক সেবন পরিস্থিতির ওপর ২০১৭ সালে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ডব্লিউএইচও। ওই প্রতিবেদনমতে, ১৫ থেকে তদূর্ধ্ব বয়সি পুরুষদের মধ্যে তামাক সেবনের হার ৫৮ শতাংশ। আর নারীদের ক্ষেত্রে এ হার ২৯ শতাংশ। বৈশ্বিক প্রাপ্তবয়স্ক তামাক জরিপ (গ্যাটস) ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সিদের তামাক সেবনের যে চিত্র তুলে ধরেছে, তাতে দেখা যায়, ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী তামাক সেবনকারীর হার কমেছে। ২০০৯ সালে তামাক সেবনকারীর হার ছিল ৪৩ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০১৭ সালে তা নেমে আসে ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশে। জনসাধারণের মধ্যে তামাক সেবনের প্রবণতা কমাতে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম তামাক পণ্যে উচ্চহারে করারোপ ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ। এছাড়া ২০৪০ সাল নাগাদ দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে একটিমাত্র উপাত্তের ওপর ভর করে এ সূচকটির মাধ্যমে দেশের অগ্রগতির পরিমাপ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণ ও এরই মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আরও উপাত্ত প্রয়োজন।

সূচক ৩.খ.১: জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় সব ধরনের টিকাদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৭৯ সাল থেকে একটি কার্যকর জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। শৈশবের ছয়টি রোগের জন্য টিকাদান এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত। এগুলো হলো: পোলিও, হাম, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া ও যক্ষ্মা। বাংলাদেশ জনমিতিক স্বাস্থ্য জরিপের (বিডিএইচএস) ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, ওই সময় উল্লিখিত রোগগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় টিকা ও ওষুধ ৭৮ শতাংশ মানুষের কাছে সহজলভ্য ছিল। বিডিএইচএসের ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, ওই সময় দেশের ১২ থেকে ২৩ মাস বয়সি ৮৯ শতাংশের টিকাদান কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। একই সঙ্গে পোলিও টিকার তিনটি ডোজ পূর্ণ করা শিশুর হার ছিল ৯৫ শতাংশ।

সূচক ৩.গ.১: প্রতি ১০ হাজার জনগোষ্ঠীর বিপরীতে স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব ও বণ্টন (চিকিৎসক, সেবিকা ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ)

স্বাস্থ্যসেবার জন্য সম্পদ সংগ্রহ (এইচআরএইচ) স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির সফলতা মূলত নির্ভর করে স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতার ওপর। এসব কর্মীর মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, সেবিকা ও ধাত্রী, দন্ত চিকিৎসক এবং ফার্মাসিস্ট। বাংলাদেশে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি বিদ্যমান, অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে তাদের বণ্টন ব্যবস্থায়ও ত্রুটি রয়েছে। ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী, ওই সময় প্রতি ১০ হাজার মানুষের বিপরীতে স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাত ছিল ৭ দশমিক ৪ জন। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপাত ছিল ১:০.৫:০.২। এ ধরনের বণ্টন কর্মশক্তির ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ১০ হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব বেড়ে হয়েছে ৮ দশমিক ৩। আর কর্মক্ষেত্রে তাদের বিতরণ অনুপাত ১:০.৫৬:০.৪০ (এইচআরডি ইউনিট, এইচআরডি কান্ট্রি প্রোফাইল, ২০১৭, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)। স্বাস্থ্যকর্মীর বণ্টনের এ চিত্র ২০২০ সালের লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিচায়ক।

সূচক ৩.ঘ.১: আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি (আইএইচআর) সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা ও জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি

২০০৫ সালের আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি (আইএইচআর) অনুযায়ী, জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৯৪টি দেশের প্রত্যেকটির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সক্ষমতার বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই আইএইচআরের আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেকোনো ধরনের জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতির বিষয়ে ঝুঁকি শনাক্তকরণ, ঝুঁকির ব্যাপকতা মূল্যায়ন, সেই পরিস্থিতির বিষয়ে ডব্লিউএইচওকে অবহিতকরণ ও জনস্বাস্থ্যের যেকোনো ঝুঁকির বিষয়ে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেওয়ার সক্ষমতা প্রত্যেক দেশের রয়েছে। আইএইচআরের সদস্য দেশগুলোকে মৌলিক যে ১৩টি বিষয়ে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে, সেগুলো হলো: (১) জাতীয় পর্যায়ে আইন ও নীতি প্রণয়ন এবং অর্থায়ন, (২) সমন্বয় সাধন ও জাতীয় পর্যায়ের যোগাযোগ নিশ্চিত করতে ফোকাল পয়েন্ট নির্দিষ্টকরণ, (৩) নজরদারি, (৪) সাড়া প্রদান, (৫) প্রস্তুতি, (৬) ঝুঁকি যোগাযোগ, (৭) মানবসম্পদ উন্নয়ন, (৮) পরীক্ষা ও গবেষণাগার, (৯) প্রবেশপথ নির্দিষ্টকরণ, (১০) মশাবাহিত রোগ, (১১) খাদ্য নিরাপত্তা, (১২) রাসায়নিক বিষয়াদি এবং (১৩) পরমাণু তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে জরুরি পরিস্থিতি। এই ১৩টি মৌলিক সক্ষমতার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে সূচকে একটি দেশের অবস্থান পরিমাপ করা হয়। বাংলাদেশের এসডিজি পরিমাপকের হিসাবে (এসডিজি ট্র্যাকার) দেখা যায়, ২০১৬ সালে এ সূচকে বাংলাদেশের অর্জিত স্কোর ছিল ৮৭; ২০১৯ সালে তা ৫৮ পয়েন্টে নেমে গেছে। এক্ষেত্রে ২০২০ সালে অর্জনের জন্য নির্ধারিত মাইলফলক ছিল ৯০। এ অবস্থা থেকে বাংলাদেশ অনেক পেছনে অবস্থান করছে।

৩.৩ এসডিজি ৩ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

স্বাস্থ্য বিষয়ে এসডিজির এজেন্ডাগুলো বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও চতুর্থ পর্যায়ের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচিতে (এইচপিএনএসপি, ২০১৮-২০২২) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরকারই বৃহৎ ও প্রধান সেবা সরবরাহকারী, তথাপি বেসরকারি খাতের গুরুত্বও এক্ষেত্রে কম নয়। সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ নির্ভর করে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক কর্মকাণ্ডে কার্যকর সমন্বয়ের ওপর। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক এসডিজি অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এসডিজি ৩ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে বাংলাদেশের নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে ২০৩০ সাল নাগাদ যে তিনটি ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে, চতুর্থ এইচপিএনএসপি তার মধ্যে প্রথম। এছাড়া বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত বর্জ্য (মেডিকেল বর্জ্য) ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা (এইচসিডব্লিউএমপি) ও যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৮-২০২২) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি সরকার বিনামূল্যে যক্ষ্মা চিকিৎসা কর্মসূচি চালু করেছে এবং দেশব্যাপী এ সেবা সহজলভ্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশে পরিণত হতে চায়। ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা যথাযথ মানে উন্নীত করতে অষ্টম জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশল কর্মপরিকল্পনা, (২০১৭-২০২০) গ্রহণ করা হয়েছে।

চতুর্থ এইচপিএনএসপি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে এটির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় অধিকতর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন এবং আর্থিক সুরক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগের সমতা বিধান করা যায়। এসব বিষয় ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (ইউএইচসি) নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে অর্থপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অধিকতর সামগ্রিকতা ও বহুবিধ খাতের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কীভাবে সবার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধান করা যায়, সে বিষয়ে এসডিজি নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছে। চতুর্থ এইচপিএনএসপি এসডিজির সেই প্রেক্ষাপটকে প্রতিফলিত করে।

বর্তমান চতুর্থ এইচপিএনএসপির তিনটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো–১. স্বাস্থ্য খাতের শাসন তত্ত্বাবধান ও দায়িত্ব ন্যস্তকরণ; ২.অধিকতর শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থা; এবং ৩. মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা। এর মধ্যে ওষুধ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ, মানসম্মত ওষুধ ব্যবস্থাপনা, আইন ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রথম উপাদানটির আওতাভুক্ত। একইসঙ্গে এটি বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা খাতে এনজিওগুলোকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিষয়ে কাজ করবে।

দ্বিতীয় উপাদানটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সংক্রান্ত। এ উপাদানের আওতাভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে–স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট নির্ধারণ, বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, স্বাস্থ্য খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা খাতের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন, সেবাদানের আগে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় শিক্ষায় দীক্ষিতকরণ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, সেবিকা ও ধাত্রী সেবা এবং তাদের প্রশিক্ষণ, মানসম্মত স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চিতকরণ, ক্রয় ও সরবরাহ শিকল ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভৌত সুযোগ-সুবিধা, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

তৃতীয় উপাদানের লক্ষ্য হলো, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানোন্নয়ন, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ে এসডিজির অভীষ্ট অর্জন ত্বরান্বিত হবে। এ কাজ সম্পন্নের জন্য পূর্ববর্তী স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো নতুনভাবে চালু করা এবং সেগুলোর উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ উপাদানে যেসব উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো–প্রজনন, মা, নবজাতক, শিশু ও কিশোরীর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন; টিকাদান কর্মসূচি, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ; পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা; সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ; বিকল্প স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন সাধন; এবং আচরণগত পরিবর্তন-বিষয়ক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি।

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার বিস্তার এবং পুষ্টি ও জেলা পর্যায়ে পারিবারিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার (এফপি) উন্নয়নে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজের (ইএসপি) প্রচলন করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সাশ্রয়ী উপায়ে ইএসপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চতুর্থ এইচপিএনএসপি বাস্তবায়ন সময়ে একটি সমন্বিত সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে।

এসডিজির সঙ্গে দেশের জনসমষ্টির ফলপ্রসূ সংযোগ স্থাপনে সরকার উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট চালু করেছে। এ প্রকল্পের মূল দায়িত্ব হলো স্থানীয় সরকারের শাসন কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এসডিজি-৩ ও এসডিজির অন্যান্য অভীষ্টগুলোর বিষয়ে সচেতন করা, এ অভীষ্টসমূহ অর্জনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই) দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া এবং এসডিজির স্থানীয়করণের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা।

৩.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

এসডিজি-৩-এর অনেক সূচকে বাংলাদেশ এখনো বেশ পিছিয়ে রয়েছে। এতে করে এ অভীষ্টের জন্য ২০২০ সালের যে মাইলফলক রয়েছে, তা অর্জন বিঘ্নিত হতে পারে। স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রাম, ধনী ও দরিদ্র এবং বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অসমতা বিরাজমান। এছাড়া শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মানদণ্ড ও সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতেও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাস্থ্য খাত যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধানানুসারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে ধাত্রীসেবা প্রদান; শহরাঞ্চলে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ; স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে রোগী ও তার পরিবারের ব্যয় কমানো; রোগীর অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো (বিশেষ করে পল্লী ও দুর্গম এলাকাসমূহে); অসংক্রামক ব্যাধির (এনসিডি) ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলা; ক্রমবর্ধমান হারে অগ্নিদগ্ধ ও এসিডে ঝলসে যাওয়া রোগী, পানিতে ডুবে মৃত্যু ও সড়ক দুর্ঘটনা মোকাবিলা; বার্ধক্যজনিত নানা রোগ প্রতিরোধ; সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ; বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনা ও জলবায়ুকেন্দ্রিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যসমস্যা মোকাবিলা এবং ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যা প্রবণতা রোধ করা।

এছাড়া স্বাস্থ্য খাতে কিছু পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেগুলোর মোকাবিলায় পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এমন একটি চ্যালেঞ্জ হলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ দুটি মন্ত্রণালয়ের সেবার মধ্যে একটি কার্যকর রেফারেল পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে ফলপ্রসূ নগর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। কিন্তু কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং।

২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (আইএইচসি) নিশ্চিতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সব ধরনের নীতি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে, যার ফলে জনসাধারণের কাছে সজহলভ্য উপায়ে গুণগত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবার আবর্তন জালের আওতা আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইউএইচসির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার খাত নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান কাঠামোর সঙ্গে তা সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দিচ্ছে।

এসডিজি ৩ অর্জনে বিভিন্ন খাতের সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন শক্তিশালী করতে সরকার এরই মধ্যে জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহে গুরুত্বরোপ করেছে। কিন্তু বাস্তবায়ন পর্যায়ে গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রায় এসব নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে দক্ষ নেতৃত্বের সংকট ওইসব কৌশল বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৩.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

এসডিজি ৩ অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ অভীষ্ট অর্জনে সরকারের পাশাপাশি অন্য অংশীজনদের কার কী দায়িত্ব, তা নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় ম্যাপিং সম্পন্নের পাশাপাশি উপাত্তের ঘাটতিও চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এসব দায়িত্ব পরিপালনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের সমন্বিত উদ্যোগের ক্ষেত্রে বেশ ঘাটতি বিদ্যমান। তবে সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে এখনো বেশকিছু উদ্যোগ চলমান। বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (এমআইএস) মাধ্যমে এসডিজি ৩ অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাজ যথাযথভাবেই এগোচ্ছে। এ কাজে নেতৃত্বের ভূমিকায় রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় জাতীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় সক্ষমতায় বেশ ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রমাণনির্ভর নীতি প্রণয়নে সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।

এসডিজি ৩ অর্জন করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকারের সীমিত সক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য রোধ এবং রোগী ও তার স্বজনের ওপর অর্পিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের বোঝা কমাতে (বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য) স্বাস্থ্যনীতিতে যথোপযুক্ত বিধান সংযুক্ত করা উচিত। কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে যেসব জনগোষ্ঠী অধিকতর বিচ্ছিন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত, তাদের জন্য মানসম্পন্ন সামাজিক সেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে। পাশাপাশি সবচেয়ে দরিদ্র ও সমাজের প্রচলিত কাঠামো থেকে সবচেয়ে বিচ্যুত মানুষদেরও এর আওতায় আনতে হবে। দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যাণ সেবার মানোন্নয়নে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ কাজে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করে কর্মক্ষেত্রে তাদের যথাযথ বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৬ সারকথা

এসডিজি-৩-এর বেশকিছু লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম মাতৃমৃত্যু হার কমানো। ধারাবাহিকভাবে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত কমে এসেছে। পাশাপাশি সন্তান প্রসবের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির হারেও চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২৫ থেকে ৪০ জনে নেমে এসেছে (অর্ধেকেরও কম)। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুর মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় নামিয়ে আনার বিষয়ে ২০২০ সালের জন্য যে মাইলফলক নির্ধারণ করা আছে, বাংলাদেশ তা অর্জনের পর্যায়ে অবস্থান করছে।

এইচআইভি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ অত্যন্ত সফল। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, জাতীয় পর্যায়ে প্রতি এক হাজার অসংক্রমিত জনসমষ্টির বিপরীতে এইচআইভি আক্রান্তের হার মাত্র শূন্য দশমিক শূন্য ১৫ জন (০.০১৫)। যক্ষ্মা নিরাময়ে ধারাবাহিক সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে ডব্লিউএইচও প্রণীত বৈশ্বিক যক্ষ্মা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই বছর দেশে প্রতি এক লাখ মানুষের বিপরীতে যক্ষ্মা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২২১ জন। ২০১৯ সালে প্রতি হাজার জনসমষ্টির বিপরীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা নেমে এসেছে ১ দশমিক ৬ জনে, ২০১৫ সালে যা ছিল হাজারে ৪ দশমিক ৩ জন। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি কিশোরীদের মধ্যে গর্ভধারণ প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। ১৯৯৯ সালে প্রতি হাজার কিশোরীর মধ্যে ১৪৪ জন গর্ভধারণ করত। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ৮৩ জনে নেমে এসেছে। নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার বিস্তার, শ্রমশক্তিতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ ও দেরিতে বিয়ে করার সংস্কৃতির প্রচলন হওয়ায় ভবিষ্যতে কিশোরীদের গর্ভধারণ প্রবণতা কমে আসার ধারা অব্যাহত থাকবে।

সরকার স্বাস্থ্য খাতে চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি, ২০১৮-২০২২) বাস্তবায়ন করছে। এসডিজির তৃতীয় অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নির্ধারিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করতে সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ ধারাবাহিকভাবে তিনটি এইচপিএনএসপি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। চতুর্থ এইচপিএনএসপি সেই ধারাবাহিক কর্মসূচির প্রথমটি। বর্তমানে বাংলাদেশ এসডিজি-৩-এর বেশকিছু লক্ষ্য অর্জন থেকে বেশ পিছিয়ে আছে, যা এ খাতের জন্য নির্ধারিত ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রাম, ধনী ও দরিদ্র এবং বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অসমতা বিরাজমান। এছাড়া শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মানদণ্ড ও সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতেও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য রোধ করা এবং রোগী ও তার স্বজনের ওপর অর্পিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের বোঝা (বিশেষ করে গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য) কমাতে স্বাস্থ্যনীতিতে যথোপযুক্ত বিধান সংযুক্ত করা উচিত।

৪ গুণগত শিক্ষা

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিতকরণ

৪.১ এসডিজি ৪ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

যদিও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ বেড়েছে এবং শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তথাপি ২০১৭ সালের হিসাবমতে, বিশ্বব্যাপী ৬ থেকে ১৭ বছর বয়সি ২৬ কোটি ২০ লাখ (২৬২ মিলিয়ন) শিশু-কিশোর এখনো শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে ছিল। তাছাড়া শিক্ষায় অংশ নেওয়া অর্ধেকেরও বেশি কিশোর-কিশোরী বই পঠন ও গণিতে যথাযথ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন একদিকে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সুযোগ এনে দিচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষার পরিবেশের ক্ষেত্রে বেশকিছু নতুন চ্যালেঞ্জের জন্ম দিচ্ছে। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে শিক্ষকরা তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারছেন না। পাশাপাশি শিক্ষার মানও ধরে রাখা যাচ্ছে না। শিক্ষা থেকে অধিকতর সুফল আহরণের লক্ষ্যে জীবনচক্রভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে নবোদ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে নারী, কন্যাশিশু এবং প্রান্তিক ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ আরও অবারিত করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে ৭২টি দেশের তিন ও চার বছর বয়সি শিশুদের ওপর জরিপ চালানো হয়। এতে দেখা যায়, প্রতি ১০ জন শিশুর সাতজনই তিনটি মানদণ্ডে বয়স অনুপাতে বুদ্ধিমত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পথেই আছে। এ মানদণ্ডগুলো হলো–সাক্ষরতা ও গণনার সক্ষমতা, দৈহিক উন্নয়ন, এবং সামাজিক আবেগ ও শিক্ষণ বিষয়ে অগ্রগতি। ২০১৭ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, ওই সময় বিশ্বব্যাপী প্রতি তিনজনের দুজন শিশু প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ নিয়েছে। এ ধরনের শিক্ষা শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে।

২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী, ওই সময় বিশ্বব্যাপী প্রায় ৭৫ কোটি (৭৫০ মিলিয়ন) মানুষ ছিল নিরক্ষর। তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী। বিশ্বের মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকেরই বাস দক্ষিণ এশিয়ায়; আর এক-চতুর্থাংশের বাস সাব-সাহারা আফ্রিকায়। কার্যকর শিক্ষাবিস্তারের পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে ধরনের মৌলিক অবকাঠামো প্রয়োজন, অনেক দেশেই এখনো তার ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সাব-সাহারা আফ্রিকা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সেখানে প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও ন্যূনতম পানযোগ্য পানির ব্যবস্থা আছে অর্ধেকেরও কম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে গোটা বিশ্বেই প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনুপাত বাড়ানোর অগ্রগতিতে ঘাটতি বিদ্যমান। ২০১৫ সাল থেকেই এ অনুপাত ৮৫ শতাংশে স্থবির হয়ে আছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের এ অনুপাত সবচেয়ে কম সাব-সাহারা আফ্রিকায়। সেখানে প্রাথমিক স্তরে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনুপাত ৬৪ শতাংশ।

এক হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী বয়সের এক কোটি ১৩ লাখ (১১ দশমিক ৩ মিলিয়ন) শিশু স্কুলে যায় না। এদের মধ্যে ৫৮ লাখ মেয়ে ও ৫৫ লাখ ছেলেশিশু। এছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত বয়সের দুই কোটি ছয় লাখ শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে। এদের মধ্যে ৮৯ লাখ মেয়ে ও এক কোটি ১৬ লাখ ছেলেশিশু। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে মাত্র ৬৯ শতাংশ শিশুর ক্ষেত্রে স্কুলপূর্ব বাল্যশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান। এখানে লক্ষণীয়, স্কুলে না যাওয়া শিশুদের মধ্যে মেয়ের চেয়ে ছেলের সংখ্যা বেশি। এই বিপুলসংখ্যক শিশু শিক্ষার বাইরে থাকায় তাদের মধ্যে বাল্যবিয়ের হার বেড়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাল্যবিয়ের হার সবচেয়ে বেশি। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে স্কুলে যাওয়াদের মধ্যে মাত্র অর্ধেক শিশু ন্যূনতম মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারে। স্পষ্টতই দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সংকট বিরাজমান। এখানকার অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষে এখনো শিক্ষকদের বই থেকে আবৃত্তি-নির্ভর শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত। তাছাড়া স্কুলে অনেক শিশুই শারীরিক নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। শিক্ষায় অংশ নেওয়া তরুণদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ মাধ্যমিক স্তরের উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করে স্কুল ত্যাগ করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ জনগোষ্ঠী ভবিষ্যৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় দেশের নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা (ইএসডি) বা Education for Sustainable Development (ESD) শীর্ষক একটি নতুন আন্তর্জাতিক ধারণার প্রচলন ঘটেছে। একটি দেশের এসডিজি অর্জনে সক্ষমতা বাড়ানো ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে এটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইএসডি বাস্তবায়নের জন্য যে বৈশ্বিক কর্মসূচি (গ্যাপ) বা Global Action Programme (GAP) গৃহীত হয়েছে, তাতে এই এজেন্ডার জন্য পাঁচটি অগ্রাধিকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো–প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা, সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান পদ্ধতি, শিক্ষাব্রতী, তারুণ্য ও স্থানীয় জনসমষ্টি। গোটা বিশ্বেই শিক্ষার অপরিহার্যতা অপরিসীম। তাই এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতও তাদের সম্পদ ব্যবহার করে 'সবার জন্য শিক্ষা' প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সরকারের দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সব শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ উন্মুক্তকরণে দৃঢ় নেতৃত্ব সহায়তা করবে।

বিদ্যমান শ্রমশক্তির দক্ষতার ঘাটতি পূরণ ও নতুন চাকরির জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই দক্ষতার ঘাটতি বর্তমান শ্রমবাজারের প্রধান সমস্যা। ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য একটি বৃহৎ আকারের কর্মিসম্ভার গড়ে তুলতে শিক্ষা খাতে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত বিনিয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ উদ্ভাবনের নতুন উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে, যা নতুন নতুন বাজার ধরার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। সাধারণত শিক্ষা একটি দেশীয় বা স্থানীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়, যা দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্থানীয় জনসমষ্টির জন্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণভাবে উত্তম চর্চার প্রবর্তন অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নের ধারণাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত সরকারি খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রয়োজন।

৪.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৪ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

সূচক ৪.১.১: ন্যূনতম পঠন ও গণিতে দক্ষতা অর্জনে লিঙ্গভেদে শিশু ও তরুণদের অনুপাত

প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের অধ্যয়ন শেষে একজন শিক্ষার্থীর ন্যূনতম যে দক্ষতা অর্জন করার কথা, তা পরিমাপে আন্তর্জাতিক সূচক রয়েছে। কিন্তু সেই সূচকের জন্য যে ধরনের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত দরকার, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে তার ঘাটতি রয়েছে। যাহোক, ২০১৯ সালের বহুমাত্রিক গুচ্ছ জরিপ বা মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) অনুযায়ী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (গ্রেড) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা পঠনের ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্ক কষার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে মাত্র ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী।

২০১৫ সালে মাধমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর পরিচালিত জরিপের ফল অনুযায়ী, নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষে বাংলা পঠনে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করে ৫৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ ছেলে ও ৫৪ শতাংশ মেয়ে। অন্যদিকে ইংরেজি পড়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করে মাত্র ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ২২ শতাংশ ছেলে ও ১৮ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী। এমন দুর্বল ফলাফলের জন্য প্রধানত দায়ী দক্ষ শিক্ষকের অভাব। এছাড়া গণিতে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীর হার ৫৭ শতাংশ। তাদের মধ্যে ৬২ শতাংশ ছেলে ও ৫২ শতাংশ মেয়ে শিক্ষার্থী। ২০২০ সাল নাগাদ শিক্ষাক্ষেত্রে এসডিজির যে মাইলফলক নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অর্জনে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে রয়েছে।

সূচক ৪.২.১: জেন্ডারভেদে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সিদের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে ট্র্যাকে থাকা শিশুর অনুপাত

এ সূচকের জন্য কোনো ভিত্তি উপাত্ত নেই। যাহোক, ২০১৯ সালের গওঈঝ উপাত্তকে এ সূচকের জন্য নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে লিঙ্গ ও এলাকাভেদে উপাত্তের বিভাজন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটির তথ্যমতে, ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ স্বাস্থ্য, শিক্ষণ ও মনঃসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক পথেই আছে। এদের মধ্যে ছেলেশিশুর হার ৭১ দশমিক ৪ এবং মেয়েশিশুর হার ৭৮ শতাংশ। এতে আরও দেখা যায়, শহরাঞ্চলের শিশুদের এমন উন্নয়নের ধারা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের তুলনায় বেশি। এতে আরও দেখা যায়, শহরের ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশ শিশুর মনোদৈহিক বিকাশ যথাযথ মানে এগোচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৭৩ দশমিক ৭ শতাংশ।

সূচক ৪.২.২: আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য বয়সের এক বছর আগে)

বাল্যশিক্ষা বা Early Childhood Education (ECD) শিক্ষায় কার্যকর দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে ইসিডি পদ্ধতি যুক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসিডি পদ্ধতি খুব অল্প বয়স থেকেই শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করে। বৈশ্বিক উন্নয়ন সূচক (ডব্লিউডিআই) অনুসারে, গত দুই দশকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তিতে বাংলাদেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০০০ সালে প্রাক-প্রথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ১৭ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা ৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১৯ সালের MICS প্রতিবেদন অনুসারে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য বয়সের এক বছর আগে) ৭৭ দশমিক ৪ শতাংশ। এদের মধ্যে ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ ছেলে ও ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ মেয়ে। এতে বোঝা যায়, শিক্ষার একদম প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশ সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ ও সমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

সূচক ৪.৪.১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (আইসিটি) দক্ষতার অনুপাতে তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত

এ সূচকের বেলায় কেবল নারীদের বিষয়ে সহজলভ্য উপাত্ত আছে। ২০১৯ সালের MICS উপাত্ত অনুসারে, ৪ দশমিক ৬ শতাংশ নারী কম্পিউটার ব্যবহার করে, ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন আছে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ নারীর, আর মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ১৪ দশমিক ২ শতাংশ নারী। শহরের নারীরা গ্রামের নারীদের তুলনায় প্রযুক্তিতে বেশি দক্ষ। শহরাঞ্চলে কম্পিউটার ব্যবহারকারী নারীর অনুপাত ১১ দশমিক ২ শতাংশ। আর গ্রামে এ হার মাত্র ২ দশমিক ৫ শতাংশ। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সেলফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে শহরে নারীর অনুপাত ৭১ দশমিক ৪ আর গ্রামে ৬৮ দশমিক ৬ শতাংশ। এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শহরাঞ্চলে ২৫ দশমিক ১ শতাংশ নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ১০ দশমিক ৯ শতাংশ।

সূচক ৪.৫.১: শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা

স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর গড় অনুপাতকে জেন্ডার সমতা সূচক (জিপিআই) বলে। কোনো দেশের ক্ষেত্রে যদি জিপিআইয়ের মান ১ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে শিক্ষার্থী ভর্তিতে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা সমান। আর যদি মান ১-এর কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছেলের তুলনায় কম। ব্যানবেইস ও এমআইসিএসের সর্বশেষ উপাত্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জিপিআইতে ১-এর অধিক মান অর্জন করেছে (সারণি ৪.১)। তৃতীয় পর্যায়ের (স্নাতক পর্যায়) শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো জিপিআই মান ১ হয়নি। অবশ্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে খুব পিছিয়ে আছে, তা বলা যাবে না। তবে কারিগরি স্তরে বাংলাদেশের অর্জিত মান শূন্য দশমিক ৭২।

সারণি ৪.১: শিক্ষায় জেন্ডার সমতা সূচক, ১৯৯০-২০১৯

শিক্ষার স্তর	২০০৫	২০১১	২০১৩	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
প্রাথমিক	১.০৫	১.০৬	১.০৪	১.০৮	১.০৬	...	১.০৭৫	...
মাধ্যমিক	১.০৭	১.১৫	১.০৮	১.১৩	১.১০৩	১.১৬৯	১.১৬২	১.১৯
তৃতীয় পর্যায়	০.৫২	০.৬৯	...	...	০.৭০১	০.৭০০৮	০.৭০৭	০.৯৩
কারিগরি	০.৩৫	...	০.৩৯	০.৩১৫	০.৩১৫	০.৩২	০.৩২৯	০.৭২

সূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক; ব্যানবেইস, কারিগরি শিক্ষা পরিসংখ্যান (২০১৮), MICS (২০১৯)

স্কুলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়াতে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে খাবার বিতরণ/নগদ সহায়তা এবং মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি ও টিউশন ফি মওকুফ কর্মসূচি। জিপিআই সূচকে মান বাড়াতে সরকার কারিগরি শিক্ষায়ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষায় জেন্ডার সমতা ধরে রাখতে (এবং বাড়াতে) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা স্তরে সরকারের উদ্যোগসমূহ চলমান রাখতে হবে।

সূচক ৪.৬.১: জেন্ডারভেদে ব্যবহারিক (ক) সাক্ষরতা ও (খ) গণন দক্ষতায় ন্যূনতম নৈপুণ্য অর্জনকারী নির্দিষ্ট বয়সের জনগোষ্ঠীর হার

যদিও প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্তিতে ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তারপরও পূর্ণবয়স্ক সাক্ষরতা পর্যায়ে দক্ষতা বাড়ানোর কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন। স্বল্প দক্ষ ও নিম্নআয়ের বয়স্ক নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে সরকার বেশকিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আগে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল মৌলিক সাক্ষর জ্ঞানের বিষয়ে জোর দেওয়া হতো। এখন এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও ও সুশীল সমাজের সংগঠন বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে দেশে চমকপ্রদ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০০৫ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৩ শতাংশ। ২০১৮ সালে তা ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (সারণি ৪.২)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক সাক্ষরতায় নারী ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যকার ব্যবধানও কমে এসেছে।

সারণি ৪.২: ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সি প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার

	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক	৫৩.৫	৫৮.৬	৬৪.৬	৭২.৩	৭২.৯	৭৩.৯
পুরুষ	৫৮.৩	৬২.৯	৬৭.৬	৭৫.২	৭৫.৭	৭৬.৭
নারী	৪৮.৬	৫৫.৪	৬১.৬	৬৯.৫	৭০.১	৭১.২

সূত্র: বিবিএস, স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটিসটিকস, বিভিন্ন বছর

সূচক ৪.ক.১: মৌলিক পরিষেবা ও সুবিধাসংবলিত স্কুলের অনুপাত

সব শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ ও ফলপ্রসূ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে কিছু মৌলিক পরিষেবার সুবিধা থাকা আবশ্যক। এগুলো হলো–আইসিটির সুবিধা গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণের সুবিধার্থে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সুবিধা, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে স্কুল ভবনে র‍্যাম্প সুবিধা ও প্রয়োজনীয় বইপত্রসহ অন্যান্য সরঞ্জাম থাকা, স্কুল চলাকালে শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত পানযোগ্য পানির ব্যবস্থা এবং সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা থাকা।২০১৬ সালের জিইএমআর উপাত্ত অনুযায়ী, প্রায় ৭৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ স্কুলে বিদ্যুৎ সুবিধা আছে। এছাড়া শিক্ষাকাজে সহায়তার জন্য ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ স্কুলে ইন্টারনেট এবং ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ স্কুলে কম্পিউটার সুবিধা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, ৫২ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ স্কুলে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক অবকাঠামো ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৭০ দশমিক ৮৮ শতাংশ স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি ন্যূনতম ব্যক্তিগত পরিচরছন্নতার (হাত ধোয়া) ব্যবস্থা আছে ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ স্কুলে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত যে মাইলফলক রয়েছে, সেখানে পৌঁছাতে হলে বাংলাদেশকে এখনো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

সূচক ৪.গ.১: সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য ন্যূনতম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপাত

যেকোনো প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠদান করতে হলে শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যক। যাহোক, বাংলাদেশে নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (সি-ইন ইডি ট্রেইনিং) গ্রহণের হারে নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট হিসাবমতে, ২০১৫ সালে ৭৩ শতাংশ শিক্ষক সি-ইন ইডি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। ২০১৮ সালে এ হার নেমে এসেছে ৬৯ শতাংশে, যদিও ২০১৭ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণের হার ছিল এর চেয়েও কম (সারণি ৪.৩)।

সারণি ৪.৩: প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সি-ইন ইডি প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষকের অনুপাত

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
সি-ইন ইডি প্রশিক্ষণপ্রাপত শিক্ষক (%)	৭৩	৭৫.৫	৬৬.৩	৬৮.৭৩

সূত্র: বার্ষিক প্রাথমিক শিক্ষা শুমারি, বিভিন্ন বছর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.৩ এসডিজি ৪ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কৌশলে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অন্যতম হলো, নাগরিকদের মধ্যে মানবিকতার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন করে সরকার। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল, যুক্তিবাদী, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে তারা দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্বগুণ অর্জন করতে পারে।

২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসডিজি ৪ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রাথমিক উপ-খাতে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি পুরো প্রক্রিয়ার দক্ষতা উন্নয়ন; টেকসই, সুব্যবস্থিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে সরকার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩); বৃত্তিপ্রদান কর্মসূচি; স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ (আরওএসসি) প্রকল্প, দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় স্কুলে খাবার সরবরাহ কর্মসূচি ও শিক্ষা গ্রহণে দ্বিতীয় সুযোগ কর্মসূচি এবং মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচি। দেশের ৬৪ জেলাতেই এসব কার্যক্রম চলমান।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার যে দীর্ঘমেয়াদি দর্শন ও কর্মকাঠামো গ্রহণ করেছে, তাতে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে: (১) প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিতকরণ; এবং (২) মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও ফলাফল উন্নয়ন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের (শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং পর্যবেক্ষণ জোরদারকরণ) পাশাপাশি আরও যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে- তার মধ্যে রয়েছে, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষমতা বাড়ানো, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদার করা এবং শিক্ষাসেবার আওতার বাইরে থাকা মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনা। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন এ কার্যক্রমের অন্যতম কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়।

উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের আওতা, সুযোগ ও এ পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার ৪১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। পাশাপাশি দেশে বিশ্বমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'আন্তঃসীমান্ত উচ্চশিক্ষা আইন, ২০১৪' বা 'Cross Border Higher Education (CBHE) Act, 2014' প্রণয়ন করেছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানার্জন কার্যক্রম উৎসাহিত করতে শিক্ষা উদ্ভাবন তহবিল চালু করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্ক (বিডিআরইএস) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে ২০১৬ সালে জাতীয় অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন বলবৎ করা হয়েছে।

দেশের তরুণ ও যুবসমাজকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। দেশের মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ২০২০ সালের মধ্যে মোট ২০ শতাংশ স্কুল-কলেজে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভেট) বা Technical-Vocational Education and Training (TVET) ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্য রয়েছে। ২০৩০ সাল নাগাদ এ হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। টিভেট কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামো বা National Technical and Vocational Qualifications Framework (NTVQF) প্রণয়ন করেছে। এসডিজি-৪ অর্জনের বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক ও কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমানে শিক্ষা খাতে সরকারি বিনিয়োগ দেশের মোট জিডিপির দুই শতাংশ- যা দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও সর্বনিম্ন বিনিয়োগের অন্যতম। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ৪০ লাখ (চার মিলিয়ন) শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এসডিজি-৪ অর্জনের ক্ষেত্রে এসব শিশুকে স্কুলশিক্ষার আওতায় আনা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। যেসব জনগোষ্ঠীর শিশু স্কুলশিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কর্মজীবী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশু এবং দুর্গম এলাকা বা বস্তিতে বসবাসকারী বা দরিদ্র পরিবারের শিশু। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বর্তমানে শিশুদের অন্তর্ভুক্তি ৯৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ, কিন্তু এর বিপরীতে ঝরে পড়ার হারও অনেক বেশি- ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ। আর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পৌঁছাতে পারে না অথবা সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে না; তার আগেই ঝরে পড়ে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে যেসব বিষয় শিক্ষা কার্যক্রমকে পশ্চাৎমুখী করে তুলছে- তার অন্যতম পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত দখল ও জ্ঞান বিতরণের দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংকট। তাছাড়া শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি সেবাও কেন্দ্রীভূত। শিক্ষার বিষয়ে অধিকাংশ নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয় রাজধানী থেকে। এসডিজি-৪ অর্জনে ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সি শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অসমতাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে গ্রাম-শহরেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান। আর বিদ্যমান অবকাঠামোতে সমতাভিত্তিক বা সমতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

৪.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

যদিও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার বিষয়টি এখনো রীতিমতো উদ্বেগের পর্যায়ে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির অনুপাত অনেক কম। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে আরও অনেক বেশি জোর দিতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকা বিশেষ করে কর্মজীবী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশু এবং দুর্গম এলাকা বা বস্তিতে বসবাসকারী বা দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে কর্মপরিকল্পনায় বিশেষ নজর দিতে হবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) সর্বোত্তম নীতি হচ্ছে ভালো মানের শিক্ষায় সবার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশে শিক্ষাই হবে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ। আর সবার জন্য যত বেশি হারে শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে, ভবিষ্যতে অসমতা তত কমবে। বাংলাদেশে উচ্চ আয় ও সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবারের কাছে শিক্ষা এখনো শক্তিশালী একটি বাহক হিসেবে রয়ে গেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ভালো মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট সরকারি কর্মসূচি প্রয়োজন। দেশে চরম মাত্রায় আয়বৈষম্য বিরাজমান থাকা অবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা কেবল একটি রাজনৈতিক ও কারিগরি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। এ ধরনের বিবেচনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি জোরদার ও তাদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সরকারি বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে ধনী শ্রেণির পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি করবে।

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) ব্যবহার উৎসাহিত করতে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সব শ্রেণিকক্ষ অডিও-ভিজুয়াল সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড সংযুক্ত করা হয়েছে। এমন সুবিধাসংবলিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া জোরদার করার মাধ্যমে ক্লাস সেশন ফলপ্রসূ করে তুলতে শিক্ষকদের ইলেকট্রনিক বই (ই-বুক) ও ইলেকট্রনিক শিক্ষা সরঞ্জাম (ই-লার্নিং) ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচির (সেসিপ) আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করছে। 'জ্ঞান শিক্ষণের জন্য আইসিটি' আইসিটির কার্যক্রম সম্প্রসারণের আরেকটি উদ্যোগ।

এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শিক্ষাবিষয়ক পরিসংখ্যান সংস্থা বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) একটি জাতীয় সূচক কাঠামো (এনআইএফ) প্রণয়ন করেছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি উপাত্তের ম্যাপিং ও মান মূল্যায়ন কাঠামো, শিক্ষা পরিসংখ্যানের উন্নয়নে একটি জাতীয় কাঠামো (এনএসডিইএস) এবং একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এনআইএফে জাতীয় পর্যায়ের ১৩০টি সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৯৭টিই এসডিজি-৪-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায় দেশীয় অর্থায়নের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ প্রতিবছর চূড়ান্ত হিসাবে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু মোট জাতীয় বাজেটের অংশ হিসাবে শিক্ষায় বরাদ্দ এখনো গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, দেশের মোট বাজেটের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ এবং মোট জিডিপির চার থেকে ছয় শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দিতে হবে। বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষায় বরাদ্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ 'জিডিপির দুই শতাংশের ফাঁদে' আটকে আছে। সরকার যদি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ না বাড়ায়, তবে জাতির অনেক উচ্চাশা অপূর্ণ থেকে যাবে। পাশাপাশি গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের একটি সমন্বিত পর্যালোচনা আবশ্যক। এছাড়া মান নিশ্চিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ ও আইসিটির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

৪.৬ সারকথা

প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের অধ্যয়ন শেষে একজন শিক্ষার্থীর ন্যূনতম যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার কথা, তা পরিমাপে আন্তর্জাতিক সূচক রয়েছে। কিন্তু সেই সূচকের জন্য যে ধরনের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত দরকার, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে তার ঘাটতি রয়েছে। যাহোক, ২০১৯ সালের MICS অনুযায়ী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির (গ্রেড) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা পঠনের ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে অঙ্ক কষার ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করেছে মাত্র ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। ওই জরিপে প্রত্যক্ষ করা যায়, এতে অংশ নেওয়া শিশুর ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ স্বাস্থ্য, শিক্ষণ ও মনঃসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক পথেই আছে। এদের মধ্যে ছেলেশিশুর হার ৭১ দশমিক ৪ এবং মেয়েশিশুর হার ৭৮ শতাংশ। এতে আরও দেখা যায়, শহরাঞ্চলের শিশুদের এমন উন্নয়নের ধারা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের তুলনায় বেশি। শহরের ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশ শিশুর

মনোদৈহিক বিকাশ যথাযথ মানে এগোচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৭৩ দশমিক ৭ শতাংশ। ব্যানবেইস ও এমআইসিএসের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জেন্ডার সমতা সূচকে (জিপিআই) বাংলাদেশ নির্ধারিত মানদণ্ডের (১) চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। তৃতীয় পর্যায়ের (tertiary) শিক্ষা স্তরেও যে বাংলাদেশ জেন্ডার সমতায় খুব পিছিয়ে আছে, তা নয়। এ স্তরে জিপিআই সূচকে বাংলাদেশের প্রাপ্ত মান ০.৭২, যা ১-এর নিচে।

স্কুলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়াতে সরকার বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে খাবার বিতরণ/নগদ সহায়তা এবং মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রদান ও টিউশন ফি মওকুফ কর্মসূচি। জিপিআই সূচকে মান বাড়াতে সরকার কারিগরি শিক্ষায়ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বয়স্ক সাক্ষরতার হার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালে এ হার ছিল ৫৩ শতাংশ। ২০১৮ সালে তা ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়। এসডিজি ৪ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে থাকা প্রায় ৪০ লাখ শিশুর স্কুলে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এসব শিশুর সামনে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এসব প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুর মধ্যে রয়েছে জীবিকার তাগিদে শিশুশ্রমের শিকার হওয়া শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার ও দুর্গম এলাকার শিশু, বস্তিতে বসরবাসকারী শিশু এবং চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত পরিবারের শিশু।

যদিও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার বিষয়টি এখনো রীতিমতো উদ্বেগের পর্যায়ে রয়ে গেছে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীর তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির অনুপাত অনেক কম। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে আরও অনেক বেশি জোর দিতে হবে। এসডিজি-৪ অর্জনে সবার জন্য শিক্ষার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশে শিক্ষাই হবে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ। আর সবার জন্য যত বেশি হারে শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে, ভবিষ্যতে অসমতা তত কমবে। বাংলাদেশে আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবারের কাছে শিক্ষা এখনো ক্ষতিপূরণের চেয়ে শক্তির একটি বাহক হিসেবে রয়ে গেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ভালো মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট সরকারি কর্মসূচি প্রয়োজন। দেশে চরম মাত্রায় আয়বৈষম্য বিরাজমান থাকা অবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা কেবল একটি রাজনৈতিক ও কারিগরি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। এ ধরনের বিবেচনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি জোরদার করা ও তাদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সরকারি বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে ধনী শ্রেণির পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করবে।

৫ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন

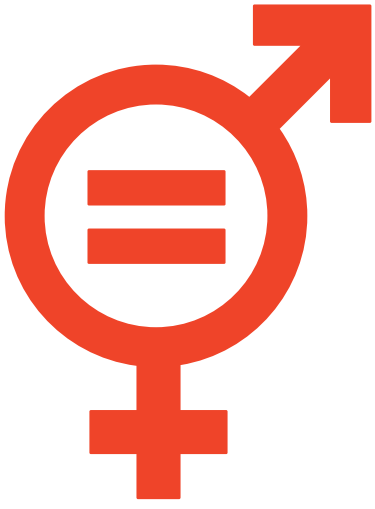

৫.১ এসডিজি ৫ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বব্যাপী বেশকিছু সূচকে ভালো অগ্রগতি হলেও সার্বিকভাবে সব সূচকে আরও অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে। জেন্ডার সমতার একদম প্রান্তিক স্তরে কাঠামোগত বিষয়ে অগ্রগতি সামান্য। যেমন: এসডিজি-৫ অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রেআইনি অসমতা, অন্যায্য সামাজিক রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, প্রজনন ও যৌনতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাজনীতিতে নারীর অপেক্ষাকৃত কম অংশগ্রহণ বিভিন্ন দেশের সক্ষমতা দুর্বল করে তুলছে।

শিক্ষা খাতে কন্যাশিশুদের অন্তর্ভুক্তি ও কৃষিবহির্ভূত শ্রম খাতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী বাল্যবিয়ে হ্রাসের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাল্যবিয়ে হ্রাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। এ অঞ্চলে শিশুবয়সে মেয়েদের বিয়ের শঙ্কা ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ। সাব-সাহারা আফ্রিকা এলাকায়ও বাল্যবিয়ের হার গ্রহণযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপীই শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাদের নিয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নারীর দখলে বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের ৩৯ শতাংশ। কিন্তু ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারীর অনুপাত কম। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, ব্যবস্থাপক পর্যায়ের নারীদের অনুপাত ছিল মাত্র ২৭ শতাংশ। ২০১৫ সালে এ হার ছিল ২৬ শতাংশ। অর্থাৎ তিন বছরে ব্যবস্থাপক পর্যায়ের চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বিশ্বের সব অঞ্চলে বৃদ্ধি পেলেও স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি। ৯০টি দেশের সাম্প্রতিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায়, অবৈতনিক পারিবারিক কাজে পুরুষের তুলনায় নারীরা তিনগুণ বেশি শ্রম দেয়, যে কারণে মজুরিভিত্তিক কাজে তাদের কর্মঘণ্টা কমে যায়। একই কারণে তারা শিক্ষা গ্রহণ ও অবসরও কম পান। এমন পরিস্থিতি নতুনভাবে তাদের জেন্ডারকেন্দ্রিক আর্থসামাজিক অসমতার দিকে ঠেলে দেয়।

রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ সব সময়ই তুলনামূলকভাবে কম। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশের আইনসভায় নারী প্রতিনিধিদের অনুপাত ছিল শূন্য থেকে ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ (৬১.৩%) পর্যন্ত। এক্ষেত্রে আইনসভায় নারীদের বৈশ্বিক অংশগ্রহণের গড় ২৪ দশমিক ২ শতাংশ। অবশ্য ২০১০ সালের তুলনায় এ অবস্থান অনেকটা ভালো। ওই সময় নারী প্রতিনিধির অনুপাত ছিল ১৯ শতাংশ। ৯৯টি দেশ ও অঞ্চলের স্থানীয় পর্যায়ের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অনুপাত ১ শতাংশের কম থেকে ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত। এক্ষেত্রে গড় প্রতিনিধিত্বের অনুপাত ২৬ শতাংশ। নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে তাদের জন্য কোটা নির্ধারণ করে দেওয়ার পর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্বের হার চমকপ্রদভাবে বেড়ে যায়।

৫১টি দেশের ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি নারীদের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, মাত্র ৫৭ শতাংশ নারী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং বিভিন্ন জন্ম নিরোধক ব্যবহার বা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। ১০৬টি দেশের সাম্প্রতিক এক উপাত্তে দেখা যায়, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি নারীদের ১৮ শতাংশ গত ১২ মাসে এক বা একাধিকবার তাদের সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় এ নির্যাতনের হার বেশি- ২৪ শতাংশ।

গত ২৫ বছরে বিশ্বব্যাপী নারী সমতায়ন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক আইন সংস্কারে প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। তথাপি এখনো বিভিন্ন দেশে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও প্রথা বিদ্যমান। ২০১৮ সালে ৫৩টি দেশ থেকে আইনের চারটি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এগুলো বিশ্লেষণ করে জানা যায়, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দেশে নারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন বৈষম্যমূলক আইনি কাঠামো বিদ্যমান। আইনগত যে চারটি বিষয়ে বৈষম্যমূলক অবস্থার চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সংবিধান, বৈষম্যবিরোধী আইন, কোটা ও আইনি সহায়তা প্রাপ্তি। উল্লিখিত সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আইন রয়েছে। পরিবার ও বিয়ের ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ কর্মসংস্থান ও ২৪ শতাংশ আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তিতে বৈষম্যের শিকার হন।

বিশ্বব্যাপী জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বাস্তবায়নে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাজেট বাস্তবায়নের ফলাফল পর্যবেক্ষণে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। ২০১৮ সালের ৬৯টি দেশের উপাত্ত পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, জেন্ডার বাজেট বিষয়ে পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত উপাত্ত যথাযথ উপায়ে পাওয়া যায় মাত্র ১৩টি দেশে। ৪১টি দেশ এ ধরনের উপাত্ত সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জেন্ডার সংবেদনশীল খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার পর সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তথা নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকার ওপর তা কী ধরনের প্রভাব ফেলছে এবং এ বাজেটের প্রকৃত ফলাফল কী, তা পর্যবেক্ষণে বিশেষ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি 'ফলো দ্য মানি' নামে পরিচিত। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত অর্থ কোথায় কীভাবে ব্যয় হচ্ছে এবং সে ব্যয়ের ফলাফল কী, তা নিয়মিত অনুসরণভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ খাতে বরাদ্দ করা অর্থ নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান হ্রাসে যাতে ভূমিকা রাখে, সেজন্য বাজেট প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে কৌশল প্রণয়নের বিষয়ে জেন্ডার বাজেটিং গুরুত্ব দেয়। জেন্ডার বাজেটকে ফলপ্রসূ করে তুলতে আগামী দিনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর উচিত হবে এর জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার উদ্যোগ নেওয়া। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে অগ্রগতির জন্য ভিন্ন ধারার জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

সমতা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সর্বজনীন উপলব্ধি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমে অসমতার প্রধান ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। বিশেষ করে সুযোগের অসমতা, আইন ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসমতা, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে নারী ও পুরুষের সুযোগের অসমতা, মজুরিবিহীন সেবা ও গৃহস্থালি কাজের অসম বিভাজন, সম্পদে নারীর সীমিত নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং ব্যক্তি খাত ও সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যবসা করার সুযোগের ক্ষেত্রে অসমতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। জেন্ডার সমতা নারীকে যেসব বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করা, সম্পদ ও সুযোগের প্রাপ্যতার অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলা, ঘরে ও ঘরের বাইরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চর্চা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নততর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন আনার কাজে নেতৃত্বদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৫.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৫ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এখানে নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাকারী ও কর্মসূচির বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে। দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণের নীতিসমূহেও জেন্ডার বিষয়টি সংযুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এসডিজি ৫ অর্জনে বাংলাদেশ চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং এরই মধ্যে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করতে সক্ষম হয়েছে। বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য সূচক ২০২০ অনুসারে, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। জেন্ডার বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০০ দেশের মধ্যে অবস্থানকারী দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ বাংলাদেশ।

সূচক ৫.২.১: বিগত ১২ মাসে সহিংসতার ধরন ও বয়সভেদে বর্তমান বা প্রাক্তন স্বামী কিংবা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কর্তৃক শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সি বিবাহিত নারী ও কন্যার অনুপাত

একজন নারীর নিজস্ব পছন্দ ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পারিবারিক অবদমন ও সহিংসতা থেকে মুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০১৫ সালে নারীর প্রতি সহিংসতা বা Violence Against Women (VAW) বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করেছিল বিবিএস। ২০১৬ সালে ওই জরিপের ফল প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায়, ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে বিবাহিত নারীদের মধ্যে ৫৪ দশমিক ২ শতাংশ দাম্পত্য জীবনে কমপক্ষে একবার স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। আর ওই সময় থেকে বিগত ১২ মাসে সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছিল প্রায় ২৭ শতাংশ বিবাহিত নারী। ২০১৫ সালের পর হালনাগাদ উপাত্ত ও প্রমাণাদির অভাবে এ সূচকের সাম্প্রতিক অবস্থা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। যাহোক, 'বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন, ২০২০' অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ নারী তাদের জীবনে কোনো না কোনো সময় জেন্ডার সহিংসতার শিকার হয়েছে।

সূচক ৫.২.২: বিগত ১২ মাসে বয়স ও স্থানভেদে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী নয়, এমন ব্যক্তির দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সি নারী ও বালিকার অনুপাত

ডব্লিউএইচও'র তথ্যমতে, 'বাড়ি ও কর্মস্থলসহ যেকোনো স্থানে যেকোনো পরিস্থিতিতে নারীর সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধতার ক্ষেত্র নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তির দ্বারা নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের যৌন কর্মকাণ্ড, যৌন কর্মকাণ্ডের প্রচেষ্টা, যৌনবিষয়ক অবাঞ্ছিত মন্তব্য, পাচারের চেষ্টা প্রভৃতি যৌন সহিংসতা হিসেবে বিবেচিত হবে।' বিবিএসের ২০১৫ সালের জরিপ অনুযায়ী, বিগত ১২ মাসে ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সি নারী ও বালিকাদের মধ্যে ২ দশমিক ৫ শতাংশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বাইরের ব্যক্তিদের দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে।

সূচক ৫.৩.১: ১৫ ও ১৮ বছরের আগে বিয়ে বা কোনো ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এমন ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি নারীর অনুপাত

বিবিএস ও ইউনিসেফের ২০১৯ সালের উপাত্ত থেকে জানা যায়, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি নারীদের মধ্যে ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ ১৫ বছরের আগে বিয়ে বা অন্য কোনো ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আর ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়েছে ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ নারীর। এক্ষেত্রে ২০১৫ সালের তুলনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৫ সালে বিবিএস পরিচালিত নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপের প্রতিবেদন (বিবিএস, ২০১৬) অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ১৫ বছরের আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীর অনুপাত ছিল ২২ শতাংশ এবং ১৮ বছরের আগে বিয়ে হওয়া নারীর অনুপাত ছিল ৫৯ শতাংশ। ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাল্যবিয়ে সংঘটনের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ। আর কন্যাশিশুদের বিয়ে দেওয়ার সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ২য় (৪৪ লাখ ৫০ হাজার বা ৪.৪৫ মিলিয়ন) কন্যাশিশু বিবাহের শিকার হয়েছে। বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২০ অনুসারে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে যেসব নারীর বিয়ে হয়েছে, তাদের ৪৫ দশমিক ২০ শতাংশেরই বয়স ছিল ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে।

সূচক ৫.৪.১: জেন্ডার, বয়স ও স্থানভেদে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ব্যয়িত সময়ের অনুপাত

এটা প্রমাণিত, বাংলাদেশে অবৈতনিকগৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে একজন পুরুষের তুলনায় একজন নারী তিনগুণ বেশি সময় ব্যয় করে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ (বিবিএস, ২০১৭) ও ২০১৮ সালের বাংলাদেশ জেন্ডার পরিসংখ্যান মতে, ২০১৬-১৭ সময়ে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে পুরুষের ব্যয় করা গড় সময়ের অনুপাত ছিল ৭ শতাংশ। এর বিপরীতে নারী ব্যয় করেছে ২৪ শতাংশ সময়। ২০১২ সালে মজুরিবিহীন পরিচর্যা কাজে নারীর ব্যয়িত সময়ের অনুপাত ছিল ২৫ দশমিক ৮ শতাংশ, যা পুরুষের ব্যয় করা সময়ের প্রায় পাঁচগুণ। অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে সময় ব্যয় বলতে বোঝায়, ওই সময়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের উপভোগের জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তিনি সেটা করতে পারেননি। দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত ঘণ্টা সময় একজন ব্যক্তি মজুরিবিহীন গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ব্যয় করে, তার গড়ের ভিত্তিতে এ সূচক নির্ণয় করা হয়েছে। এই বিচারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গৃহস্থালির সিংহভাগ মজুরিবিহীন কাজ নারীর ওপর অর্পিত এবং তারা সাধারণত পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি কর্মঘণ্টা কাজ করে।

সূচক ৫.৫.১: (ক) জাতীয় সংসদ ও (খ) স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধির অনুপাত

যেসব দেশের আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অনেক বেশি, বাংলাদেশ তার অন্যতম। নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে স্থিতিশীল অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। নারীর উন্নয়নে জাতীয় নীতি ২০১১ গ্রহণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে বেশকিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়েও নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদে নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধির হার চমকপ্রদ। ১৯৯১ সালে সংসদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির হার ছিল ১৩ শতাংশ; ২০১৪ সালে তা ২০ শতাংশে উন্নীত হয়। বর্তমানে সংসদে নির্বাচিত নারী সদস্যের অনুপাত ২০ দশমিক ৮৬ শতাংশ (জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ২০১৯) এবং স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির হার ২৫ দশমিক ২১ শতাংশ (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৮)। বর্তমানে জাতীয় সংসদের স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং সংসদ উপনেতা নারী। নারীর রাজনৈতিক সক্ষমতায়নের দিক দিয়ে বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য সূচকে ২০২০ সালে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম।

সারণি ৫.১: জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের অনুপাত, ১৯৯১-২০১৯

	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৮	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
নারী সদস্যের সংখ্যা	৪২	৪৩	৪১	৬৪	৭০	৭১	৭১	৭২	৭১	৭৩
মোট আসনসংখ্যা	৩৩০	৩৩০	৩৩০	৩৪৫	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
শতকরা হার	১২.৭৩	১৩.০৩	১২.৪২	১৮.৫৫	২০	২০.২৯	২০.২৯	২০.৫৭	২০.৩০	২০.৮৬

সূত্র: বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয় (বিপিএস) ও বিশ্বব্যাংক উপাত্ত

চিত্র ৫.১: নারী সংসদ সদস্যের শতাংশীয় হার

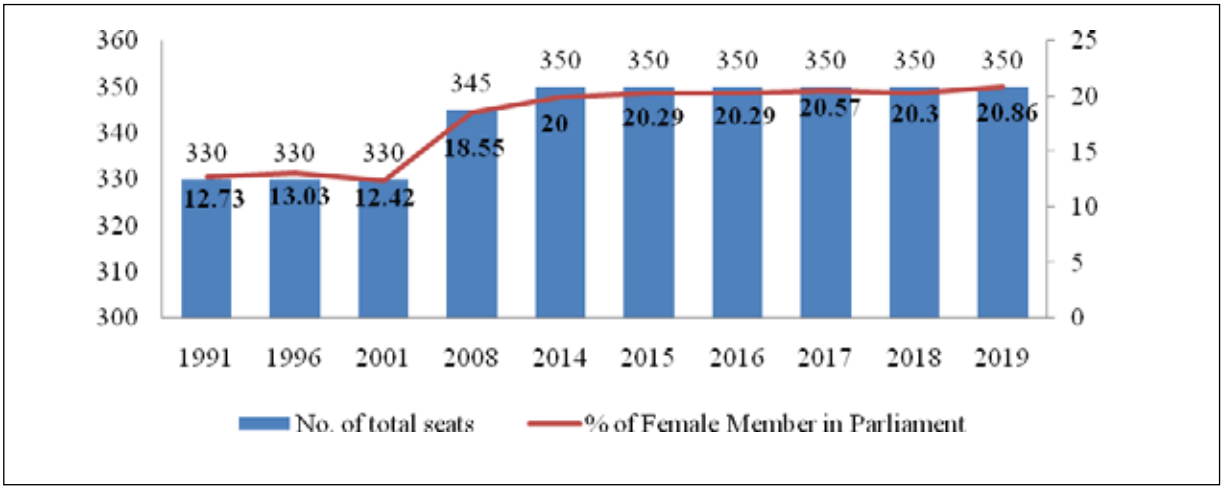

সূচক ৫.খ.১: জেন্ডারভেদে মোবাইল টেলিফোন স্বত্বাধিকারী ব্যক্তির অনুপাত

২০১৫ থেকে ২০১৮ সময়ের মধ্যে মোবাইল টেলিফোন স্বত্বাধিকারী ব্যক্তির অনুপাত কিছুটা কমেছে। বিটিআরসির ২০১৫ সালের হিসাবমতে, ব্যক্তিগত মোবাইল টেলিফোন আছে এমন ব্যক্তির অনুপাত ছিল ৭৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ। ২০১৮ সালে বিবিএস পরিচালিত সিপিএইচএস জরিপ অনুসারে, এ অনুপাত কিছুটা কমে ৭৮ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে।

৫.৩ এসডিজি ৫ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

বৈশ্বিক উদ্যোগে সরকারের অংশগ্রহণ: ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন থেকে ২ জুলাই মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘের সম্প্রসারিত কর্মসূচির ফল ছিল এ সম্মেলন। এতে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়কে নারী দশক ঘোষণা করা হয় এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) বা 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)'-এর খসড়া গৃহীত হয়। তখন থেকেই ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারী দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার সিডো সনদ অনুসমর্থন এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (বিপিএফএ) অনুমোদন করে। পাশাপাশি নারীর প্রতি সকল পর্যায়ের বৈষম্য বিলোপে সরকার ২০০০ সালে এমডিজি ও ২০১৫ সালে এসডিজি বাস্তবায়নে স্বপ্রণোদিত হয়ে অঙ্গীকার করে।

নীতি ও আইনি কাঠামো: এসডিজি ৫ অর্জনের লক্ষ্যে নারী অধিকার রক্ষায় সরকার বিভিন্ন ধরনের আইনি ও নীতি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীদের (বিশেষ করে দরিদ্র নারী) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণাঙ্গরূপে অংশগ্রহণের বিভিন্ন সুযোগ উন্মুক্ত করতে যেসব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নীতিগুলোর সমন্বয় সাধন এবং তার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা ও এর সুফল সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এখন বড় চ্যালেঞ্জ। শ্রমবাজারে যাতে আরও কার্যকর রূপে আবির্ভূত হতে পারে, তা নিশ্চিত করা; জেন্ডার অসমতা দূর করা; এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা নীতি গৃহীত হয়েছে।

স্বাধীনতার পরপরই গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) অসমতা বিলোপের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। পরে বছরের পর বছর এসব উদ্যোগের আওতা সম্প্রসারিত হয়েছে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সরকারের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিতে নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দারিদ্র্য নিরসন কৌশলসমূহেও জেন্ডার সমতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী অধিকার সংরক্ষণ করতে সরকার কতিপয় আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এসব আইন ও নীতিমালার মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩; সংশোধিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা (ডব্লিউপিডি) ২০১১; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০; পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৩; মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন (পিএসএইচটি) আইন ২০১২; হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২; জাতীয় শিশু আইন ২০১৩; বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ আইন ২০১৪ প্রভৃতি।

নারীদের মানবীয় সক্ষমতা উন্নয়ন: জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বাংলাদেশ এরই মধ্যে জেন্ডার সমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্টভাবে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে এক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে গ্রামাঞ্চলের মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও টিউশন ফি মওকুফের ব্যবস্থা এবং মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি চালু করা। এ উদ্যোগ স্কুলে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন উৎসাহিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অসমতা দূরিকরণে গৃহীত বিভিন্ন নীতি, যেমন–জেন্ডার শিক্ষা, সবার জন্য গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি কর্মসূচি, স্কুলে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহসহ অনুরূপ অন্যান্য পদক্ষেপ জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নে দারুণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

নারীর অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি: 'বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য সূচক, ২০২০' অনুসারে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা সূচকে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪১তম। নারীর অর্থনৈতিক সুবিধার ব্যাপারটির সঙ্গে বেশকিছু বিষয় প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদনশীল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও প্রাপ্যতা, অন্যান্য সম্পদ, সেবা, দক্ষতা, সম্পত্তি, কর্মসংস্থান, রোজগার, তথ্য, প্রযুক্তি, আর্থিক সেবা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ- যেমন ভূমি, পানি ও বনসম্পদের অধিকার নিশ্চিত করা।

নারী অগ্রগতির জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ: রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অধিকতর অংশগ্রহণ;সহায়ক আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশ; আইনি ও নীতি সহায়তা; অধিকতর ফলপ্রসূ সামাজিক ন্যায়বিচার উৎসাহিতকরণ; এবং অনুকূল সামাজিক রীতিনীতি এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইনের প্রয়োগ, জেন্ডার-বিযুক্ত উপাত্ত নিয়মিত সংগ্রহ করা, জেন্ডার ও সামাজিক বিশ্লেষণ দক্ষতা, যার মধ্যে রয়েছে সক্ষমতা উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং জেন্ডার কৌশলগুলো পরিবীক্ষণ এবং জেন্ডার বিষয়টি যথাযথ ভাবে বুঝতে পারাও এ অংশের মূল ক্ষেত্র।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট: জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট হলো বাজেটের জেন্ডারভিত্তিক মূল্যায়ন, বাজেট প্রক্রিয়ার সব স্তরে জেন্ডার ধারণার সন্নিবেশ ঘটানো এবং জেন্ডার সমতা উৎসাহিতকরণে বাজেটের রাজস্ব ও ব্যয়সমূহ পুনর্বিন্যাস করা। বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডারের নানা মাত্রা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতকরণে কিছু নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। ২০০৫ সালে সরকার জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট (জিআরবি) চালু করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেটে জিআরবি অনুসরণকারী মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৪৩টিতে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল চারটি। ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নারী উন্নয়নকেন্দ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট বাজেটের ২৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ, যা দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ। ২০০৯-১০ সময়ে মোট বাজেটে নারী উন্নয়নকেন্দ্রিক বরাদ্দের অনুপাত ছিল ২৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

৫.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

গৃহস্থালির সব অবৈতনিক কাজের বোঝা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অবধারিতভাবে পরিবারের নারী ও কন্যা সদস্যদের ওপর পতিত হয়। আর এ দায়িত্ব কাঁধে চাপার অর্থ হলো তারা বিশ্রাম, শিক্ষা গ্রহণ, নিজের যত্ন নেওয়া এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় না। পারিবারিক কাজের এ বৈষম্য আমাদের শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম। এছাড়া আরও যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, তার মধ্যে রয়েছে সমমানের কাজে সমহারে মজুরির নীতি উৎসাহিতকরণ, পেশাগত ও খাতভিত্তিক বিভাজনের মৌলিক কারণসমূহ মোকাবিলা করা, অবৈতনিক পারিবারিক পরিচর্যা কাজের চাপ হ্রাসকরণ, স্বীকৃতি ও এ কাজের পুনর্বণ্টন এবং বৈষম্য বিলোপ ও প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও সহিংসতা রোধ প্রভৃতি। শ্রমসাম্যের উন্নয়ন ঘটানো ও জেন্ডার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কাজের ধরনও পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

এসডিজি-৫ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো জেন্ডার-সংবেদনশীল উপাত্তের অভাব। উপাত্তের ঘাটতির কারণে এ অভীষ্টের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ উপাত্তের আরও যেসব মাত্রা বিদ্যমান, তার মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ, বয়স ও অন্যান্য

বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বিভাজিত উপাত্তের ঘাটতি এবং এসডিজি ৫ বাস্তবায়নের প্রবণতা পরিবীক্ষণে প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতি। জেন্ডারের ভিত্তিতে বৈষম্যহীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, এ-সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ ও গৃহী কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণের জন্য আইনি কাঠামোর বিষয়ে উপাত্তের সমন্বিত পর্যালোচনায় ঘাটতি বিদ্যমান।

নারীর প্রতি সহিংসতার বিলোপ

নারীরা যদি তাদের স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যের দ্বারা সহিংসতার শিকার হন, তাহলে অন্য লক্ষণগুলোর বিবেচনায় তারা যতই ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে বিবেচনা করা হোক না কেন, তারা প্রকৃতার্থে ক্ষমতায়িত নন। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধন করছে এবং এ বিষয়ে বেশকিছু পদক্ষেপও নিয়েছে। কিন্তু তার পরও আরও অনেক দূর অগ্রসর হওয়া বাকি আছে এবং উন্নতির সুযোগ রয়েছে। পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র এবং পাবলিক প্লেস সর্বত্রই নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্যদের এ বিষয়ে প্রেরণা দান, নিজস্ব কমিউনিটির সহায়তা, সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ, নারীর সক্ষমতা বাড়ানো, কম খরচে নারীর বিচার পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা অর্থনৈতিক বিষয়ে নারীর আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা।

বাল্যবিয়ে রোধকরণ

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাল্যবিয়ে নিরসনে ২০১৮ সালে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার (National Plan of Action—NPA) যাত্রা হয়। এনপিএ'র অভীষ্ট হলো ২০২১ সালের মধ্যে ১৮ বছরের নিচের কিশোরীদের বিয়ের হার এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে পুরোপুরি বিলুপ্ত করা। বাল্যবিয়ের বিলোপ সাধন ও প্রতিরোধে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপের ফলে ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের হার ধীরে ধীরে কমে আসছে। যৌতুক প্রথা, বাল্যবিয়ে, স্ত্রী নির্যাতন, অন্যায্য মজুরি ও ধর্ষণের মতো বিষয় এখনো সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরাজমান। বিশেষ করে দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এসব ঘটনার হার বেশি। নারীর কর্মপরিবেশের উন্নয়ন এবং নারীর জন্য সহায়ক ও নিরাপদ পাবলিক প্লেস নিশ্চিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে বিভিন্ন জনসমষ্টির (কমিউনিটি) মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, যৌন হয়রানি রোধে আইন প্রয়োগ, জনসম্মুখে নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার করা এবং দোষীদের প্রাপ্ত দণ্ডের বিষয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করা।

সুযোগের অসমতার জেন্ডারকেন্দ্রিকতা

দমনমূলক সামাজিক রীতি ও বৈষম্যের কারণে সমাজে সুযোগের অসমতা জিইয়ে থাকে। এ কারণেই উন্নয়নের লক্ষ্য হলো সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো এবং ন্যায্য ও বিবেচনাপূর্ণ সমতা নিশ্চিতে কাজ করা।

যাহোক, সামাজিকভাবে নির্ধারিত বিভিন্ন বিভাজনসমূহ, নারী-পুরুষের মধ্যে চিরাচরিত ক্ষমতাকাঠামো এবং সমাজের পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে নারীর অধিকারের বিষয়গুলো সমাজে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। ফলে নিজ সম্প্রদায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নারীর ভূমিকা ও আচরণে ওইসব সংস্কৃতির এক ধরনের ছাপ পড়ে। অধিকন্তু শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণে বৈষম্য, মজুরিবৈষম্য, সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে সীমিত অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বহীনতার মতো বিষয়াদি নারীর অর্থনৈতিক সুযোগগুলোকে মারাত্মকভাবে সংকুচিত করে তোলে। দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট।

আর্থিক ক্ষমতায়ন

২০১৬-১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশে ৬৫ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক পুরুষের (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) ব্যাংক বা ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত হিসাব (অ্যাকাউন্ট) আছে। আর নারীর ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ৩৬ শতাংশ। আর্থিক ক্ষমতায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি পরিবার ও খানা পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি একমাত্র সমাধান নয়। নারীরা যাতে অধিকতর উন্নত জীবন ও ভালো আয়ের জন্য নিজ সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে, সেই সুযোগ তৈরির জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ডিজিটাল সুযোগের ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা বা জেন্ডার ডিজিটাল ডিভাইড

ডিজিটাল সুযোগের ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা বা জেন্ডার ডিজিটাল ডিভাইড এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। নারীরা এখনো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, যা তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে প্রভাবিত করছে। ইন্টারনেট সংযোগ প্রাপ্তি, ডিজিটাল দক্ষতা ও অনলাইন সুবিধাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরম মাত্রায় জেন্ডার অসমতা বিদ্যমান। এসব বৈষম্য বিলোপে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা জেন্ডার ডিভাইড দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, পাশাপাশি নারীর অধিকার, শিক্ষা, সুযোগের প্রাপ্যতা, কনটেন্ট ও লক্ষ্যের (রিঅ্যাক্ট) বা Rights, Education, Access, Content and Targets (REACT) স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে।

৫.৫ সারকথা

জেন্ডার অসমতা হ্রাসকরণে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বৈশ্বিক জেন্ডার অসমতা সূচক অনুযায়ী, ২০১৯ সালে জেন্ডার অসমতা কমানোর ক্ষেত্রে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৫০তম। শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা ও টিকে থাকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে এ সূচক প্রণয়ন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। অধিকন্তু জেন্ডার অসমতা হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে টানা পাঁচ বছর বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে। এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশ অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের তুলনায় জেন্ডার অসমতা হ্রাসের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে।

সারণি ৫.২: দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের আপেক্ষিক চিত্র

	বাংলাদেশ	নেপাল	শ্রীলঙ্কা	ভারত	মালদ্বীপ	ভুটান	পাকিস্তান
বৈশ্বিক র‍্যাংকিং	৫০	১০১	১০২	১১২	১২৩	১৩১	১৫১
আঞ্চলিক র‍্যাংকিং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রাপ্ত স্কোর	০.৭২৬	০.৬৮	০.৬৮	০.৬৬৮	০.৬৪৬	০.৬৩৫	০.৫৬৪

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন, ২০২০

জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে এখনো বেশকিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে বাল্যবিয়ে, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন সহিংসতা, অবৈতনিক, পারিবারিক ও পরিচর্যা কাজের বোঝা, সুযোগের অসমতা প্রভৃতি। এসব বিষয় দারিদ্র্য ও অসমতা দূরীকরণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে জেন্ডার বিষয়ক ইস্যুকে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। উন্নততর জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় কতিপয় নির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ আবশ্যক, যা নিম্নরূপ:

- নারী অধিকারভিত্তিক এজেন্ডা, কর্মসূচি ও নীতি গ্রহণ করতে হবে, যার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি, সম্পদ সৃষ্টি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।
- সব ধরনের নীতি, কর্মসূচি, প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ড এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাংগঠনিক রূপান্তর নিশ্চিত করতে হবে।
- সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে জেন্ডার বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিশ্লেষণের বিষয়টি সংযুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাসমূহ দূর করতে হবে।
- দারিদ্র্য ও অসমতা দূরিকরণে যেসব দেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে, তাদের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বিশেষ করে যেসব কৌশল নারীর সর্বোত্তম সুবিধা নিশ্চিতে সহায়ক হয়েছে, সেগুলো গ্রহণ করতে হবে।
- দারিদ্র্য ও অসমতা দূরিকরণে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধির পাশাপাশি এসব ক্ষেত্রে জেন্ডারকেন্দ্রিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- জেন্ডার-বিযুক্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও উন্মুক্তকরণ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি জেন্ডারভিত্তিক বিভিন্ন উপাত্ত, যেমন বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অবৈতনিক পারিবারিক কাজের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব বিষয়ক উপাত্ত সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তা জেন্ডার বিষয়ে অধিকতর ভালো নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা করে।
- শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক উপাত্তের সঠিকতার উন্নয়ন ঘটাতে বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজে তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তির স্বীকৃতি বাড়াতে হবে। এ কাজে তথ্য সংগ্রহে গণপ্রচার কার্যক্রম (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে।

জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় সরকার অন্যান্য অংশীজন যেসব উদ্যোগ ও কৌশল বাস্তবায়ন করছে, সেগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে একটি পরিকাঠামো তৈরি করা আবশ্যক। পাশাপাশি গৃহীত কার্যক্রম নারী ও কন্যাদের অধিকারের বিষয়ে কতটা ফলদায়ক হচ্ছে, তাও ওই পরিকাঠামোর মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা উচিত। জেন্ডার সমতা এবং নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। কেবল জেন্ডার সমতা নয়; বরং কৃষি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পরিচর্যা সেবাসমূহ, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, ন্যায়বিচার এবং পানি ও স্যানিটেশনসহ সব ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। এসডিজি ৫ অর্জনে সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে, যাতে এ অভীষ্টের বাস্তবায়ন অন্য অভীষ্টগুলো অর্জনের ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে। এসডিজি বাস্তবায়নে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলে নারীর জেন্ডার সমতার বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা এবং নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। চূড়ান্ত বিচারে বিষয়টি এসডিজির সব অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হবে।

৬

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

৬.১ এসডিজি-৬ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

যদিও বেশিরভাগ দেশ নিরাপদ সরবরাহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে, তথাপি এখনো বিশ্বব্যাপী শতকোটির বেশি মানুষ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাত ধোয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে মানসম্মত স্যানিটেশন ব্যবহারে বছরে যে হারে অগ্রগতি হচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ যদি এক্ষেত্রে এসডিজি-নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে হয়, তাহলে অগ্রগতির মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হলে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে এর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। আর যদি তা না করা যায়, তাহলে তা পানির নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত কারণে আগামী দিনে ঘনঘন খরা দেখা দেওয়ার যে ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, তা মোকাবিলা করাও কঠিন হবে। বর্তমান বাস্তবতায় বেশিরভাগ দেশই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ২০৩০ সালের লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে আছে এবং ২০৩০ সালের মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য যে মাত্রায় বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে, সে বিষয়ে পিছিয়ে আছে।

২০০০ সালের পর থেকে সারা বিশ্বেই নিরাপদ পরিষেবা পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থিত পানযোগ্য পানি সরবরাহ সেবা প্রসারে অগ্রগতি হয়েছে। ওই সময় নিরাপদ উৎস থেকে খাবার পানির সুবিধা পেত ৬১ শতাংশ মানুষ। ২০১৫ সালে এটি ৭১ শতাংশে উন্নীত হয় এবং ২০১৭ সাল নাগাদ অগ্রগতির চিত্র এমনই ছিল। এর বাইরে বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরও ১৯ শতাংশ মানুষ ন্যূনতম খাবার পানির সুবিধা প্রাপ্তির আওতায় এসেছে। তারপরও এখনো প্রায় ৭৮ কোটি ৫০ লাখ মানুষ ন্যূনতম পান করার পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে। ২০০০ সালে নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহারকারী বৈশ্বিক জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ২৮ শতাংশ। ২০১৫ সালে তা ৪৩ এবং ২০১৭ সালে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়। নিরাপদ স্যনিটেশন ব্যবহারে সবচেয়ে ভালো অগ্রগতি হয়েছে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল, সাব-সাহারা আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয়। ২০০০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধার বাইরে থাকা মানুষের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৭ শতাংশে এসেছে। তারপরও ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী এখনো প্রায় ৭০ কোটি ১০ লাখ মানুষ (৭০১ মিলিয়ন) খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে। ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই সময় বিশ্বব্যাপী ন্যূনতম ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সুবিধা (সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া) পাওয়া মানুষের অনুপাত ছিল ৬০ শতাংশ। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় এ হার ছিল মাত্র ৩৮ শতাংশ। হিসাব অনুযায়ী, এখনো বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি (তিন বিলিয়ন) মানুষের বাড়িতে ন্যূনতম হাত ধোয়ার সুবিধা নেই।

২০১৬ সালের হিসাবমতে, ওই সময় বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম পান করার পানি, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার (হাইজিন) সুবিধা ছিল না। এ পরিস্থিতি কোটি কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের মাসিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশি অসুবিধার শিকার হয়। আর বিশ্বব্যাপী চার ভাগের এক ভাগ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ন্যূনতম পানি সরবরাহ সুবিধার বাইরে অবস্থান করছে, যার প্রভাব পড়ছে ২০০ কোটিরও (দুই বিলিয়ন) বেশি মানুষের ওপর।

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ মধ্যম অথবা উচ্চ স্তরের পানি সমস্যার মুখোমুখি হয়। যেসব দেশ উচ্চমাত্রার পানি সমস্যার সম্মুখীন, তার প্রায় সবগুলোর অবস্থান উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম বা মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে। উচ্চমাত্রার সমস্যা বলতে বোঝায়, বছরের কোনো না কোনো সময় এসব দেশ সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে মারাত্মক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তথ্য সংগ্রহ করা ১৭২টি দেশের মধ্যে ৮০ শতাংশের নিম্নমধ্যম মানের বা কিছুটা ভালো মানের সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সুবিধা আছে। যাহোক, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশগুলো যে মাত্রায় অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ৬০ শতাংশ দেশই এক্ষেত্রে ২০৩০ সালের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে না।

পানিসম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে বিশ্বের সব আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে জোরালো পদক্ষেপ প্রয়োজন। ২০১৭ ও ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ১৫৩টি দেশ যৌথভাবে আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা করে। এর ৬৭টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায়, ৫৯টি দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ আন্তঃসীমান্ত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করছে। আর মাত্র ১৭টি দেশ জানিয়েছে, সীমান্তে অববাহিকা ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ায়ও সবার জন্য পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত। আর এসব সুবিধা সহজলভ্য করতে প্রচেষ্টাও নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশগুলো ওই সেবা নিশ্চিত করার

বিষয়টিকে নিছক পরিষেবা সরবরাহ হিসেবে বিবেচনা করছে না, বরং এর সঙ্গে অনেক বিষয় যুক্ত থাকায় এটিকে পরিষেবার চেয়েও বেশি কিছু ভাবতে চায়। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলোরও সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এমন বিষয়ের মধ্যে রয়েছে পানির মান ঠিক রাখা ও বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা, পানি নিরাপত্তা ও দক্ষ ব্যবহার, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পানি-সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার। টেকসইভাবে নিরাপদ পানযোগ্য পানির প্রাপ্যতা ও ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়টি কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। তবে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে এখনো অসামঞ্জস্য বিরাজমান। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ ও জনমিতির ক্ষেত্রেও এমন অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত সহায়তার পরিমাণ স্থিতিশীলভাবে বাড়তে বাড়তে ২০১৬ সালে ৯০০ কোটি (৯ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু ২০১৭ সালে এ সহায়তার অর্থছাড়ের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় দুই শতাংশ কমে যায়। তবে ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে পানিসম্পদ খাতে উন্নয়ন সহায়তার প্রতিশ্রুতি বেড়েছিল ৩৬ শতাংশ। এতে বোঝা যায়, দাতারা পানি খাতে তাদের দৃষ্টি নতুন করে ফিরিয়েছেন।

৬.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৬ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

সূচক ৬.১.১: পানযোগ্য নিরাপদ পানির সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত

২০১৯ সালের এমআইসিএস উপাত্ত অনুসারে নিরাপদ পরিষেবার মাধ্যমে সুব্যবস্থিত উপায়ে পানযোগ্য পানি প্রাপ্তির সুবিধার আওতায় এসেছে দেশের ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ জনসমষ্টি। শহরাঞ্চলে এমন সেবা পাওয়া জনসমষ্টির অনুপাত ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ আর গ্রামাঞ্চলে ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৯ সালে কিছুটা উন্নত মাধ্যম থেকে পান করার পানি সংগ্রহকারী পরিবারের হার ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ডব্লিউএইচও ও ইউনিসেফের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচি বা 'Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (UNJMP)'-এর ২০১৭ সালের উপাত্ত অনুযায়ী, কেবল অপেক্ষকৃত ভালো উৎস থেকে পানি সংগ্রহকারী মানুষের অনুপাত ছিল ৮৭ শতাংশ।

সূচক ৬.২.১: (ক) নিরাপদ স্যানিটেশন ও (খ) সাবানপানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাত

২০১৯ সালের এমআইসিএস উপাত্ত অনুসারে, ওই বছর ৮৪ দশমিক ৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় এসেছে। এর মধ্যে শহরের ৯০ দশমিক ৬ এবং গ্রামের ৮২ দশমিক ৯ শতাংশ জনগোষ্ঠী রয়েছে। একই বছর ৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবার জানায়, তারা সাবানপানি দিয়ে হাত ধোয়ার চর্চা অব্যাহত রাখতে পারছে। শহরে এমন অভ্যাস চর্চাকারীর অনুপাত ৮৭ ও গ্রামাঞ্চলে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ। (এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস)

ডব্লিউএইচও ও ইউনিসেফের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচির (ইউএনজেএমপি) ২০১৫ সালের তথ্যমতে, দেশে মাত্র এক শতাংশ জনগণ উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে, ১০ শতাংশ অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহার করে, ২৮ শতাংশ শৌচাগার ভাগাভাগি করে এবং ৬১ শতাংশ মানসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করে। (ইউনিসেফ ও ডব্লিউএইচও, ২০১৫)

তবে হঠাৎ করে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী টেকনাফ এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার পর সেখানকার পানি ও স্যানিটেশনের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে টেকনাফে (ভৌগোলিকভাবে চ্যালেঞ্জিং) নিরাপদ পানযোগ্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এ বিষয়ে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সূচক ৬.৪.২: পানির ওপর চাপের মাত্রা: বিশুদ্ধ সুপেয় পানির সহজলভ্য উৎস থেকে পানি উত্তোলনের অনুপাত

চিরায়তভাবে বাংলাদেশ পানিসম্পদে ভরপুর। অ্যাকুয়াস্ট্যাট উপাত্ত অনুসারে, ২০১৭ সাল পর্যন্ত সহজলভ্য উৎস থেকে সুপেয় পানি উত্তোলনের হার ছিল ৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক গড় ১৩ শতাংশ। আর উত্তোলনের সহনীয় গ্রহণযোগ্য মাত্রা ২৫ শতাংশ পর্যন্ত (এফপিএমইউ, ২০১৯)। বাংলাদেশে ভূ-উপরিভাগের পানির ওপর চাপ ১০ শতাংশ আর ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ ৯০ শতাংশ।

জিইডির তথ্য অনুসারে (২০১৫), ২০১০ সাল নাগাদ দেশের মোট পানি সম্পদের মধ্যে ওই সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত পানির পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৯ শতাংশ। জাতীয় পানি পরিকল্পনা ফেজ-২-এর ভিত্তিতে দেশে বছরে অভ্যন্তরীণ নবায়নযোগ্য পানিসম্পদের পরিমাণ ১০৫ ঘনকিলোমিটার। এর মধ্যে ৮৪ ঘনকিলোমিটার ভূপৃষ্ঠ ও ২১ ঘনকিলোমিটার ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে প্রাপ্ত।

সূচক ৬.৫.২: পানিবিষয়ক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ আন্তঃসীমান্ত অববাহিকার অনুপাত

বাংলাদেশে ৩৮ শতাংশ আন্তঃসীমান্ত অববাহিকা পানিবিষয়ক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে (যৌথ নদী কমিশন–জেআরসি, ২০১৮)। বাংলাদেশে ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারতের সঙ্গে এবং তিনটি মিয়ানমারের সঙ্গে সংযুক্ত। এসব আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে একটি গঙ্গা (পদ্মা)। ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি হয়। ২০২৭ সাল পর্যন্ত ওই চুক্তি কার্যকর। চুক্তি অনুসারে, উভয় দেশের মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি অবমুক্ত করবে। এক্ষেত্রে গৃহীত পদ্ধতি হলো, ভারত প্রতিবছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে'র মধ্যে ১০ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেবে। ফারাক্কা পয়েন্টে পানি অবমুক্তকরণের বিষয়টি পরিবীক্ষণ করে এ বিষয়ে গঠিত যৌথ কমিটি। চুক্তি অনুযায়ী পানি অবমুক্তকরণ নিশ্চিত করা এবং চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের জটিলতা দেখা দিলে তা নিরসন ও ফারাক্কা বাঁধের কার্যক্রম তদারকি করা যৌথ কমিটির দায়িত্ব। এক্ষেত্রে কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে তা যদি কমিটি নিষ্পত্তি করতে না পারে, তাহলে বিষয়টি সরাসরি চলে যাবে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনে।

শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গায় স্বল্প পানি থাকায় প্রবাহ কমে যায়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানে দুই দেশের সরকারই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। একই সঙ্গে সমতা, ন্যায্যতা এবং উভয় পক্ষের কারও কোনো ক্ষতি হবে না, এমন শর্তে যৌথ নদীগুলোর পানি ভাগাভাগি-সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে উভয় দেশের সরকার সম্মত হয়েছে।

সূচক ৬.৬.১: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন

হালদা নদী দেশে পানি-সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জ্বলন্ত উদাহরণ। চট্টগ্রামের হালদা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীকেন্দ্রিক বাস্তুতন্ত্র। আর ভারতীয় অঞ্চলের প্রধান প্রধান কার্পজাতীয় মাছগুলোর একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র সুপেয় পানির এই স্রোতস্বিনীটি। কিন্তু নদীর বাস্তুতন্ত্রের অবনতির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মাছের ডিম ও রেণু সংগ্রহের হার কমে গেছে। ডিম সংগ্রহ কমে যাওয়ার পেছনে মানবসৃষ্ট কিছু কারণও দায়ী। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে সেচকার্যের জন্য নদী থেকে অতিমাত্রায় পানি উত্তোলন, অবৈধ মৎস্য শিকার, নদীর তলদেশ থেকে বালি উত্তোলন এবং নদীতে শিল্পবর্জ্যের নির্গমন। এসব বিষয় নদীর বাস্তুতন্ত্রের অবনতির জন্য দায়ী।

এমন পরিস্থিতিতে হালদার বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে কয়েক বছর আগে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পুনরুদ্ধার কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওই কমিটি নদী রক্ষায় বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে নদী থেকে বালি ও পানি উত্তোলন এবং যন্ত্রচালিত নৌযান চলাচল বন্ধ করা, পানির স্তর ঠিক রাখতে রাবার ড্যামের উচ্চতা কমানো, মা মাছ রক্ষায় মৎস্য শিকার নিষিদ্ধকরণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে হালদা রক্ষার গুরুত্বের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। এসব পদক্ষেপের ইতিবাচক ফলও পাওয়া গেছে। ২০১৮ সালের হালদা থেকে রেকর্ড পরিমাণ রেণু সংগৃহীত হয়।

সূচক ৬.ক.১: সরকারের সমন্বিত ব্যয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পানি ও স্যানিটেশন খাতে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পানি ও স্যানিটেশন খাতে বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে মোট সহায়তা এসেছিল ৩০ কোটি ১১ লাখ (৩০১.১ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯ কোটি ৬৮ লাখ (৪৯৬.৮ মিলিয়ন) মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। আর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থেকে পানি ও স্যানিটেশন খাতে সহায়তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২ কোটি ৬৬ লাখ ৪০ হাজার (৫২৬.৬৪ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। (সূত্র: ইআরডি, ২০১৮-১৯)

৬.৩ এসডিজি-৬ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

মানুষের জন্য নিরাপদ পানযোগ্য পানির প্রাপ্যতা ও উপযুক্ত স্যানিটেশনের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সাফল্য চমকপ্রদ এবং বাংলাদেশ শতভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য এসব সুবিধা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসডিজি-৬ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন অনুমোদন করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে পানিসম্পদ-

বিষয়ক জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় নর্দমা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ও পানি আইন। শিল্প ও কৃষি খাতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ায় দেশে পানির চাহিদা অব্যাহতভাবে বাড়ছে, কিন্তু তার পরও প্রকৃতির নানা বিবর্তনের কারণে বিপুল পরিমাণ পানি অপচয় হচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস।

পানি ও পরিবেশগত সার্বিক বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার একটি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতিতে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার বাড়ানো ও ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী ১০০ বছরের জন্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণে সরকার 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' (বিডিপি ২১০০) প্রণয়ন করেছে। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে অভিযোজনশীল কৌশল বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বৃহত্তর পানিসম্পদ খাতে সুশাসন শক্তিশালী করার নির্দেশনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।বিশেষ করে এ খাতের জন্য আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) একটি অগ্রাধিকারে হিসেবে পরিণত হচ্ছে। এফএসএমের জন্য বাংলাদেশ একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। তাছাড়া এসডিজি-৬ অর্জনের বিষয়ে আরও কিছু উদ্যোগ চলমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নয়নে মানসম্মত 'ওয়াশ' কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রয়োজনীয় স্যানিটেশন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের কাজও এগিয়ে চলেছে। এ বিষয়টিও প্রক্রিয়াগতভাবে এসডিজি-৬-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

৬.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

এসডিজির অন্যসব অভীষ্ট অর্জন করতে হলে এসডিজি-৬ অর্জনের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন অভীষ্টের লক্ষ্যগুলোও এ অভীষ্টের লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন পানি উত্তোলনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পানিদূষণ কমানোর সম্ভাবনার বিষয়টি পরস্পর নির্ভরশীল। সর্বজনীন পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টি এসডিজি-৬-এর আওতাভুক্ত। একই সঙ্গে এটি জেন্ডার সমতা অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেসব গৃহে পানির সহজলভ্য উৎস নেই, সেসব ক্ষেত্রে বাড়ির নারী ও কন্যাশিশুরাই পানি সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করে। এভাবে পানি সংগ্রহকারী প্রতি ১০ জনের মধ্যে আটজনই নারী। পানির উৎস মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানো গেলে তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় কমানো সম্ভব হবে। ফলে পানি সংগ্রহে নিয়োজিত কন্যারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে। কৃষি উৎপাদন সচল রাখতে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে যে পানি উত্তোলন করা হয়, তার প্রায় ৭০ শতাংশই ব্যবহৃত হয় কৃষি খাতে। পানি, স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা অস্বাস্থ্যকর হলে তা মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ ও ডায়রিয়ার ঝুঁকি তৈরি করে, যা পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী। পাশাপাশি এটি অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমকেও বাধাগ্রস্ত করে। ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডার সার্বিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এ অভীষ্টের গুরুত্ব কতটা, তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এসডিজি-৬ বাংলাদেশের সামনে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এবং সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গতানুগতিক যেসব পদক্ষেপ চলমান, তা যথেষ্ট হবে না। সবার জন্য টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে উৎসমুখেই দূষণ রোধ করতে হবে। আর সেটা করতে হলে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে নীতিনির্ধারক ও সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। এসডিজি-৬ অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাউকে পেছনে না ফেলে টেকসই ও ঘাতসহনশীল প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।

সুপেয় পানির বাস্তুতন্ত্র ও এর ব্যবস্থাপনার ওপর জলবায়ু পরিবর্তন বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তাতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে প্রাকৃতিক পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা। যেমন ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উৎসে পানির স্বল্পতা দেখা দেবে ও মান বিনষ্ট হবে। পাশাপাশি ঘনঘন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা ও খরা) দেখা দিতে পারে। পানি-সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্যোগ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রধান উৎস এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিরও অন্যতম কারণ।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে (ওডিএ, ঋণ, অনুদান প্রভৃতি) অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। অভ্যন্তরীণ ও সরকারি অর্থায়নের দক্ষতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের বিষয়টি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী অর্থায়ন কৌশল; যেমন মিশ্র অর্থায়ন ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম উৎসাহিত করতে সরকারের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান সেবাসমূহের কর্মসম্পাদন নৈপুণ্য বাড়ানোর জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট সরকারি অর্থায়ন ও সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপশি ব্যয়িত অর্থের রিটার্ন নিশ্চিত করা ও আর্থিক নিরাপত্তা এবং এ

খাতকে ব্যক্তি খাতের কাছে আরও আকর্ষণীয় করতে তুলতে নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতির সংস্কার আবশ্যক। এ ধরনের উদ্যোগ সেবা সরবরাহে চক্রাকার উন্নয়ন ঘটাতে পারে, যা অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হওয়া পর্যন্ত এ খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৬.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

তথ্যপ্রযুক্তি-সমর্থিত স্মার্ট প্রযুক্তি পানিসম্পদ ও 'ওয়াশ' ব্যবস্থাপনার সব বিষয়ে কার্যকর উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ধরিত্রী পর্যবেক্ষণ, নাগরিক বিজ্ঞান ও ব্যক্তি খাতের উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এসব বিষয় এখনো উপাত্ত পরিবীক্ষণ পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত হয়নি। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে প্রযুক্তির অভিযোজন ও স্থানীয় জ্ঞান সহযোগিতাপূর্ণ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগির করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে সহায়ক হতে পারে।

পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খরা ও বন্যার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং পানির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় পানিসম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণে জোর দেওয়া যেতে পারে। যথা: (১) দেশের সব নদীতে বর্জ্য নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারের পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহে পানিসম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরে তা রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে; (২) আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর পানি ব্যবহারে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে সমুদ্রকেন্দ্রিক মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়, পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানিসম্পদের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল ও নিষ্ঠাসম্পন্ন পানি কূটনীতি কাজে লাগাতে হবে; (৩) দক্ষ সেচ ব্যবস্থা চালু করার জন্য কৃষকদের সক্ষমতা বাড়াতে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সবার জন্য নিরাপদ পানযোগ্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংলাপের উদ্যোগ নিতে হবে ও প্রয়োজনবোধে এক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) পানির মূল্যমান নির্ধারণে অধিকতর নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে বিষয়টি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পানিবিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতে পারে এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পানির বহুমাত্রিক মান নির্ণয় করে তা সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে; (৫) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবছর কী পরিমাণ পানি উত্তোলন করলে পানির স্তরে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং ভূগর্ভে পানির মজুত ঠিক থাকে, তার একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করে তা সবাইকে মানতে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত অববাহিকা ব্যবস্থাপনায় পরামর্শক সভার আয়োজন করতে হবে; এবং (৬) আন্তঃখাতভিত্তিক পরামর্শের মাধ্যমে গৃহীত পদ্ধতি ব্যবহার করে পানি বণ্টন ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এসডিজির ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত কাঠামো গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি বণ্টন ব্যবস্থায় গৃহীত আদর্শ পদ্ধতিসমূহ উপযুক্ত মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে, যাতে করে বিষয়টি পানির অধিকতর দক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার মানোন্নয়ন ও সেই মোতাবেক কর্মকৌশল গ্রহণে সহায়ক হয়।

৬.৬ সারকথা

ওএসডিজি-৬-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয় সবার জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, উপযুক্ত স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নিরোধে বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি মাইলফলক অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রায় ৪৮ শতাংশ জনসমষ্টি নিরাপদ পরিষেবার মাধ্যমে সুব্যবস্থিত উপায়ে পানযোগ্য পানি প্রাপ্তির আওতায় এসেছে। শহরাঞ্চলে এমন সেবা পাওয়া জনসমষ্টির অনুপাত ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ আর গ্রামাঞ্চলে ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ। এছাড়া ৮৪ দশমিক ৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী ভালো মানের স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় এসেছে। এর মধ্যে শহরের ৯০ দশমিক ৬ এবং গ্রামের ৮২ দশমিক ৯ শতাংশ জনগোষ্ঠী রয়েছে। একই সঙ্গে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ সাবানপানি দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস চর্চা করছে। শহরে এমন অভ্যাস চর্চাকারীর অনুপাত ৮৭ এবং গ্রামাঞ্চলে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ।

এতৎসত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক। এসডিজি-৬ অর্জন ও দেশের পানিসম্পদের নিরাপত্তা বিধানে লক্ষ্যনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানিপ্রবাহ এবং হ্রদ ও জলাধার রক্ষায় সীমান্ত নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত দেশগুলোর সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসডিজি-৬ পানি বিষয়ে সমতা, গুণগত মান ও স্থায়িত্বের বিষয়গুলো সামনে এনেছে। দীর্ঘ মেয়াদে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হলে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সমন্বিত ও বহু খাতভিত্তিক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এসডিজির 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না'– মূলমন্ত্র বাস্তবায়ন করতে হলে গতানুগতিক ধারার বাইরে নানা উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসূচিগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে তা সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো যায় এবং দুর্গম এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এসব বিষয় নিশ্চিত করতে হলে খাতভিত্তিক নির্দিষ্ট ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং প্রোগ্রাম্যাটিক সমাধানের মতো বিষয় প্রয়োজন হবে। দেশে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস সীমিত। সেই সীমিত উৎসের ওপর বাংলাদেশ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এমন পরিস্থিতিতে ভূগর্ভের পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা ও পানির অন্যান্য উৎসসমূহ সংরক্ষণের বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বাংলাদেশ। 'ওয়াশ' কর্মসূচির উপাদানগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠিতে বাংলাদেশ সম্ভবত সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে এবং নিম্নমানের পরিচ্ছন্নতা চর্চার যথেষ্ট প্রমাণ মিলে। এক্ষেত্রে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তন করে কার্যকর পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা জোরদার করা বেশ বড় চ্যালেঞ্জ।

৭ সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি

সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

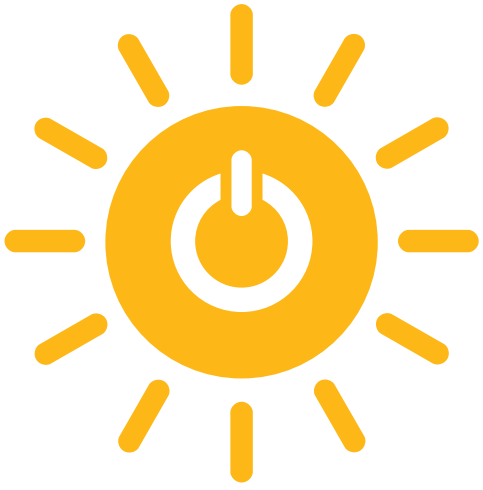

৭.১. এসডিজি-৭ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

মানুষের বিদ্যুৎ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপীই দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। এর পাশাপাশি জ্বালানি দক্ষতায় উত্তরোত্তর অগ্রগতি অব্যাহত আছে এবং বিদ্যুৎ খাতে নবায়নযোগ্য শক্তির অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে প্রাপ্তিতে বেশ অগ্রগতি হলেও এখনো বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮৪ কোটি (৮৪০ মিলিয়ন) মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে অবস্থান করছে। এছাড়া রান্নার কাজে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর রান্নার চুলা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। অধিকন্তু এসডিজি-৭ ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত অভীষ্ট অর্জন করতে হলে নবায়নযোগ্য শক্তি, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও তাপ প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার উন্নয়নে উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ দরকার হবে।

২০১০ সালে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসা বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর অনুপাত ছিল ৮৩ শতাংশ, যা ২০১৫ সালে ৮৭ এবং ২০১৭ সালে ৮৯ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১৭ সালে রান্নার কাজে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক চুলা ব্যবহারের অনুপাত ছিল ৬১ শতাংশ। এ হার ২০১০ সালের তুলনায় বেশি, ওই সময় পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারের হার ছিল ৫৭ শতাংশ। এমন অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো প্রায় ৩০০ কোটি (তিন বিলিয়ন) মানুষ প্রাথমিক জ্বালানিনির্ভর অদক্ষ ও বায়ুদূষণকারী রান্না পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল।

২০১০ সালে বিশ্বের মোট প্রকৃত জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য উৎসের অংশ ছিল ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০১৬ সালে যা ১৭ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা রোধকল্পে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার যে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই পর্যায়ে যেতে হলে আরও অনেক দ্রুততার সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের অনুপাত বাড়াতে হবে। ২০১০ সালের পর থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে প্রায় ১৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও এক্ষেত্রে ২০১২ সালের প্রবৃদ্ধি অন্য বছরগুলোকে ছাপিয়ে যায়।

গত কয়েক বছরে নাগরিকদের জ্বালানি প্রাপ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া বিপুল অগ্রগতি অর্জন করেছে। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এতদঞ্চলে বিদ্যুৎবিহীন মানুষের সংখ্যা ২০ কোটির (২০০ মিলিয়ন) নিচে নেমে এসেছে। গত দুই বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে ভারতে বিদ্যুতের গ্রিড সম্প্রসারণ ও নতুন সংযোগ প্রদান কার্যক্রম। ২০১৭ সালে ভারতে বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠীর হার ৯৩ শতাংশে উন্নীত হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানে এ হার ৭০ শতাংশ। সম্মিলিতভাবে এ দুই দেশে বিদ্যুৎসুবিধা-বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা ১৫ কোটি (১৫০ মিলিয়ন)। এসব মানুষের জন্য জাতীয় গ্রিডের বাইরে সোলার প্যানেল ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটা সত্য যে, গ্রিড সম্প্রসারণের আওতা বৃদ্ধি মানেই কিন্তু সংযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত বিদ্যুৎপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা নয়। এমনকি গ্রিড সুবিধার আওতায় থাকা বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও গ্রিডবহির্ভূত সৌরবিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। গ্রিডবহির্ভূত এ বিদ্যুতের ভূমিকাও নেহায়েত কম নয়।

২০১০ থেকে ২০১৬ সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক প্রাথমিক জ্বালানি ঘনত্বে (জিডিপির হিসাবে প্রতি ইউনিট ব্যবহৃত বিদ্যুতের অনুপাত) বেশ অগ্রগতি হয়েছে। এ সময়ের ব্যবধানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি ব্যবহারে বেশ দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। ফলে জ্বালানি ঘনত্ব ৫ দশমিক ৯ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫ দশমিক ১ হারে নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ২ দশমিক ৩ শতাংশ। কিন্তু এ অগ্রগতি এখনো কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ কম। এসডিজি-৭-এর লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ জ্বালানি ঘনত্ব ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে। এদিকে ২০১৬ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তার পরিমাণ এক হাজার ৮৬০ কোটি (১৮.৬ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ২০১০ সালের তুলনায় এটি প্রায় দ্বিগুণ। ২০১০ সালে এ সহায়তার পরিমাণ ছিল ৯৯০ কোটি (৯ দশমিক ৯ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। সব উন্নয়নশীল দেশে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সরবরাহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তির হালনাগাদকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি একদিকে যেমন প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়ক, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।

৭.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৭ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

২০২৫ সালের মধ্যে সব পরিবারের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। সে লক্ষ্যে দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠীর অনুপাত ৯০ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়, ২০০০ সালে যা ছিল মাত্র ১৮ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে

দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১৮ হাজার ৯৬১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে, ২০০০-০১ অর্থবছর শেষে যা ছিল মাত্র চার হাজার পাঁচ মেগাওয়াট। কয়েক বছর আগেও উচ্চমাত্রার সিস্টেম লস, বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিম্ন উৎপাদন দক্ষতা, অনিশ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎকেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে তহবিল সংকট এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ছিল বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের বড় সমস্যা। কিন্তু বর্তমানের চিত্র পুরোপুরি ভিন্ন।

কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতসহ সব ধরনের উৎপাদন খাত এবং পারিবারিক পর্যায়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। চাহিদা ও যোগানের মধ্যকার ব্যবধান নিরসন করে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। সে মোতাবেক গৃহীত পরিকল্পনার আওতায় ৫০টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মোট ১৫ হাজার ১৫১ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর নির্মাণকাজ বর্তমানে চলমান। বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মধ্যে বিদ্যমান সক্ষমতার অতিরিক্ত ১৭ হাজার ৩০৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণও বাড়ছে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে ব্যক্তি উদ্যোগের কেন্দ্রগুলোয় বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। ২০১০ সালে ব্যক্তি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল মাত্র দুই হাজার ৯৬ মেগাওয়াট। ২০১৮ সালে তা সাত হাজার ১০৮ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ব্যক্তি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১০ সালে মোট সক্ষমতার ৩৬ শতাংশ ছিল ব্যক্তি খাতে; ২০১৮ সালে তা ৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১০-২০২১ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার একটি বড় সাফল্য হলো বিদ্যুতে ব্যক্তি খাতের অর্থায়ন উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়াতে পারা।

যদিও জ্বালানি খাতের অনেক উপাদান রয়েছে, তথাপি দেশের নীতিনির্ধারকরা বিদ্যুতের ওপরই বেশি গুরুত্বারোপ করেন এবং বিদ্যুতই হচ্ছে জ্বালানি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় খাত। দেশে জ্বালানির উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহ (ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল, ফার্নেস অয়েল, জেট ফুয়েল ইত্যাদি), প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, বায়োমাস, সৌরসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎস ইত্যাদি। জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য খাতের অগ্রগতি হচ্ছে খুব ধীরে। বিপরীতে অনবায়নযোগ্য খাতের সম্প্রসারণ হচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে। জ্বালানি খাতের এমন চিত্র বছরের পর বছর ধরে দেশের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্ম দিচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের ওপর বেশ জোর দিয়েছে।বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) ৫১ হাজার ৩৬৪টি পরিবারে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বা Solar Home Systems (SHSs) চালু করেছে। এছাড়া ৩৭টি রুফটপ (ছাদের ওপর) সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেছে, ৪০টি সেচপাম্প পরিচালিত হচ্ছে সৌরবিদ্যুতে, ১৪টি সৌর চার্জিং স্টেশন ও ৪০টি নেট মিটারিং পদ্ধতি স্থাপন করেছে বিআরইবি। এ পর্যন্ত স্থাপিত সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা ১৩ দশমিক ৩১ মেগাওয়াট পিক (মেগাওয়াট পিক হচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ পরিমাপের একক)।

২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মহাপরিকল্পনায় (Power System Master Plan—PSMP)নির্ধারিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের অভীষ্ট অর্জনের অংশ হিসেবে বর্তমানে ৫৩টি উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণকাজ চলমান। এগুলো সম্পন্ন হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াবে ১৪ হাজার ২০২ মেগাওয়াট। নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বেশিরভাগই ২০২৩ সালের মধ্যে উৎপাদন শুরু করবে। পিএসএমপি ২০১৬ অনুসারে, ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ অন্যান্য উৎস থেকে জ্বালানি আহরণ বাড়াতে উৎস বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে নবায়নযোগ্য উৎস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সৌরশক্তি, বায়ুবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুতের মতো বিষয়গুলোতে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের মোট জ্বালানির মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০ শতাংশ সংগ্রহের লক্ষ্য রয়েছে। সে লক্ষ্য অর্জনের উদ্যোগ এ খাতে গুরুত্ব পাচ্ছে।

তবে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকটা মিশ্র। ভারত থেকে বিদ্যুৎ আনার বিষয়ে ইতোমধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যা দেশটি থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে বেশ ফলদায়ক। ২০১০ সালে দেশটি থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ছিল শূন্য। অথচ ২০১৮ সালের মধ্যেই দেশটি থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি দক্ষতার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ (টিঅ্যান্ডডি) পর্যায়ে সিস্টেম লসও হ্রাস পেয়ে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০১০ সালে সিস্টেম লসের পরিমাণ ছিল ১৬ শতাংশ; ২০১৮ সালে তা ১২ শতাংশে নেমে এসেছে।

সূচক ৭.১.১: বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠীর অনুপাত

ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে দেশের বিদ্যুৎ খাত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। পাশাপাশি বছরের পর বছর ধরে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধিতেও চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৯ সালে দেশে বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠী ৯২ দশমিক ২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অথচ ২০০০ সালে এ হার ছিল মাত্র ৩১ দশমিক ২ শতাংশ। সরকারের সমন্বিত জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলের হাত ধরে এ বিরাট সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ খাতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে সরকারের কৌশল হলো দক্ষতার সঙ্গে সরবরাহ বাড়ানো ও চাহিদা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, যাতে জ্বালানির বাজারে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় থাকে।

উল্লিখিত কৌশল বাস্তবায়নে সরকার যা করতে পারে তা হলো, গ্যাস-বিদ্যুতের বিদ্যমান সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমাত্রিক জ্বালানির অনুসন্ধান বাড়াতে উদ্যোগ। কৌশল বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিকল্প উৎস থেকেও সম্পদ আহরণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সমুদ্রের বিভিন্ন ব্লকে বৃহৎভাবে খনন চালিয়ে কয়লা, গ্যাস ও তেলসম্পদ অনুসন্ধানের ওপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি চাহিদা ব্যবস্থাপনায় এমন পর্যায়ের দক্ষতা আনয়ন করতে হবে, যাতে সরবরাহ অংশের সঙ্গে ভারসাম্য নিশ্চিত হয় এবং বিদ্যুতের অদক্ষ ব্যবহার নিরুৎসাহিত হয়। সক্ষমতা বাড়াতে বিদ্যুৎ খাতে ব্যক্তি খাতের পাশাপাশি সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) সুযোগও উন্মুক্ত করা হয়। এসব উৎসের বিনিয়োগ কাজে লাগাতে ব্যক্তি খাতকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ, ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরপিপি) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া এবং স্বতন্ত্র বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট) স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে প্রিপেইড মিটার স্থাপন, ট্যারিফ সমন্বয়, ভর্তুকির মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদান এবং সিস্টেম লস কমানো। এসডিজি-৭ অর্জনের জন্য সরকার ২০৩০ সাল মেয়াদি একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এ খাতের বিভিন্ন নীতি যাতে একটি আরেকটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়–নীতি ও কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সে বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে। দেশের সব নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী, আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সেবা নিশ্চিত করার যে দর্শন সরকার গ্রহণ করেছে, তা অর্জনে টেকসই জ্বালানি খাত নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় নীতি-কাঠামোতে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সারণি ৭.১: বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
জাতীয়	৪৪.২৩	৫৫.২৬	৭৫.৯২	৮৫.৩	৯০.১	৯২.২৩
শহর	৮২.৬১	৯০.১০	৯৪.০১	...	...	৯৭.৮
গ্রাম	৩১.১৯	৪২.৪৯	৬৮.৮৫	...	...	৯০.৭

সূত্র: বিবিএস, এসভিআরএস, এসআইডি, হায়েস, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিপিডিবি

*** MICS ২০১৯, বিবিএস**

সূচক ৭.১.২: পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত

রান্নার কাজে যেসব পরিবার প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করে, তারা মূলত বৈদ্যুতিক চুলা, সৌর চুলা, এলপিজি (তরলিকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস)/গ্যাসচুল্লি, বায়োগ্যাস চুল্লি অথবা ইথানল/অ্যালকোহল-নির্ভর তরল জ্বালানিভিত্তিক চুলা ব্যবহার করে। তবে শহর ও গ্রামের পরিবারে রান্নার জ্বালানির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শহরসংলগ্ন গ্রামীণ এলাকা ও নগর অঞ্চলে জ্বালানিসাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক চুলা এবং এলএনজির ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ২০১৯ সালে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার ১৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ সালে এটি ছিল মাত্র ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ। তবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রগতির এমন শ্লথ ধারা অব্যাহত থাকলে এক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে। তাই অগ্রগতি দ্রুততর করা আবশ্যক।

সারণি ৭.২: রান্নায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
৯.৭৪	১২.৯	১৬.৬৮	১৭.৭২	...	...	১৯.০

সূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক-২০১৯, গওঈঝ ২০১৯, বিবিএস

সূচক ৭.২.১: চূড়ান্ত জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য উৎসের অংশ

সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সহজপ্রাপ্য নবায়নযোগ্য খাত জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ-জ্বালানি সুবিধার আওতার বাইরে থাকা গ্রামীণ জনগণের জন্য সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎস হতে পারে। পাশাপাশি এ ধরনের উৎস জাতীয় গ্রিডেও অবদান রাখতে পারে। এমন নবায়নযোগ্য উৎসের মধ্যে রয়েছে সৌরশক্তি, বায়োম্যাস গ্যাস, বর্জ্য থেকে উৎপাদিত বায়োগ্যাস, জলবিদ্যুৎ ও বায়ুবিদ্যুৎ। জাতীয় গ্রিড সংযোগের বাইরে থাকা গ্রামীণ এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় সৌরভিত্তিক ফটোভোল্টায়িক (পিভি) প্রযুক্তি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস এখনো প্রধান ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এর পরের অবস্থানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভারী জ্বালানি তেল (এইচএফও) ও উচ্চগতির ডিজেল (এইচএসডি)। নবায়নযোগ্য উৎস এখনো জ্বালানি খাতে খুবই অগুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশে ব্যবহৃত মোট চূড়ান্ত জ্বালানির মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎসের অংশ মাত্র ৩ দশমিক ২৫ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আহরণের লক্ষ্য রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশে ৬২৬ দশমিক ৫৫ মেগাওয়াট সক্ষমতার নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন অবকাঠামো স্থাপিত হয়েছে।

সারণি ৭.৩: মোট ব্যবহৃত চূড়ান্ত জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য উৎসের অংশ (শতাংশ)

২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
২.৭৯	২.৮৫	২.৮৭	৩.১৫	৩.২৫

সূত্র: এসআরইডিএ

সারণি ৭.৪: নবায়নযোগ্য অবকাঠামোর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা

ঞবপযহড়ষড়মু	ঙভভ-মৎরফ (গড)	ঙহ-মৎরফ (গড)	ঞড়ঃধষ (গড)
সৌর	৩১১.৮৪	৮০.৭৮	৩৯২.৬২
বায়ু	২	০.৯	২.৯
জলবিদ্যুৎ	০	২৩০	২৩০
বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ	০.৬৩	০	০.৬৩
বায়োম্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ	০.৪	০	০.৪
মোট	**৩১৪.৮৭**	**৩১১.৬৮**	**৬২৬.৫৫**

সূত্র: এসআরইডিএ

সূচক ৭.৩.১: প্রাথমিক জ্বালানি ও জিডিপি অনুপাতে জ্বালানির ঘনত্ব

এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ জ্বালানি ব্যয় হয়, তার নির্দেশকই জ্বালানি ঘনত্ব হিসেবে বিবেচিত। এ সূচক যদি নিম্নমুখিতা নির্দেশ করে, তাহলে বুঝতে হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কম জ্বালানি খরচ হচ্ছে। প্রতি ইউনিট জ্বালানি মেগাজুল (এমজে) হিসেবে পরিচিত। প্রতি মেগাজুলের জ্বালানি দক্ষতাকে ক্রয়ক্ষমতার সক্ষমতা সূচক বা পিপিপি ডলারের স্থিরমূল্যের ভিত্তিতে জিডিপির সঙ্গে তুলনা করা হয়। মেগাজুলের সক্ষমতা বেশকিছু বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু, অর্থনীতির কাঠামো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গতিপ্রকৃতি। কাজেই জ্বালানি দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। যাহোক, ২০১৫ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক জ্বালানির নিবিড়তার স্তরে হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৬ সালে পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় জ্বালানি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটেছে।

সারণি ৭.৫: প্রাথমিক জ্বালানির তীব্রতার স্তর (প্রতি বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকায় তেল সমতুল্য কিলোটন)

২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
৩.৬৩	৩.৬৭	৩.৫৬	৩.৪১	২.১৫

সূত্র: এসআরইডিএ

*** জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিট (এইচসিইউ ২০১৯, ইএমআরডি)**

৭.৩ সরকারের প্রচেষ্টা

২০১৬ সালে প্রণীত বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার লক্ষ্য অর্জনের তাগিদে সরকার এরই মধ্যে ৫৩টি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। এগুলো সম্পন্ন হলে নতুন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়বে ১৪ হাজার ২০২ মেগাওয়াট। এ নতুন কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশই উৎপাদন শুরু করবে ২০২৩ সালের মধ্যে। পিএসএমপি ২০১৬ অনুসারে ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সালে এ সক্ষমতা ৪০ হাজার এবং ২০৪১ সালে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানি ১৫ হাজার ৮৭০টি প্রিপেইড মিটার স্থাপন করেছে। এছাড়া দুই কোটি (২০ মিলিয়ন) স্মার্ট প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলমান। প্রিপেইড মিটার চালু করার ফলে বিদ্যুতের সিস্টেম লস উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বিদ্যুৎ বিভাগ সব ধরনের বড় ও মাঝারি গ্রাহককে প্রিপেইড মিটার ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ ২০৩০ সাল মেয়াদি এসডিজি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানির সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যথা:

(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০২০ সাল নাগাদ (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর, ২০১৬-২০২০) ২৩ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা এবং এই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে সক্ষমতা ২৪ হাজার এবং ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা।

(২) বর্তমানে দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তার মাত্র তিন শতাংশ (অর্থবছর ২০১৪-১৫) আসে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম থেকে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে এটি ২১ শতাংশ এবং ২০২৯-৩০ অর্থবছর নাগাদ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

(৩) বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ ও হালনাগাদকরণ; উপকেন্দ্র নির্মাণ ও মানোন্নয়ন; সুইচ স্টেশন ও নদী পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ; যেসব ট্রান্সফরমারের অধীনে সক্ষমতার বেশি সংযোগ রয়েছে, সেসব ট্রান্সফরমার স্থানান্তর; গতানুগতিক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ও ডিজিটাল মিটারগুলো প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে স্থানান্তর; বিতরণ পদ্ধতির পুনর্গঠন ও নিবিড়তা বাড়ানো; গ্যাস বরাদ্দকরণ নীতি (বিকল্প মাধ্যম হিসেবে এলপিজি ও বায়োগ্যাস), দেশীয় গ্যাস উত্তোলন নীতি, দেশীয় কয়লা রপ্তানি নীতি প্রতিষ্ঠাকরণ; জ্বালানি ভর্তুকি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; গৃহস্থালি ও পরিবহন খাতে এলপিজি ব্যবহার উৎসাহিতকরণ; এলএনজি আমদানি কৌশল ও কয়লা আমদানি কার্যক্রম সম্প্রসারণে পরিকল্পনা গ্রহণ; এবং

(৪) ৭০ লাখ নতুন গ্রাহককে সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে ৩০ হাজার গ্রামের শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা।

২০৩০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি যৌগতে নবায়নযোগ্য উৎসের অংশ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া হয়েছে:

(১) সৌরশক্তির মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি (৩৪০ মেগাওয়াট বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং ১৬০ মেগাওয়াট সামাজিক খাতে ব্যবহারের জন্য)

(২) বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ: (ক) সোলার পার্ক (জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত); (খ) সৌর সেচ কার্যক্রম; (গ) ক্ষুদ্র আকারের সৌরভিত্তিক গ্রিড; ও (ঘ) ছাদের ওপর সৌরভিত্তিক কার্যক্রম; এবং

(৩) সামাজিক প্রকল্পসমূহ: (ক) স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র; (খ) দুর্গম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; (গ) ইউনিয়ন ই-সেন্টার এবং দুর্গম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সৌরভিত্তিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

২০৩০ নাগাদ আন্তর্জাতিক মানের জ্বালানি দক্ষতার মাত্রা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে:

(১) জ্বালানি দক্ষতা আনয়ন ও সংরক্ষণ কর্মসূচি; এবং

(২) উন্নতমানের চুলা সরবরাহের জন্য আর্থিক প্রণোদনা

৭.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে ভঙ্গুর অবস্থার শিকার দেশগুলোর অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ জলবায়ু কার্যক্রমে নেতৃত্বদানের ব্যাপারে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, বিশেষ করে সব নাগরিকের জন্য সৌরশক্তির নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সব নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের অঙ্গীকার করেছে সরকার। জ্বালানির সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন ও এসডিজি-৭ অর্জনে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে একটি টেকসই উন্নয়ন কাঠামো বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। তার পরও এ খাতে এখনো বড় ধরনের অর্থায়ন ঘাটতি বিদ্যমান। এসডিজি-৭ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশকিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন:

- বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে এ খাত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সংযোগের আওতা বাড়ানো এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাত্রা বছরের পর বছর ধরে চমকপ্রদভাবে বেড়েছে। বিদ্যুৎবিভ্রাটের দৈনিক নিবিড়তা ব্যাপকহারে কমেছে। ২০০৯ সালে দৈনিক বিদ্যুৎবিভ্রাটের পরিমাণ ছিল এক হাজার ১০৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা (এমকেডব্লিউএইচ)। ২০১৮ সালে তা মাত্র ৩২ এমকেডব্লিউএইচে নেমে এসেছে। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগের আচ্ছাদন ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার গড় হারের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ায় মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া মানুষের অনুপাত ছিল ৮৫ দশমিক ৬ শতাংশ। ওই সময় বাংলাদেশে এ হার ছিল ৭৬ শতাংশ। তবে এসআরইডিএ অনুসারে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপরীতে জ্বালানি নিবিড়তা (জিডিপির হিসাবে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি ব্যবহারের অনুপাত) কমেছে। ২০০৭ সালে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজন হতো ৩০৭ কেজি, IB (kg OE/1,000 US$) পরিমাণ জ্বালানি। ২০১৪ সালে তা ২১৮ কেজি ওই-তে নেমে আসে। জ্বালানি ব্যবহার কম হয়, এমন শিল্প খাতের (তৈরি পোশাক খাত) রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারায় এটি সম্ভব হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ খাত তার সংকটকাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে (এসআরইডিএ, ২০১৬)।
- ২০৪১ সাল নাগাদ কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতেই বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে তিন হাজার ৫০০ কোটি (৩৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। চূড়ান্ত জ্বালানি খাতে (বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি) প্রতি বছর দেশের মোট জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে বছরে জিডিপির ১ দশমিক ৭ শতাংশ বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে সরকারি খাতে। ২০১৫-২০২০ মেয়াদে এক্ষেত্রে কেবল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) কাঠামোর আওতায় ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়েছে, যার পরিমাণ মোট জিডিপির এক শতাংশ। জিডিপির অনুপাতে বিদেশি সহায়তার পরিমাণ (ওডিএ) সাধারণভাবে কমে আসছে। ফলে আগামী বছরগুলোয় বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চলমান প্রচেষ্টার তীব্রতা আরও অনেক বাড়াতে হবে।
- পিএসএমপি ২০১৬ অনুসারে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তনের হাত ধরে ভবিষ্যতে বিদ্যুতের চাহিদার কাঠামো পরিবর্তিত হবে। শিল্প, বাণিজ্য ও সরকারি সেবা খাতে (বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ; মেট্রোরেল ও অন্যান্য সেবা) লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। ২০২১ সাল নাগাদ দেশে মোট বিদ্যুতের চাহিদা ১৪ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালে চাহিদা ২৭ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৫১ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে বলে পিএসএমপিতে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ জ্বালানি ঘনত্ব ২০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে (এসআরইডিএ, ২০১৬)। আগামী দিনের পরিবর্তিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে চাহিদা ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। এ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসবে মানসম্মত উপায়ে বৈদ্যুতিক সেবা সরবরাহের বিষয়টি। বিশেষ করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় আগামী দিনে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যবস্থাপনায় বড় অনুষঙ্গ হিসেবে আবির্ভূত হবে।

- গ্রিডের সক্ষমতার (মেগাওয়াট/কিলোমিটার) বিপরীতে সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণের হার নিম্নপর্যায়ে রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এ সম্প্রসারণ পরিমিত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংগতি বিধানের লক্ষ্যে সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণ-সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে সিস্টেম লস হ্রাস পেলেও তা এখনো দুই অঙ্কের ঘরে রয়ে গেছে। এটি আরও কমিয়ে আনতে হবে।
- দীর্ঘ বছরের ব্যবধানেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহারের অনুপাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। দেশে গ্যাসের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। গ্যাস ব্যবহারে এর পরের অবস্থানে আছে যথাক্রমে শিল্প খাত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা (জেনারেটর) ও গৃহস্থালি। যদি গ্যাসের নতুন কোনো মজুতের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে বিদ্যমান গ্যাস আগামী ২০২৮-২০৪১ সালের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্প খাতে গ্যাসের ব্যবহার কেন্দ্রীভূত হবে। গ্যাসের শুল্ক নির্ধারণের সক্ষমতা সরকারের হাতে সংরক্ষিত। যদি গ্যাসের বর্তমান চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে আর শুল্ক সমন্বয় করা না হয়, তাহলে গ্যাসের সীমিত মজুত গ্রাহকদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ সৃষ্টি করবে।

৭.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রাপ্যতা বাড়াতে হবে এবং নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি ও সেবা গ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। এছাড়া সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এসব উদ্যোগের মধ্যে হতে পারে জ্ঞান হস্তান্তর, কাজ করার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন, পাইলট কর্মসূচি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান সৃষ্টিকরণ এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নততর জ্বালানি সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

আর জ্বালানির মিশ্র চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বাজেটের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তা বেশ সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে মিশ্র জ্বালানি ব্যবস্থার মধ্যে কোনটির ব্যবহার সাশ্রয়ী হবে এবং বাজেটের ওপর কম চাপ পড়বে, সে বিষয় সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে সাশ্রয়ী মাধ্যমে বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। যেসব জ্বালানি ও মাধ্যম ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, তার মধ্যে রয়েছে বেশি দামের ভারী জ্বালানি তেলভিত্তিক (এইচএফও) বিদ্যুৎকেন্দ্র, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক (এলএনজি) বিদ্যুৎকেন্দ্র, দেশীয় উৎসের গ্যাস, দেশীয় কয়লা ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ/এলএনজি/পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং নবায়নযোগ্য খাতের সম্ভাবনা কাজে লাগানো।

দেশে জ্বালানি খাতে বাজারভিত্তিক ও ক্রমবর্ধনশীল একটি শুল্ক ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং তা সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ খাতের জন্য যেমন পক্ষপাতমূলক কোনো শুল্ক ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়, তেমনি জ্বালানি প্রাপ্যতায় সমতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা উচিত। বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প খাত (এমএসএমই), কৃষি ও নিম্নআয়ের পরিবারও যাতে সমতার ভিত্তিতে জ্বালানির সুবিধা ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ক্ষেত্রে এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিটি এসেছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে। এসডিজি-৭ অর্জনের পথে যদি দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করতে হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক সহায়তার অধিকতর দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পে ভিন্নতা আনতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তি খাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিত করতে হলে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তুকির ব্যবস্থা এবং জাতীয় গ্রিডে সৌর, বায়ু ও জলবিদ্যুৎ সংযুক্ত করতে হবে।

৭.৬ সারকথা

২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সব পরিবারের জন্য পরিচ্ছন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশ খুব স্থিতিশীলভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এরই মধ্যে ২০১৯ সালে ৯৫ শতাংশ পরিবারে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশ জ্বালানির অন্যান্য সূচকে বেশ পিছিয়ে আছে। যাহোক, সব পরিবারে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহে সরকারের চলমান প্রচেষ্টা এসডিজি-৭ অর্জনের পথকে আরও মসৃণ করে তুলবে। এসডিজি-৭ অর্জনে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০৩০ সাল মেয়াদি নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর লক্ষ্য

হলো সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবা নিশ্চিত করা, মোট জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য খাতের অংশ বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো। এ কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনায় এসডিজি-৭ অর্জনের পথে সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ ও নির্ধারিত মাইলফলক অর্জনে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুতের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর জন্য ২০১০ সালে 'জরুরিভিত্তিক' কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বাজারভিত্তিক' ব্যবস্থাপনার দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। ২০২১ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদেই বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। এটা করা হলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দক্ষতার ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির যে শঙ্কা রয়েছে, তা অনেকাংশেই লাঘব হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে হলে সৌর, বায়ু ও জলবিদ্যুতের মতো পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। উন্নত প্রযুক্তির সাশ্রয়ী অনুষঙ্গ সংযোজন বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমানোর পাশাপাশি ভবন ও শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে আনতেও সহায়তা করবে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি করা হলে একদিকে তা প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে, অন্যদিকে পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৮

স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল চাকরি এবং সবার জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা

৮.১ এসডিজি ৮ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

এসডিজির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা ও বাস্তবায়নের জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের সক্ষমতা বাড়াতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরালো ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিকভাবেই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেকারত্বের চিত্র আর্থিক সংকট-পূর্ব সময়ের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে বিশ্ব অর্থনীতি অপেক্ষাকৃতভাবে ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। তরুণসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও জেন্ডারভিত্তিক মজুরিবৈষম্য কমানো এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের উন্নয়ন সাধন ও সবার জন্য শোভন কর্ম নিশ্চিত করতে আরও দ্রুত মাত্রায় অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

২০১৭ সালে বিশ্বে মাথাপিছু জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল ১ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এটি দুই শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লিখিত প্রবৃদ্ধি ২০১০ সালের তুলনায় যথেষ্ট কম। ওই বছর মাথাপিছু বৈশ্বিক প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল তিন শতাংশ। তবে ২০১৫ সালের তুলনায় বর্তমানের প্রবৃদ্ধি ভালো। ওই বছর এর হার ছিল ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় (এলডিসি) ২০১৭ সালে প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ।২০২০ সালে এ প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। প্রত্যাশিত এ হার ২০৩০ এজেন্ডার দর্শনের তুলনায় অনেক কম। ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডায় এলডিসি দেশগুলোর জন্য গড়ে সাত শতাংশ হারে মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ায় বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলনে ব্যাপক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

২০০৯ সালের মন্দা পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর সময় থেকে বিশ্বে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে (কর্মজীবী মানুষের মাথাপিছু জিডিপি হিসাবে পরিমাপ)। আর ২০১০ সাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক প্রবণতায় প্রবাহিত হচ্ছে। ২০১৮ সালে বৈশ্বিক শ্রম উৎপাদনশীলতা ২ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১০ সালের পর থেকে এটিই সর্বোচ্চ হার।

অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান উপার্জনের একটি বড় মাধ্যম হলেও এ খাতে পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ঘাটতির পাশাপাশি কর্মপরিবেশের অবস্থাও ভালো নয়। বিশ্বের যেসব দেশে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের উপাত্ত আছে, এমন তিন-চতুর্থাংশ দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওইসব দেশে কৃষিবহির্ভূত খাতের অর্ধেকেরও বেশি কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক খাতে। ৬২টি দেশের গড় কর্মঘণ্টা ও মজুরির উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওইসব দেশে জেন্ডারভেদে মজুরিবৈষম্য ১২ শতাংশ। ব্যবস্থাপক পর্যায় ও পেশাগত কাজে এ ব্যবধান ২০ শতাংশের ওপরে। বিশেষ করে হস্তশিল্পের কাজ ও হস্তশিল্পপণ্যের ব্যবসা, কারখানার মেশিন অপারেটর ও যন্ত্রাংশ সংযোজনকারীদের মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক মজুরিবৈষম্য বেশি।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা-পরবর্তী সময়ে বেকারত্ব সমস্যা অনেকটাই নিরসন হয়েছিল। ২০১৮ সালে বৈশ্বিক বেকারত্বের হার ছিলপাঁচ শতাংশ, যা মন্দা-পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পূর্ণবয়স্কদের তুলনায় তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার তিনগুণ বেশি। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, ওই সময় বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ তরুণ-তরুণী শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণ (এনইইটি) কোনো কিছুতেই নিয়োজিত ছিল না। এর অর্থ হলো, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একদিকে তারা যেমন পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে না, অন্যদিকে প্রথাগত শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতারও উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। কর্মে নিয়োজনের ক্ষেত্রে সারাবিশ্বেই একটি স্পষ্ট জেন্ডার ব্যবধান বিদ্যমান। যেসব মানুষ শিক্ষা, কর্ম বা প্রশিক্ষণ কোথাও নেই, তাদের মধ্যে যুবকদের তুলনায় যুবতীদের সংখ্যা দ্বিগুণ।

বিশ্বব্যাপী অসংখ্য কর্মজীবী কর্মক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকির মুখে পড়েন। ৫৫টি দেশের সাম্প্রতিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী প্রতি এক লাখ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এক বছরে কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা তিনজন। আর এক লাখ শ্রমজীবীর বিপরীতে কর্মক্ষেত্রে জখমের শিকার হন ৮৮৯ জন। তবে এ জখমগুলো মারাত্মক নয়।

শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপীই বড় ধরনের জেন্ডার ব্যবধান বিদ্যমান। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত পুরুষের অনুপাত ছিল ৭৪ শতাংশ। আর নারীর অনুপাত মাত্র ৪৭ শতাংশ, যা পুরুষের তুলনায় ২৭ শতাংশ কম। সব দেশেই উপার্জনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত অনেক কম। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, তথাপি বিপুলসংখ্যক নারী এখনো অবৈতনিক পারিবারিক কর্মে নিয়োজিত এবং তারা কার্যকর আয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। পারিবারিক কাজে নিয়োজিত ৩৬ কোটি (৩৬০ মিলিয়ন) কর্মীর (যাদের অনেকেই নারী) ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব কাজে পুরুষের তুলনায় নারীর গড় মজুরি ১৭ শতাংশ কম। শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, গ্রামীণ ও শহুরে পরিবার, কাজের

ধরন ও পারিবারিক কাঠামো নির্বিশেষে এ ব্যবধান বিদ্যমান। আর প্রতি সপ্তাহে নারী ও পুরুষের সম্পাদিত কর্মঘণ্টা যদি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে জেন্ডারভিত্তিক মজুরিবৈষম্য দাঁড়াবে ২৫ শতাংশে।

বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম এখনো উদ্বেগের বিষয়। পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সি ২১ কোটি ৮০ লাখ (২১৮ মিলিয়ন) শিশু কোনো না কোনো ধরনের কর্মে নিয়োজিত এবং তাদের মধ্যে অন্তত ১৫ কোটি ২০ লাখ (১৫২ মিলিয়ন) চরমভাবে শিশুশ্রমের শিকার। তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সাত কোটি ৩০ লাখ (৭৩ মিলিয়ন) বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। ২০০০ সালের তুলনায় কর্মে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা কমে এসেছে। ওই সময় বিশ্বব্যাপী কর্মে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ছিল ২৪ কোটি ৬০ লাখ (২৪৬ মিলিয়ন)।

অর্থের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপীই অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তিনির্ভরতার কারণে অর্থের প্রাপ্যতার ধরন বদলে যাচ্ছে। ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় টাকা প্রদান যন্ত্রের (এটিএম) মাধ্যমে আর্থিক সেবাগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১০ সালে প্রতি লাখ পূর্ণবয়স্ক জনগোষ্ঠীর বিপরীতে এটিএম বুথের সংখ্যা ছিল৪৫টি। ২০১৭ সালে তা ৬৬টিতে উন্নীত হয়। আর স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় এ সংখ্যা ২ দশমিক ৩ থেকে ৫ দশমিক ৮টিতে উন্নীত হয়। তবে ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র দুই শতাংশ। কারণ এ সময়ে ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতা বেড়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় এসডিজি-৮ অর্জনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল এবং শোভন কাজের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আর এ বিষয়গুলো অর্জনের জন্য উন্নয়নকেন্দ্রিক নীতি প্রণয়ন ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে সহায়তা দান, শোভন কর্মসৃজন, নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলোর বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন আর্থিক সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আনুষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এছাড়া দেশগুলো তরুণসমাজ, শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ সকল নারী-পুরুষের জন্য পরিপূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মের লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সমমানের কর্মে সমপরিমাণ মজুরির নীতি প্রতিষ্ঠার ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের জন্য মঞ্জুরি তহবিলে প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচ হাজার ৮০০ কোটি (৫৮ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। এ অর্থ ভিত্তিবছরের (২০০২-২০০৫) তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ওই সময় বাণিজ্যের জন্য মঞ্জুরি খাতে প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ ছিলদুই হাজার ৩১০ কোটি (২৩.১ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। চূড়ান্ত হিসাবেবাণিজ্যের জন্য মঞ্জুরি তহবিলের অর্থের মধ্যে সবচেয়ে বড় (১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি হয়েছিল কৃষিখাতে। এছাড়া শিল্পখাতে ১০০ কোটি এবং ব্যাংক ও আর্থিক সেবাখাতে অর্থপ্রবাহের পরিমাণ ১০০ কোটি মার্কিন ডলার বেড়েছে।

এসডিজির অষ্টম অভীষ্টে স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শোভন কর্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উদ্ভাবন বাড়ানো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহুমুখীকরণ এবং শ্রমনিবিড় খাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির হাত ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জিত হবে। কর্মসংস্থান, বিশেষ করে যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার ব্যবধান হ্রাসকরণ, সুযোগের অসমতা কমানো এবং সবার জন্য শোভন কর্ম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে আরও অনেক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। বেকারত্বের হার, মজুরিবৈষম্য এবং শোভন কর্মের ঘাটতি মোকাবিলায় গৃহীত নীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

৮.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৮ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

সূচক ৮.১.১: মাথাপিছু প্রকৃত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

দারিদ্র্য বিমোচন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দারিদ্র্য বিমোচনের মতো দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিষয়ে সর্বদা সর্বোচ্চপ্রাধিকার দিতে হবে। অবশ্য বাংলাদেশ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে স্থিতিশীলভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে, যা এরই মধ্যে দেশটিকে নিম্নআয় থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। পাশাপাশি নির্ধারিত তিনটি সূচকেই সম্মানজনক পয়েন্ট অর্জন করে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়।

দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রকৃত বার্ষিক গড় মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৯১ শতাংশে উন্নীত হয়, অথচ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যা ছিল মাত্র ৫ দশমিক ১ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এমন দ্রুত বর্ধনশীলতা বেশ লক্ষণীয়। একদিকে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধিতে শ্লথ ধারা, অন্যদিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ মাত্রা মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত মাইলফলক অর্জনের বিষয়ে সঠিক পথেই এগোচ্ছে বাংলাদেশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা ৮ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়। ক্রয়ক্ষমতার সক্ষমতা বিচারে (পিপিপি) ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ২৮ মার্কিন ডলার। গত ২০ বছরে পিপিপির হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। এ সময়ের ব্যবধানে পিপিপি মডেলে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি এক হাজার ৩৬৭ মার্কিন ডলার থেকে পাঁচ হাজার ২৮ ডলারে উঠে এসেছে। এ সময়ের ব্যবধানে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০১৮ সালে– ৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ। তবে ২০১৯ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৮ দশমিক ৫৯ শতাংশে স্থির হয়েছে।

সূচক ৮.২.১: প্রতি কর্মিজনে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

প্রতি কর্মিজনে প্রকৃত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি একটি পরিমাপক ব্যবস্থা। এক একক শ্রম বৃদ্ধি করলে তার বিপরীতে কী পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তা এই পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। এজন্য এটিকে শ্রম উৎপাদনশীলতাও বলা হয়। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্রম উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এটি দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ বিষয়ে ধারণা দেয়, যা ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক আর্থিক সুবিধা-সংবলিত স্থিতিশীল শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ২০১৮ সালে প্রতি কর্মিজনে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ২০১৭ সালে এ হার ছিল ৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ।

২০২০ সালের মাইলফলকে প্রতি কর্মিজনে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সূচকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ শতাংশ, যা এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, ২০১৬ সালে দেশে কর্মে নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠীর (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় কোটি আট লাখ (৬০.৮ মিলিয়ন), ২০১৫ সালে এ সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি ৯৫ লাখ (৫৯.৫ মিলিয়ন)। এক বছরের ব্যবধান কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ১৮ শতাংশ। কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ নারী। এছাড়া ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীর অনুপাত ২৯ দশমিক পাঁচ এবং ৩০ থেকে ৬৪ বছর বয়সি পূর্ণবয়স্কের হার ৬৬ দশমিক পাঁচ শতাংশ। এ অবস্থায় ভৌত ও মানবসম্পদের আরও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা, অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান কমানো এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ আবশ্যক।

সারণি ৮.১: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)

	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ (ভিত্তি বছর)	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
৮.১.১ মাথাপিছু প্রকৃত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৪.১৪	৫.১৫	৫.১৭	৪.৫৬	৪.৬৫	৫.১২	৫.৭৭	৬.০৫	৬.৬১	৬.৯১
৮.২.১ প্রতি কর্মিজনে প্রকৃত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	...	...	...	...	...	৫.৭১	৬.২৭	৪.৯৯	৫.৫৬	...

সূত্র: শ্রমশক্তি জরিপ (এলএফএস), বিবিএস, এসআইডি

চিত্র ৮.১: বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি

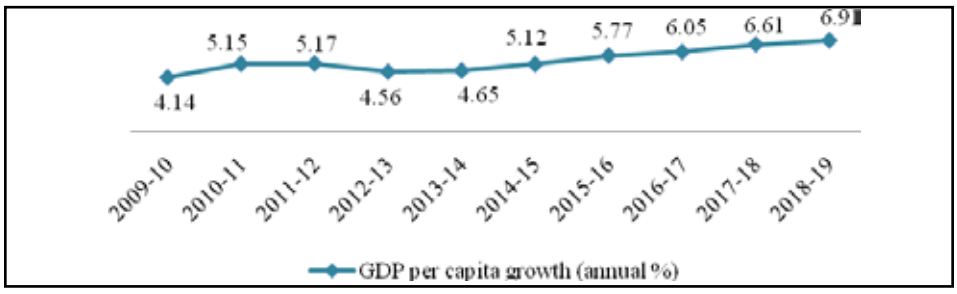

সূচক ৮.৩.১: জেন্ডারভেদে অকৃষি খাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত

বাংলাদেশে শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। দুই দশক ধরে অনানুষ্ঠানিক খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে একপ্রকার দ্রুতগতিতেই। ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশের মোট কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর ৮৫ দশমিক ১ শতাংশই নিয়োজিত অনানুষ্ঠানিক খাতে (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি)। নারীদের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিতের হার ৯১ দশমিক ৮ শতাংশ আর পুরুষ ৮২ দশমিক ১ শতাংশ। শহরাঞ্চলে এক কোটি ৩১ লাখ (১৩.১ মিলিয়ন) মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এ সংখ্যা শহরের মোট কর্মে নিয়োজিতদের ৭৭ দশমিক ৩ শতাংশ। আর গ্রামাঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তিন কোটি ৮৬ লাখ (৩৮.৬ মিলিয়ন)। গ্রামাঞ্চলে ৮৮ দশমিক ১ শতাংশ কর্মজীবীই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। যদিও বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাত দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, কিন্তু অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের উচ্চ হার এসডিজি-৮ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জের জন্ম দিচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানে আইনি সুরক্ষা ও চাকরি-সম্পর্কীয় সুবিধাদির যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি এ খাতে নানা ধরনের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, যেগুলো কম উৎপাদনশীল হিসেবে পরিগণিত।

শিল্প ও সেবার মতো কৃষিবহির্ভূত খাতে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান কিছুটা বেড়েছে। ২০১৫ সালে এ দুটি খাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত ছিল ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা কিছুটা বেড়ে ৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০২০ সালের মধ্যে অকৃষি খাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ৭৫ শতাংশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৬৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনানুষ্ঠানিক খাতে বয়সভিত্তিক কর্মসংস্থানের কাঠামোতেও পরিবর্তন আসছে। ২০১৭ সালে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিতের হার ছিল ৩১ শতাংশ, যা ২০১৫ সালের তুলনায় কম। ২০১৫ সালে এ হার ছিল ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে ৩০ থেকে ৬৪ বছর বয়সি পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিতের হার বেড়েছে। কর্মসংস্থানে থাকা এ বয়সিদের মধ্যে ২০১৫ সালে ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল অনানুষ্ঠানিক খাতে। ২০১৭ সালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪ দশমিক ৯ শতাংশে উঠে এসেছে। মূলত কর্মে প্রবেশে দেরি হওয়ার কারণে বয়সভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের এ তারতম্য হয়ে থাকতে পারে।

সূচক ৮.৫.১: পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তিভেদে (প্রতিবন্ধী) নারী ও পুরুষ কর্মীদের ঘণ্টাপ্রতি উপার্জন

বয়স, লিঙ্গ ও অঞ্চলের ভিত্তিতে কর্মীদের বেতনভাতা পরিশোধের নিয়মকানুনেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুসারে কর্মে নিয়াজিত মোট জনসমষ্টির মধ্যে দুই কোটি ৪২ লাখ (২৪.২ মিলিয়ন) ব্যক্তির হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ মাসিক বেতনভুক্ত, ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ মজুরি পায় দৈনিক ভিত্তিতে, ৭ দশমিক ৩ শতাংশ পায় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এবং ১ দশমিক ৫ শতাংশ অন্যান্য শর্তে তা গ্রহণ করে।

২০১৬-১৭ সময়ে মাসিক গড় মজুরি ভিত্তি মজুরির তুলনায় (১২ হাজার ৮৯৭ টাকা) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গত চার বছর নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রকৃত মজুরি কমেছে। ২০১৬-১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, মাসিক গড় মজুরি দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ২৫৮ টাকা, অথচ ২০১৩ সালে এটি ছিল ১৪ হাজার ১৫২ টাকা।

জেন্ডারের ভিত্তিতে মজুরি বৈষম্যের ক্ষেত্রেও অবনতির ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নারীদের প্রকৃত মজুরি হার হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সমমানের কাজে নারীর প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে এ হ্রাস পাওয়ার হার ১ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০১৬ সালে পুরুষের মাসিক গড় মজুরি দাঁড়ায় ১৩ হাজার ৫৮৩ টাকা, ২০১৩ সালে যা ছিল ১৪ হাজার ৩০৯ টাকা। অন্যদিকে নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২০১৩ সালে তাদের প্রকৃত গড় মাসিক মজুরি ছিল ১৩ হাজার ৭১২ টাকা, ২০১৬ সালে তা ১২ হাজার ২৫৪ টাকায় নেমে এসেছে। বিভিন্ন পেশায় জেন্ডারভিত্তিক মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। এসব পেশার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কুটিরশিল্প পণ্য প্রস্তুত ও বিক্রি, বিলুপ্তির পর্যায়ে থাকা বিভিন্ন পেশা ও কৃষিশ্রমিক। শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই জেন্ডারভিত্তিক আয়বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা ১৮ লাখ ১০ হাজার (১.৮১ মিলিয়ন) এবং শহরে আট লাখ ৭০ হাজার (০.৮৭ মিলিয়ন)।

সূচক ৮.৫.২: জেন্ডার, বয়স ও অসমর্থতার ভিত্তিতে বেকারত্বের হার

২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ বেকারত্ব বিষয়ে ওই সময়ের হালনাগাদ পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছে, যা দেশের শ্রমবাজারের প্রকৃত চিত্র ও দেশের অর্থনীতির কর্মসম্পাদন বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার বলতে মোট শ্রমশক্তির মধ্যে মোট কর্মহীন মানুষের অনুপাতকে বোঝায়। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে বেকারত্বের এ অনুপাতে তেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়নি। ২০১৩ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ, ২০১৭ সালে যা ৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে বেকারত্বের চিত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। ২০১৮ সালের তুলনায় তা কিছুটা কম, ওই সময় এ হার ছিল ৪ দশমিক ৩১ শতাংশ। ১৯৯৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বেকারত্বের হারে বেশ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল। এরপর দীর্ঘদিন ধরেই বেকারত্ব ৪ দশমিক ৪ শতাংশের আশেপাশে স্থির রয়েছে।

যাহোক, নারীদের বেকারত্বের হার পুরুষের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। ২০১৩ সালে পুরুষের বেকারত্বের হার ছিল তিন শতাংশ। ২০১৬ সালে তা কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ দশমিক ১ শতাংশে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, বয়সভিত্তিক যেকোনো স্তরের তুলনায় ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সিদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। এ বয়সিদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১২ দশমিক ৩ শতাংশ।

সারণি ৮.২: বেকারত্বের হার, অকৃষিখাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও উপার্জন

	২০১৩	ভিত্তিবছর ২০১৫	২০১৬-২০১৭
৮.৩.১ জেন্ডারভেদে অকৃষি খাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত (শতাংশ)	৭৮.৮৬ পুরুষ: ৭৮.৩৮ নারী: ৮০.৩২	৭৭.৮ পুরুষ: ৭৫.২ নারী: ৮৮.৭	৭৮.০ পুরুষ: ৭৬.০ নারী: ৮৫.৫
৮.৫.১ পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তিভেদে নারী-পুরুষের গড় ঘণ্টাভিত্তিক উপার্জন (টাকা/মাস)	১১,৪৯৩ পুরুষ: ১১,৬২১ নারী: ১১,১৩৬	১২,৮৯৭ পুরুষ:১৩,১২৭ নারী:১২,০৭২ বয়স: ১৫-২৪: ১০,৮৬২ ২৫-৩৪: ১২,৮০১ ৩৫-৪৪: ১৪,০৫৩ ৪৫-৫৪: ১৪,৮৫৭ ৫৫-৬৪: ১৩,১৬০ ৬৫+: ১০,৮৪৪	১৩,২৫৮ পুরুষ: ১৩,৫৮৩ নারী: ১২,২৫৪ বয়স: ১৫-২৪: ১০,৮৩১ ২৫-৩৪: ১৩,২০৪ ৩৫-৪৪: ১৪,১৪৩ ৪৫-৫৪: ১৫,৪৪৬ ৫৫-৬৪: ১৪,৫১১ ৬৫+ : ১১,৫৮০
৮.৫.২ জেন্ডার, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তিভেদে বেকারত্বের হার (শতাংশ)	৪.৩ পুরুষ: ৩.০ নারী: ৭.৩	৪.২ পুরুষ: ৩.০ নারী: ৬.৮ বয়স: ১৫-১৭: ১০.৫ ১৮-২৪: ১০.১ ২৫-২৯: ৬.৭ ৩০-৬৪: ১.৯ ৬৫+: ৪.২	৪.২ পুরুষ: ৩.১ নারী: ৬.৭ বয়স: ১৫-২৪: ১২.৩ ২৫-৩৪: ৫.৫ ৩৫-৪৪: ১.২ ৪৫-৫৪: ০.৮ ৫৫-৬৪: ০.৬ ৬৫+ : ০.০

সূত্র: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩, কিউএলএফএস ২০১৫-১৬ এবং এলএফএস ২০১৬-১৭

সূচক ৮.৬.১: শিক্ষা, কর্মসংস্থান অথবা প্রশিক্ষণে (এসইইটি) যুক্ত নয়, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি এমন তরুণ-তরুণীর অনুপাত

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ সূচকের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে অবস্থানকারীদের মধ্যে যারা কর্ম, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ (এনইইটি) কোথাও নেই, তারা শ্রমবাজারের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়

বয়সভিত্তিক গোষ্ঠী। এনইইটির উচ্চ হার ও শ্রমশক্তিতে তরুণসমাজের কম মাত্রায় অংশগ্রহণ চাকুরির বাজারে অপ্রতুল সুযোগের বিষয়টি নির্দেশ করে। ২০১৬-১৭ সালে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৯ দশমিক ৮ শতাংশ কর্ম, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ (এনইইটি) কোনো অবস্থাতেই ছিল না। এনইইটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৩ শতাংশ ছিল ছেলে, বাকি ৮৭ শতাংশই ছিল মেয়ে। ২০১৬-১৭ সময়ের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, ছেলেদের মধ্যে এনইইটি জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১০ শতাংশের কাছাকাছি হলেও নারীদের মধ্যে তা ৫০ শতাংশের ওপরে। এনইইটিতে নারীদের এমন উচ্চ অনুপাতের অর্থ হলো, তারা অধিক মাত্রায় পারিবারিক কাজে নিবদ্ধ অথবা শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সামনে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান।

সারণি ৮.৩: কর্মসংস্থান, শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণ (এনইইটি) কোথাও না থাকা যুব জনগোষ্ঠীর অনুপাত

	ভিত্তিবছর ২০১৫	২০১৬-২০১৭
৮.৬.১ শিক্ষা, কর্মসংস্থান অথবা প্রশিক্ষণে (এসইইটি) যুক্ত নয়, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি এমন তরুণ-তরুণীর অনুপাত (শতাংশ)	২৮.৮৮ পুরুষ: ৯.৯ নারী:৪৬.৯	২৯.৮ পুরুষ: ১০.৩ নারী: ৪৯.৬

সূত্র: বিবিএস, কিউএলএফএস ২০১৫-১৬ ও এলএফএস ২০১৬-১৭

সূচক ৮.৭.১: জেন্ডার ও বয়সভেদে শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বয়সি শিশুর অনুপাত

শিশুশ্রম কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে ভালো অগ্রগতি হয়েছে, তার পরও ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১২ লাখ ৮০ হাজার (১.২৮ মিলিয়ন)। এদের মধ্যে ০২ লাখ ৬০ হাজার (০.২৬ মিলিয়ন) শিশু চরম ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে নিয়োজিত। শিশুশ্রম দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেকোনো মূল্যে শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করা উচিত। দেশে যেকোনো ধরনের কর্মে নিয়োজিত মোট শিশুর মধ্যে ২৪ লাখ ৭০ হাজার (২.৪৭ মিলিয়ন) গ্রামাঞ্চলে, ০৫ লাখ ৭০ হাজার (০.৫৭ মিলিয়ন) শহরাঞ্চলে এবং ০৪ লাখ ৩০ হাজার (০.৪৩ মিলিয়ন) রয়েছে সিটি করপোরেশন এলাকায়।

জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সনদের ভিত্তিতে ২০১৩ সালে পরিচালিত শিশুশ্রম জরিপ প্রতিবেদনে (সিএলএস) বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত শিশুদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: কর্মে নিয়োজিত শিশু, শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম। ২০১৩ সালের সিএলএস উপাত্ত অনুসারে, পাঁচ থেকে সতের বছর বয়সি মোট ০৩ কোটি ৯৬ লাখ ৫০ হাজার (৩৯.৬৫ মিলিয়ন) শিশুর মধ্যে ৮ দশমিক ৭ শতাংশ বা ৩৪ লাখ ৫০ হাজার (৩.৪৫ মিলিয়ন) শিশু কর্মে নিয়োজিত শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত। এ বয়সের মোট শিশুর মধ্যে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ বা ১৭ লাখ শিশুশ্রমে নিয়োজিত এবং ৩ দশমিক ২ শতাংশ বা ১২ লাখ ৮০ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের শিকার।

শিশুশ্রম রোধে সরকারের তরফ থেকে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০১০ সালে জাতীয় শিশুশ্রম নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও সবচেয়ে ক্ষতিকর শিশুশ্রমসহ সব ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের নিষ্কৃতি দিয়ে তাদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনা। ওই নীতির আলোকে ২০১২ থেকে ২০১৬ সালে শিশুশ্রম রোধে জাতীয় শিশুশ্রম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় যেসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে শিশুসংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (২০১২-২০১৬), শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এবং প্রাথমিক শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প। এসব প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সব ধরনের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের এ পরিস্থিতি থেকে বের করে আনা। ১৯৯৪ সাল থেকে 'শিশুশ্রম নিরসনে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি'র আওতায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দিয়ে আসছে। আইএলও'র এ কর্মসূচির নানা উদ্যোগের সুবিধা পেয়েছে দেশে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত ৭৫ হাজার শিশু। সবচেয়ে ভয়ংকর পর্যায়ের শিশুশ্রম নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবিভাগও সহায়তা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে দেশটি 'শিশুশ্রম হ্রাসকরণ দ্বিপক্ষীয় সহায়তা' প্রকল্প (Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour) বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে।

সূচক ৮.৮.১: জেন্ডার ও অভিবাসীর অবস্থানভেদে পেশাগত কাজে মারাত্মক ও মারাত্মক নয়, এমন জখমের ঘটনার হার

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে মারাত্মক ও মারাত্মক নয়, এমন জখমের বিষয়টি বড় ধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এমন জখমের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার ধারায় রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে মারাত্মক জখমের ঘটনা কমেছে। ২০১৫ সালে মারাত্মক জখমের ঘটনা ঘটেছিল ৩৮২টি। ২০১৯ সালে তা ২২৮টিতে নেমে এসেছে। মারাত্মক নয়, এমন

জখমের ঘটনাও কমেছে। ২০১৫ সালে এ ধরনের জখমের ঘটনার সংখ্যা ছিল ২৪৬টি। ২০১৯ সালে তা ১১১টিতে নেমে এসেছে। এ চিত্র থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি আরও ঢেলে সাজানো প্রয়োজন আছে।

সারণি ৮.৪: মারাত্মক ও মারাত্মক নয়, এমন পেশাগত জখম

	ভিত্তিবছর ২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৯
৮.৮.১ প্রতিবছর জেন্ডার ও অভিবাসীর অবস্থানভেদে পেশাগত কাজে মারাত্মক ও মারাত্মক নয়, এমন জখমের ঘটনার হার	মারাত্মক জখম: ৩৮২ পুরুষ: ৩৬২ নারী: ২০ মারাত্মক জখম নয়: ১৯৬ পুরুষ:১৭৭ নারী: ১৯	মারাত্মক জখম: ১৩২ পুরুষ: ১২৪ নারী: ০৮ মারাত্মক জখম নয়: ১০১ পুরুষ: ৬২ নারী: ৩৯	মারাত্মক জখম: ১৩২ পুরুষ: ১০৫ নারী: ২৭ মারাত্মক জখম নয়: ৫৩৩ পুরুষ: ২৮৫ নারী: ২৪৮	মারাত্মক জখম : ২২৮ (পুরুষ: ২২০; নারী: ৮) মারাত্মক জখম নয়: ১১১ (পুরুষ: ৯৪; নারী: ১৭) (ডিআইএফই, ২০১৯)

সূত্র: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও স্থাপনা পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)

চিত্র ৮.২: মারাত্মক নয়, এমন পেশাগত জখমের হার

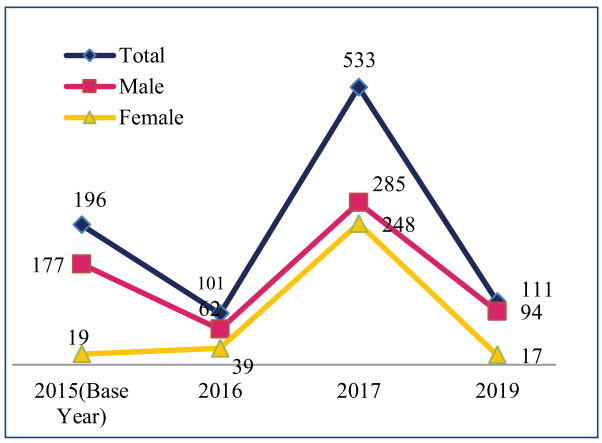

চিত্র ৮.৩ মারাত্মক পেশাগত জখমের হার

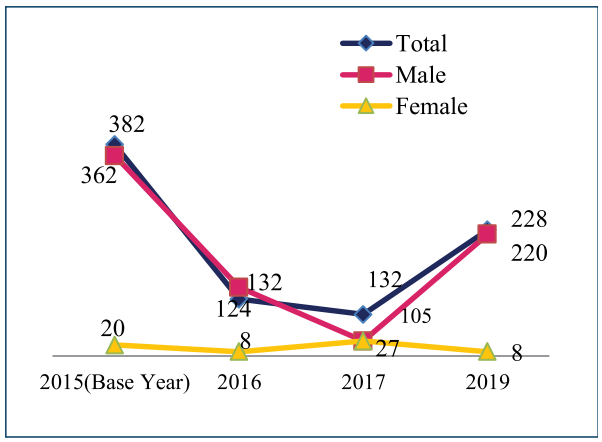

সূচক ৮.১০.১: (ক) প্রতি এক লাখ পূর্ণবয়স্ক মানুষের/জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সংখ্যা (খ) প্রতি এক লাখ পূর্ণবয়স্ক বিপরীতে এটিএম বুথের সংখ্যা

দৈনন্দিন লেনদেন, নিজস্ব সঞ্চয় সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা, দৈনিক ব্যয়ের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ, অভিঘাত নিরসন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানুষের সক্ষমতা বাড়ায়। সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে দেশে সবার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সরকার ২০২১-২০২৪ মেয়াদি জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল প্রস্তুত করেছে। অধিক হারে অর্থের প্রাপ্যতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দেশের অধিবাসীদের জন্য সহজলভ্য উপায়ে সাশ্রয়ী আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির বিষয়টি নির্দেশ করে।

২০১৮ সালে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৮ দশমিক ৯৬টিতে উন্নীত হয়েছে, ২০১৩ সালে যা ছিল ৮ দশমিক ২৭টি এবং ২০০৮ সালে ছিল ৭ দশমিক ১৯টি। এটিএম সেবা সম্প্রসারণেও ভালো অগ্রগতি হয়েছে। ২০১০ সালে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে এটিএম বুথের সংখ্যা ছিল ২ দশমিক ১২টি। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা ৭ দশমিক ১১ ও ২০১৮ সালে ৮ দশমিক ৮৭টিতে উন্নীত হয়।

চিত্র ৮.৪: প্রতি লাখ পূর্ণবয়স্ক জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ও এটিএম বুথের সংখ্যা

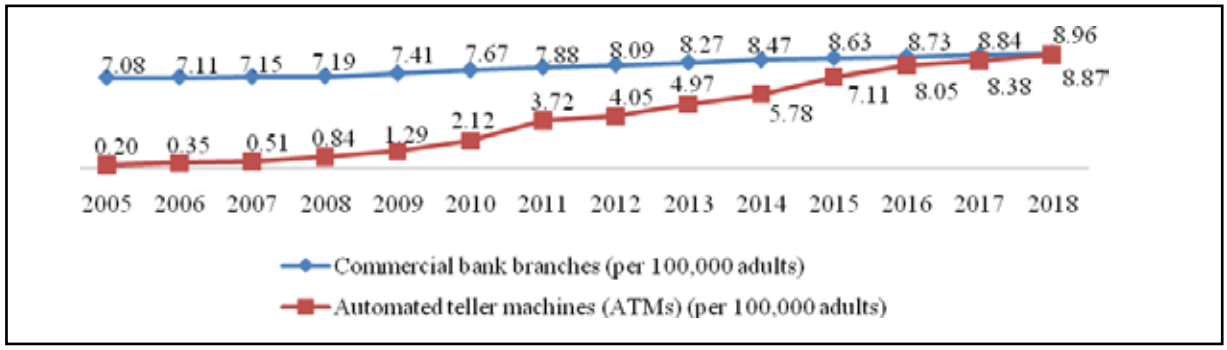

সূত্র: আইএমএফ, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকসেস সার্ভে

সারণি ৮.৫: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচক

	২০০৫	২০১০	ভিত্তিবছর ২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
৮.১০.১ (ক) প্রতি এক লাখ পূর্ণবয়স্ক মানুষের বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সংখ্যা (খ) প্রতি এক লাখ পূর্ণবয়স্ক মানুষের বিপরীতে এটিএম বুথের সংখ্যা	ক) ৭.০৭৮ খ) ০.২০২	ক) ৭.৬৭ খ) ২.১২	ক) ৮.৬৩ খ) ৭.১১	ক) ৮.৭৩ খ) ৮.০৪৫	ক) ৮.৮৪ খ) ৮.৩৮	ক) ৮.৯৬ খ) ৮.৮৭

সূত্র: আইএমএফ, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকসেস সার্ভে

সূচক ৮.১০.২: ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মোবাইলে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাবধারী পূর্ণবয়স্ক (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) জনগোষ্ঠীর অনুপাত

বছরের পর বছর ধরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকে বাংলাদেশের চমকপ্রদ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৮ সালে ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মোবাইলে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাবধারী পূর্ণবয়স্ক (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) জনগোষ্ঠীর অনুপাত ৬৯ দশমিক ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১৬ সালে এ হার ছিল ৬৩ দশমিক ৮৮ ও ২০১৫ সালে ছিল ৫০ দশমিক ৮০ শতাংশ।

সূচক ৮.ক.১: বাণিজ্য মঞ্জুরি খাতে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড়ের পরিমাণ

বাণিজ্যের জন্য মঞ্জুরি বা 'Aid for Trade' (AfT) বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধনে একটি দেশকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এটির উদ্দেশ্য হলো সহায়তাগ্রহণকারী দেশের বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন পরিপালনের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা। এছাড়া বাণিজ্য-সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন: বাণিজ্য উদারীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও উৎপাদনশীলতার সক্ষমতা বাড়ানো অথবা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা। যাত্রার শুরু থেকেই এএফটি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যয় কমাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। পাশাপাশি বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন সাধনে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ এটিএফ হিসেবে ৮১ কোটি ৪১ লাখ (৮২৪.১ মিলিয়ন) মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সহায়তা পেয়েছে। এ সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ছিল ১৩৪ কোটি (এক হাজার ৩৪০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার।

৮.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

এসডিজি-৮ অর্জন করতে হলে স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি সবার জন্য পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সমন্বয়মূলক সৌহার্দ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারা, পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা।

এ বিষয়গুলো সম্ভবপর করে তুলতে হলে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের যা দরকার, তা হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার ও কাঠামোগত রূপান্তর। দেশের উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশের অর্থনীতির ওপর প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রভাবের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবাজারে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে এবং প্রবৃদ্ধির ধরনও বদলে যাবে।এসডিজি-৮ অর্জনের পথে বিদ্যমান উচ্চমাত্রার অসমতাও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে। এসডিজি অর্জনের জন্য প্রাধিকার নির্ধারণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ, অংশীদারিত্ব ও কলাকৌশল জোগাড় করাও বড় চ্যালেঞ্জ হবে। তথাপি পরিবেশ দূষণ ও সামাজিক বিযুক্তির (Exclusion) মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা না গেলে কেবল এসডিজি-৮ এর অগ্রগতি খুব বেশি ফলদায়ক হবে না। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিকল্প কিছু নেই। শোভন কর্মসৃজনের জন্য উৎপাদনশীলতার দ্রুত প্রবৃদ্ধি অপরিহার্য।

শ্রম উৎপাদনশীলতা ও শোভন কর্মের ব্যাপক ভিত্তিতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতেই শ্রম উৎপাদনশীলতার ঘাটতি কমানো ও শ্রমবাজারের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির সমাধান করা এক বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া এসডিজি-৮ অর্জনে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এমএসএমই) ব্যবসায় উদ্যোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এসব ব্যবসায় উদ্যোগই মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জনের প্রধান মাধ্যম। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শ্রমশক্তির বড় অংশই এসব সংকটাপন্ন খাতে নিয়োজিত। কিন্তু এমএসএমই অব্যাহতভাবে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে অর্থের (ঋণসহ) সীমিত প্রাপ্যতা ও নির্দিষ্ট ব্যবসা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ঘাটতি, বিপণন ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ঘাটতি এবং দুর্বল রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও রেমিট্যান্স প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অভিবাসী শ্রমিকদের বড় অংশই অদক্ষ অথবা স্বল্পদক্ষ। ফলে তারা অন্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম উপার্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে অভিবাসীদের জন্য খাতনির্দিষ্ট কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ তাদের মজুরি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এতে একদিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ যেমন বাড়বে, তেমনি দারিদ্র্য হ্রাসকরণেও তা অবদান রাখবে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার ব্যয়, প্রতারক চক্রের দৌরাত্ম্য, গন্তব্য দেশে কাজ পাওয়ার বিষয়ে অবৈধ চুক্তি এবং অগ্রহণযোগ্য নানা শর্ত নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করে। রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচ কমানো ও আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা গেলে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে এখনো বিপুল হারে জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান। পরিবার ও নিজ সম্প্রদায় পর্যায়ে সুযোগের অসমতা (পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি), কর্মক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অনুপস্থিতি, নারীবান্ধব পরিবহন সুবিধার অভাব, কর্মক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা, সামাজিক অপবাদ প্রভৃতি এখনো অনেক নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু এ খাতে নানা ধরনের বাধা বিদ্যমান। যেমন প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ঘাটতি, দক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতা, নতুন প্রযুক্তি সংযোজনের বিষয়ে জটিলতা এবং ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তির অভাব এ খাতে তীব্র। আর এসব বিষয়ের ওপরই এসডিজি-৮ এ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৮.৪ ভবিষ্যৎ করণীয়

এসডিজি-৮ অর্জনে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ ও ব্যক্তি খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া দারিদ্র্য ও অসমতা-সম্পর্কিত বিষয়াদি মোকাবিলা, ব্যবসায় উদ্যোগের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ ও শ্রমবাজারের উন্নয়ন সাধন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

অক্ষরজ্ঞান ও গুণন বিষয়ে ন্যূনতম দক্ষতার মাধ্যমে সামাজিক ও আচরণগত সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সবার জন্য গুণগত শিক্ষার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বাল্যকালীন শিক্ষায় (প্রাক-প্রাথমিক) বিনিয়োগ বাড়ানো আবশ্যক। শিক্ষার এ স্তরে শিশুদের অংশগ্রহণের হার খুবই কম। প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে জিডিপির বাইরে আরও অনেক বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে

লক্ষ্য থাকতে হবে শোভন ও গুণগত কর্মসংস্থান এবং প্রত্যাশিত কাঠামোগত রূপান্তরের বিষয়ে। বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের নীতিসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের বিধান সংযুক্ত করতে হবে, যাতে করে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির নানা সমস্যায় তৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়। একদম গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে যাতে প্রবৃদ্ধির রসদ আহরিত হয়, তা নিশ্চিত করতে উপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবন, টেকসই অবকাঠামো ও নতুন পরিবেশবান্ধব শিল্পে বিনিয়োগ এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হবে কার্বন নিঃসরণ টেকসই উপায়ে কমিয়ে আনার দক্ষতাভিত্তিক নতুন শোভন কর্মসৃজন।

নির্দিষ্ট এলাকায় শিল্পায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের (দেশি-বিদেশি) সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। দেশীয় অর্থনীতিকে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটানো, ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা আনয়ন ও যুগোপযোগী বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে এ অংশীদারিত্ব অপরিহার্য।

আরেকটি সম্ভাবনাময় বিষয় হলো সব খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। এক্ষেত্রে কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতে বিশেষ নজর দেওয়া আবশ্যক। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই বাড়তি নজর দিতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র পরিসরের কৃষি খামার, গ্রামীণ অকৃষি ও শহুরে অনানুষ্ঠানিক খাতের দিকে নজর দিতে হবে। এসব খাতে দ্রুতগতির প্রবৃদ্ধি দরিদ্র ও দারিদ্র্যের কাছাকাছি বাস্তবতায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের ব্যাপক মাত্রায় অর্থনীতির মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা পালন করবে। নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ ও এমএসএমই খাতের জন্য সংগতিপূর্ণ প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পাশাপাশি এসব ব্যবসায় উদ্যোগের জন্য সহায়ক জ্ঞান ও দক্ষতার প্রসার, উদ্ভাবন কার্যক্রমে গুরুত্ব প্রদান ও বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।তাছাড়া তাদের জন্য বিভিন্ন সহায়ক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এমন সেবার মধ্যে রয়েছে সক্ষমতা বাড়ানো, এমএসএমই'র উত্তম চর্চার আদান-প্রদান সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং বাণিজ্য ও সহযোগিতা চুক্তির সুযোগ। এসব উদ্যোগ নেওয়া হলে এমএসএমইগুলো স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে দেশের সিংহভাগ মানুষের টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধানতম ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি তাদের ডিজিটাল অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ও বৈশ্বিক মূল্য শিকলের (গ্লোবাল ভ্যালু চেইন) সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়োজনীয় নীতি/কৌশলের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো অর্থনীতির কার্যকর বহুমুখীকরণের সুযোগ বাড়াতে নীতি প্রণয়ন ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়ানো, প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নতুন প্রযুক্তিসমূহের সন্নিবেশ ঘটানো। এগুলো নতুন শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং খাত চিহ্নিতকরণ ও তার সুবিধা গ্রহণের সুযোগ নিতে সহায়ক হবে। সরকারের নীতিতে কর্মসংস্থানমুখী সামষ্টিক অর্থনৈতিক এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যার প্রধান লক্ষ্যই হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো ও কর্মসংস্থান থেকে নারীর ঝরে পড়া কমাতে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে নারী শিক্ষায় অত্যধিক গুরুত্বারোপ, গর্ভধারণের হার কমানো, সরকারি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু চাকরি সংরক্ষণ, মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা (কর্মক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র স্থাপন)। এসব বিষয় নারী কর্মসংস্থান বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ রোধকল্পে সরকার এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো সৃষ্টি করেছে। তবে এসব ক্ষেত্রে কার্যকর পরিবীক্ষণ ও আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

বিদেশে অভিবাসের সুযোগ সম্প্রসারণে সরকারকে অবশ্যই নতুন শ্রমবাজারের অনুসন্ধান ও এর সম্প্রসারণে উদ্যোগ নিতে হবে। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্য এক ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছে, তাই নতুন বাজারের অনুসন্ধান খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু যথোপযুক্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রবাসী শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৮.৫ সারকথা

এসডিজি ৮ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ এরই মধ্যে আট শতাংশ হারে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নগামী হওয়ায় তা প্রকৃত মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ প্রতি কর্মীজনে গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২০২০ সালের জন্য যে মাইলফলক নির্ধারণ

করা হয়েছিল, তা ২০১৭ সালেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একই সঙ্গে বেকারত্বের হার গত কয়েক বছর ধরেই চার শতাংশে স্থির রয়েছে। এসব নির্দেশক এসডিজি-৮-এর ক্ষেত্রে ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত মাইলফলক অর্জনের কাছাকাছি অবস্থার পরিচয় বহন করে। তবে শ্রমবাজারকেন্দ্রিক বেশকিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

তরুণ ও যুবসমাজের জন্য শোভন কর্মসৃজনের ক্ষেত্রে আরও অনেক অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। তাদের জন্য নিয়মিতভাবে একটি শিক্ষানবিশি কাঠামো সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় আইনি নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠান কর্মী নিয়োগ করে, তাদের সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যুব কর্মসংস্থানের জন্য যেসব নীতি, কৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনার পাশাপাশি সমন্বিত পদক্ষেপ এবং নীতিকৌশল প্রণয়নের শুরুর পর্যায় থেকেই বহু অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যক্রমে সমন্বয় প্রয়োজন।

শ্রমবাজারে নারী ও অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠীর কার্যকর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের ওপর জোর দিতে হবে, যে পদক্ষেপ এসব জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান প্রাপ্তি সহজীকরণ ও পুনরায় কাজে ফেরার সুযোগ অবারিত করবে। ব্যক্তি খাতে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অসমর্থ ব্যক্তিদের যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলো অপসারণে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একইভাবে নারীদের আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যদি কোনো আইনি ও সামাজিক বাধা থেকে থাকে, তাহলে তা দূর করতে সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। পাশাপাশি নারীদের আনুষ্ঠানিক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা দেওয়া উচিত।

বাল্যকালীন শিক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক দক্ষতা হিসেবে 'শিখতে শেখা' (learning to learn) কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিদান এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা আবশ্যক। দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামো প্রণয়ন ও পুনঃপ্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু এবং নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করার বিষয়ে সরকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার উদ্যোগ নিতে পারে। অর্থনীতির বহুমুখিতার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মজগতের মধ্যে যোগসূত্র জোরদার করা, সংশ্লিষ্ট খাতের সঙ্গে কর্মীর দক্ষতার অমিল ও দক্ষতার ঘাটতি মোকাবিলা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। বিদ্যমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর শ্রমবাজারের চাহিদা, চাকরির পরিবর্তনশীল ধরন এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনশীলতার বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

৯

অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবন

অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের সম্প্রসারণ এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান

৯.১ এসডিজি ৯ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশের নানা দিক এসডিজি ৯-এর দ্রুত অগ্রগতিতে সহায়ক নয়। একদিকে যেমন উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অর্থনৈতিক অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে, একই সঙ্গে মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও প্রভূত উন্নতিসাধন হয়েছে। অন্যদিকে এলডিসিভুক্ত ও অন্য যে সমস্ত দেশ পিছিয়ে রয়েছে, তাদের পক্ষে ২০৩০ সালের মধ্যেজিডিপির অর্ধেক ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে নিশ্চিত করার লক্ষ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। বিজ্ঞান গবেষণা ও উদ্ভাবনে এ দেশগুলোর বিনিয়োগ বৈশ্বিক গড়ের চেয়েও কম।

কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি এবং বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশেরও বেশি পণ্য পরিবহন হয় সমুদ্রপথে, যার ফলে সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থা বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহন পৃথিবীব্যাপী ২০১৭ সালে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। ভবিষ্যতেও এই পণ্য পরিবহনের হার বাড়ার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান যে অবকাঠামো রয়েছে, ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণে তা কতটা সক্ষম, সে বিষয়টিও যাচাই করা প্রয়োজন।

২০১৮ সালে উন্নত ও উন্নয়নশীল–দুই ধরনের অঞ্চলেই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মন্দাভাব দেখা গেছে। এ মন্দাভাবের জন্য দায়ী বাণিজ্য ও শুল্ক বাধা, যা বিনিয়োগ ও ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করছে। মন্দাভাব সত্ত্বেও বৈশ্বিক জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের অবদান ২০০৮ সালের ১৫ দশমিক ৯ শতাংশের তুলনায় বেড়ে ২০১৫ সালে ১৬ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছেছে, কিন্তু ২০১৮ সালে এসেএকই জায়গায় স্থবির রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ভূমিকা এখনো অনেক কম। এর ফলে ২০৩০ সালে জিডিপির অর্ধেক শিল্প খাত থেকে আসার যে লক্ষ্য, তা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

এদিকে সার্বিক কর্মসংস্থানের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান ২০০০ সালে ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশে নেমেছে, যা ২০১৮ সালে আরও কমে ১৪ দশমিক ২ শতাংশে উপনীত হয়। এ জন্য দায়ী বিভিন্ন দেশে কৃষি ও কম মূল্য সংযোজিত ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে ক্রমে উচ্চ ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবার গুরুত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি।

ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে বৈশ্বিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড (সিওটু) নিঃসরণের তীব্রতা ২০০০ ও ২০১৬ সালের মাঝে ২০ শতাংশ কমে প্রতি মার্কিন ডলারে ০.৩০ কেজি সিওটু হয়েছে, যা জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কার্বন নিঃসরণের সংশ্লিষ্টতা কমে আসার ইঙ্গিত দেয়।

বৈশ্বিক গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে জিডিপির বিনিয়োগের অনুপাত ২০০০ সালের ১ দশমিক ৫২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ১ দশমিক ৬৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় জিডিপির ২ দশমিক ২১ শতাংশ গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় হয়। আর ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো এ ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ে বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে পিছিয়ে। প্রতি মিলিয়ন (১০ লাখ) মানুষের মধ্যে ২০০০ সালে গবেষকের সংখ্যা ছিল ৮০৪ জন। ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে এক হাজার ১৬৩ জনে দাঁড়িয়েছে। অথচ সাব-সাহারা আফ্রিকায় এ সংখ্যা পৌঁছেছে মাত্র ৯১ জনে।

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে মোট বৈদেশিক সহায়তা (অফিশিয়াল ফ্লো) বেড়ে ২০১৭ সালে ৫ হাজার ৯০০ কোটি (৫৯ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১০ সালের তুলনায় ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। এসবের মধ্যেসবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছে পরিবহন খাত। এ খাতে সহায়তার পরিমাণ ছিল ২১ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ব্যাংক ও আর্থিক সেবা খাত (১৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ২০১৬ সালে বৈশ্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনে মধ্য-উচ্চ ও উচ্চপ্রযুক্তির খাতগুলোর অবদান ছিল ৪৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মধ্য-উচ্চ ও উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যের প্রাধান্য দেখা গেছে, ২০১৬ সালে যা ছিল ৪৭দশমিক ৪ শতাংশ। বিপরীতে এলডিসি দেশগুলোতে এ হার ছিল মাত্র ১০দশমিক ৪ শতাংশ।

পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই এখন মোবাইল সেলুলার নেটওয়ার্ক সংকেতের মধ্যে বসবাস করে। তাদের ৯০ শতাংশ থ্রিজি কিংবা আরও উচ্চপ্রযুক্তির নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে গতি, তার চেয়েও বেশি গতিতে বিবর্তন হচ্ছে মোবাইল নেটওয়ার্কের।

বর্তমানে পৃথিবীতে ৪০০ কোটির বেশি মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই। তাদের ৯০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের বাসিন্দা। এরপরও বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা শহরে বাসকরায় গণপরিবহন এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব বাড়ছে। ফলে এসডিজি-৯ অর্জনে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থের জোগান, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা, গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মানুষের আরও বেশি অভিগম্যতা প্রয়োজন।

দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে বৈশ্বিক অর্থনীতির সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যকারিতায় একতরফা সংস্কারের মাধ্যমে। এছাড়া এতে ভূমিকা রাখছে অর্থনৈতিক সংহতি বাড়াতে বিভিন্ন আঞ্চলিক কৌশল, যেমন দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিসমূহ (এফটিএ)। অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো সফল হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য দূরীকরণে, সামাজিক সূচক উন্নয়নে, নতুন বিশেষায়িত বাজার তৈরি ও প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে। প্রবৃদ্ধি অর্জনে দক্ষিণ এশীয় অর্থনীতিগুলোর আন্তর্জাতিকীকরণ উদীয়মান চালিকাশক্তি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এগুলোকে অব্যাহত রাখার জন্য দরকার হবে সুবিধাজনক নীতি সহায়তা। এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ওউন্নয়নের জন্য অবকাঠামো খাতে আরও বেশি বিনিয়োগএবং উদ্ভাবনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি অধিবাসী শহরে বাস করে। ফলে গণপরিবহন ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব প্রতিনিয়তই বাড়ছে। ঠিক একইভাবে গুরুত্ব বড়ছে নতুন নতুন শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির।

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ নতুন কর্মসংস্থান ও জ্বালানি কার্যকারিতাকে জনপ্রিয় করার কথা বলা যায়। দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই উন্নয়ন সহজতর করার লক্ষ্যে প্রয়োজন টেকসই শিল্পায়ন এবং বিজ্ঞান গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ জনপ্রিয় করা।

৯.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ৯ অর্জনে অগ্রগতি পর্যালোচনা

সূচক ৯.১.১ক: প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটারে সড়কের ঘনত্ব

উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে অত্যাবশ্যক ভূমিকা থাকায় অবকাঠামোর নানা খাতে, যেমন–পরিবহন, জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, ভবন, বাঁধ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশ প্রচুর বিনিয়োগ করছে। যেহেতু দেশটি সমতল ভূমি, তাই এখানে তিন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিবেচনায় আনা হয়; যেমন–সড়ক পথ, রেলপথ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ। এ মাধ্যমগুলো যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সড়ক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০ গ্রহণ করা হয়েছে। রাস্তার ঘনত্ব হচ্ছে দেশের মোট সড়কের দৈর্ঘ্য এবং দেশের মোট ভূমি আয়তনের অনুপাত। দেশের সব রাস্তা, যেমন–মোটরওয়ে, মহাসড়ক, প্রধান ও জাতীয় সড়ক, সেকেন্ডারি ও আঞ্চলিক রাস্তা এবং শহর ও গ্রামের পথ এই সড়ক নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত। সারণি ৯.১-তে দেখা যাচ্ছে, ২০০০ সালে প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটারে পাকা সড়ক ছিল ১৪ দশমিক ০৯ কিলোমিটার। ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৪ দশমিক ৬১ কিলোমিটার। এ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, দেশের মধ্যে অন্তঃসংযোগ (কানেক্টিভিটি) বাড়ছে। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়ার আশা করা যায়, কারণ সরকারের অনেক বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প চলমান।

সারণি ৯.১: প্রতি ১০০ বর্গকিলোমিটারে রাস্তার ঘনত্ব

২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১৪.০৯	১৪.৪১	১৪.৪৮	১৪.৪৫	১৪.৬১

উৎস: আরএইচডি ও বিবিএসের তথ্য থেকে হিসাবকৃত

সূচক ৯.২.১: জিডিপির অনুপাতে (শতাংশ) ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মূল্য সংযোজন

বাংলাদেশে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মূল্য সংযোজনের হিস্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সরকারও নিরবচ্ছিন্নভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফলে প্রকৃত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ২১ শতাংশে, যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল ২২ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এ হার ২০ শতাংশের ওপরে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে।

শীর্ষ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পসমূহ, যেমন–তৈরি পোশাক, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ,ওষুধ ও চামড়ার প্রবৃদ্ধি দেশের প্রধান চালিকাশক্তি। এখন উৎপাদন ও রপ্তানিতে বৈচিত্র্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, কেননা বাংলাদেশ বর্তমানে এক হাজার ছয়শ'র অধিক আইটেমের পণ্য বিদেশে পাঠাচ্ছে। এই প্রবৃদ্ধি মূলত বড় ও মাঝারি শিল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেশে পাটজাত পণ্যের প্রাধান্য কমে আরএমজির কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছে, যা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের গঠনে লক্ষণীয় পরিবর্তন। এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে সরকারের সহায়তাপূর্ণ নীতির সুবাদে, যার মধ্যে রয়েছে আর্থিক প্রণোদনা, বাণিজ্য অংশীদারিত্বের সুবিধাজনক নীতি (এমএফএ, জিএসপি ও কিউএফডিএফে প্রবেশাধিকার)। এছাড়া উদ্বৃত্ত শ্রমের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকায় অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়, যা ম্যানুফাকচারিং খাতে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে।

সারণি ৯.২: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের অবদান (শতাংশ)

২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
১৬.১৩	১৭.৭৫	২০.১৬	২১.০১	২১.৭৪	২২.৮৫	২৪.২১

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন বছর

সূচক ৯.২.১: ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মাথাপিছু মূল্য সংযোজন (২০১০ মার্কিন ডলার স্থিরমূল্যে)

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শ্রমিকপ্রতি মূল্য সংযোজন হিসাব করা হয় ধ্রুবক ২০১০ মার্কিন ডলার স্থিরমূল্যে, ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনকে এখাতে নিয়োজিত মোট শ্রমিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। ২০১৩ সালে সাময়িক ব্যতিক্রম বাদে, বাংলাদেশে মাথাপিছু ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজন ২০০২-০৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে।

সারণি ৯.৩: জনপ্রতি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মূল্য সংযোজন (স্থিরমূল্যে ২০১০ মার্কিন ডলার)

২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০	২০১৩	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
২৪৭৯	২৬৩৫	২৭৭৪	২৬০৭	৩৮৭৭	৪২১০

সূত্র: বিশ্বব্যাংকের জিডিপি ডেটা, বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে বিভিন্ন বছরের তথ্য হিসাব করে।

সূচক ৯.২.২: মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কর্মসংস্থান (শতাংশ)

বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত গত দুই দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ খাতের বস্ত্র, তৈরি পোশাক, পাটজাত পণ্য ও চামড়া শ্রমঘনিষ্ঠ। ফলে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কর্মসংস্থান দ্রুত বেড়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সুবাদে এ খাতে বেশি অনুপাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানের অবদান দুই বছর ধরে স্থবির। যদি এ ধারা অব্যাহত থাকে, ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত মাইলফলক অর্জন কঠিন হতে পারে। এভাবে যখন জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের অবদান বাড়ে, তখন যদি ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মীদের উৎপাদনশীলতার প্রাধান্য থাকে, তাহলে মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতেএ খাতে কর্মসংস্থান কমে যেতে পারে। জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১৫-এর সুপারিশমালা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার পণ্য প্রস্তুতকারক (নিয়োগের শর্ত) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করেছে।

সারণি ৯.৪: মোট কর্মসংস্থান অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থান (শতাংশ)

২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০০৯	২০১০	২০১৩	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
৯.৭১	১১.০৩	১৩.৫৩	১২.৪৬	১৬.৪	১৪.৪	১৪.৪

সূত্র : বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ, ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ বিভিন্ন বছর

সূচক ৯.৫.২: প্রতি ১০ লাখ (এক মিলিয়ন) অধিবাসীর মধ্যে (পূর্ণকালীন) গবেষকের সংখ্যা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক বিজ্ঞান-গবেষণা এবং টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশ পিছিয়ে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বিশেষ করে রপ্তানিভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাত আমদানিকৃত প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে তাদের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ একটি ইউনিট তৈরির উৎসাহ থাকে না বললেই চলে। তবে সারণি ৯.৫-এ দেখা যাচ্ছে, প্রতি মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে গবেষকের সংখ্যা বাড়ছে।

সারণি ৯.৫: প্রতি মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে (পূর্ণকালীন) গবেষকের সংখ্যা

২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
৫.৫৬	৫.৬৬	৫.৬৯	৫.৯৮	৬.১৬	৬.৬৩

সূত্র: বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূচক ৯.ক.১: অবকাঠামো খাতে মোট আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক সহায়তার পরিমাণ, ওডিএ এবং অন্য সরকারি অর্থপ্রবাহ

জরুরি অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার জ্বালানি, সড়ক, সেতু, রেলপথ, নদীবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দরসহ নানা খাতে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন সহযোগীরাও বাংলাদেশের অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়নে সহায়তা করছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশের রেলপথ, সড়ক ও সেতু এবং বন্দর ও শহরের অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। এদিকে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক, জাইকা ও এডিবির উপস্থিতিও লক্ষণীয়। সারণি ৯.৬-তে দেখা যাচ্ছে পরিবহন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বিজ্ঞান ও আইসিটি খাতে সহায়তার পরিমাণ। এগুলোর মধ্যে পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতের অংশ বেশি। তবে অবকাঠামো খাতে আন্তর্জাতিক সহায়তায় উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে ২০১৫ সাল বাদে। আর ২০১৮ সালে উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বোচ্চ সহায়তা পাওয়া গেছে (সারণি ৯.৭)।

সারণি ৯.৬: অবকাঠামো খাতে সহায়তার ছাড় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
পরিবহন	২৪৩.৫১	২৮৩.৩৩	৭০৫.৯২	৩৮৯.২৩
বিদ্যুৎ	৩৬২.২৯	৫৬২.৪০	৫১০.৭৯	৯৫৩.৪৩
জ্বালানি	৩.৭৭	৪.২৭	৩৭.৯৩	৭১.১৩
বিজ্ঞান ও আইসিটি	২৩.৫৬	০.২২	...	...
মোট সহায়তা ছাড় (%)	২০.৮১	২৩.৮৬	৩৪.১২	২২.১৯

সূত্র: এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এইমস), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)

সারণি ৯.৭: অবকাঠামো খাতে ২০১২ থেকে ২০১৮ সালে মোট আন্তর্জাতিক সহায়তা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
৮১৩.১	১১৬৭.৪	১৫৮০.২	১২৪৭.২	১৭৩৬.৫	৬.৬৩	৪০৪১

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সূচক ৯.খ.১: মোট মূল্য সংযোজনে মধ্য ও উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পের মূল্য সংযোজনের অনুপাত

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ছাড়া শিল্পায়ন ঘটবে না, আর শিল্পায়ন ছাড়া উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না। আরও বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন মধ্য ও উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যে- উৎপাদনখাতে কার্যকারিতা বাড়াতে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সারণি ৯.৮ দেখাচ্ছে বিভিন্ন সালে মোট মূল্য সংযোজনে মধ্য ও উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পের মূল্য সংযোজনের অনুপাত।

সারণি ৯.৮: মোট মূল্য সংযোজনে মধ্য ও উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পের মূল্য সংযোজনের অনুপাত (শতাংশ)

২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
১৪.৬১	১২.৬৪	১২.২৬	১২.৬৫	১২.৭৯	১২.৮৫	১১.৫৭	১১.৫৪

উৎস: এনএডব্লিউ, বিবিএস, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সূচক ৯.গ.১: প্রযুক্তি দ্বারা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

বাংলাদেশে প্রথম ১৯৯০ সালে মোবাইল ফোনের প্রচলন শুরু। পরবর্তীকালে দেশে ১৯৯২ সালে টুজি চালু হয়। আরও পরে থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু হওয়ায় দ্রুতগতিতে তথ্য আদান-প্রদান ও ভিডিও কল করার সুবিধা পাওয়া যায়। দেশে ফোরজি উন্মোচন হয় ২০১৮ সালে। ২০১৯ সালে প্রায় শতভাগ মানুষ টু-জি প্রযুক্তির আওতায় আসে। একই সময়ের মধ্যে থ্রিজির আওতায় আসে ব্যবহারকারীর ৯২ শতাংশ,যা ২০২০ সালের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। জুন ২০১৯ নাগাদ ফোরজির আওতায় এসেছে ৭৯ শতাংশ সেলফোন গ্রাহক।

সারণি ৯.৯: প্রযুক্তি দ্বারা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

প্রযুক্তি	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯ (জুন পর্যন্ত)
টুজি	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯.৪	৯৯.৪৬	৯৯.৪৯	৯৯.৫৪	৯৯.৬০
থ্রিজি	...	...	...	৭১.০	৯০.২	৯২.৫৫	৯৫.২৩	৯৫.২৩
ফোরজি	...	...	...	...	...	...	...	৭৯.০০

সূত্র: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

৯.৩ এসডিজি-৯ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

সরকারি প্রচেষ্টায় অবকাঠামো ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করাকে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ শহরে বাস করে। এজন্য গণপরিবহন ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব বাড়ছে। একই সঙ্গে আওতা বাড়ছে নতুন শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির। সরকারি নীতিমালায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, যা অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই সমাধান দিতে পারে। যেমন: নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জ্বালানি কার্যকারিতাকে জনপ্রিয় করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সহজতর করার লক্ষ্যে টেকসই শিল্প জনপ্রিয় এবং বিজ্ঞান-গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সরকার সার্বিক নীতি কাঠামোয় অগ্রাধিকার দিচ্ছে অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদানে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের দুই লাখ তিন হাজার (২.০৩ ট্রিলিয়ন) কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটে (এডিপি) পরিবহন অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৫ শতাংশ বা ৫৮ হাজার ২০০ (৫৮২ বিলিয়ন) কোটি টাকা। বরাদ্দে এর পরই রয়েছে বিদ্যুৎ খাত। এ খাতে বরাদ্দ ২৬ হাজার ১৭ কোটি (২৬০ দশমিক ১৭ বিলিয়ন) টাকা। সড়ক ও জনপথ বিভাগের সম্পদমূল্য রক্ষা, সংযোগ বাড়ানো ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে সড়ক খাত মহাপরিকল্পনায় (২০১০-২০৩০) প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দেশের মধ্যে সংযোগ (কানেক্টিভিটি) বাড়ানোর লক্ষ্যেএকদিকে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিটের (এমআরটি) মতো প্রকল্পগুলো চলমান, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রুট বাড়ানোর লক্ষ্যেও উদ্যোগ রয়েছে। এডিবি, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং দ্য আবুধাবি ফান্ডের অর্থায়নে গৃহীত 'বাংলাদেশ: দক্ষিণ এশিয়া উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সড়ক সংযোগ (সাসেক' প্রকল্প ঢাকার উত্তর-পশ্চিম করিডোরের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। আঞ্চলিক পরিবহন করিডোরে উন্নীত করার সুবাদে বাংলাদেশে এক কোটি ৮০ লাখ (১৮ মিলিয়ন) টন পণ্য স্থানান্তর সহজ হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের পাশাপাশি এটি আঞ্চলিক সহযোগিতাও বৃদ্ধি করবে।

জাইকার অর্থায়নে 'আন্তঃসীমান্ত সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প' বা 'ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবহন ও লজিস্টিক নেটওয়ার্ক আরও উন্নত করবে বলে আশা। এখানে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সড়কের উন্নয়ন সার্বিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের বাণিজ্য আরও দ্রুততর করবে।

শিল্প স্থাপনের জন্য আড়াই হাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দ পেয়েছে জাপান (১৬০)। আর ভারত পেয়েছে বাগেরহাট, কুষ্টিয়া ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে (১৬১)। অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ওইসব এলাকায় কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনা করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা আঞ্চলিক ও বিদেশি বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

সাসেক রেলপথ সংযোগের অধীনে 'আখাউড়া-লাকসাম ডবল ট্রাক প্রজেক্ট'-এ অর্থায়ন করছে এডিবি। এ প্রকল্প ট্রান্স এশিয়া রেলওয়ে নেটওয়ার্কের উপ-আঞ্চলিক অংশ হিসেবে ৭২ কিলোমিটার করিডোর তৈরি করবে।

৯.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে এসডিজি-৯ বাস্তবায়নে কতগুলো মৌলিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবসা পরিচালনায় উচ্চ ব্যয়, গুণগত অবকাঠামোর অভাব, ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতা, ভূমি সংকট ব্যবস্থাপনা, দক্ষ মানবসম্পদের অভাব, এফডিআই আকর্ষণে সীমাবদ্ধতা, কার্যকর পরিষেবা গ্রহণে সীমিত সুযোগ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে সীমাবদ্ধতা।

সড়ক পরিবহন খাত উন্নয়নে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান-সম্পর্কিত জটিলতা মোকাবিলা করতে হয়। আরও যেসব প্রাসঙ্গিক বিষয় দ্রুত ও যথাযথভাবে সুরাহা করা দরকার, তার মধ্যে রয়েছে সড়ক নির্মাণ প্রযুক্তি, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, সঠিক তথ্য ও অ্যাক্সেল লোড। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে দরকার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত রাস্তা, সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য, ব্যবহারকারীদের মাঝে সচেতনতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদান। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নে খুব বড় চ্যালেঞ্জ হলো সক্ষমতার অভাব, যা প্রকল্প সম্পন্ন করতে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করে। প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন ধীরগতিসম্পন্ন হওয়ায় পরবর্তীকালে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায় এবং এ থেকে বিনিয়োগের বিপরীতে সুফল কম পাওয়া যায়। অপ্রতুল ব্যবস্থাপনার কারণে অবকাঠামো থেকে সেবার ওপর নির্ভরতা এবং গুণগত মান প্রভাবিত হয়, যা প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিল্পায়নের সুফল টেকসই করার জন্য বাংলাদেশে শ্রমনীতি ও পরিবেশগত বিষয় প্রতিপালনের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে এসডিজি-৯ অর্জনে দরকার দক্ষতার সঙ্গে বাজার পরিচালনা এবং অব্যাহতভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সংকেত প্রদান ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশের আরও বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছতার মধ্যে আনা, সরকারি উদ্যোগগুলোকে অর্থনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপালন করা, যেন আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে সর্বোত্তম অনুশীলন করা যায়। গবেষণা ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং টেকনোলজি ট্রান্সফার ও উদ্ভাবনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এছাড়া বিভিন্ন নীতি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যেকার্যকর ও সময়োপযোগী সমন্বয়সাধন চ্যালেঞ্জিং। পরিণতিতে বিভিন্ন পলিসির প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়না।

৯.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশ এসডিজি ৯ অর্জনে তুলনামূলকভাবে ভালো উন্নতি করেছে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে এই অভীষ্ট অর্জনে অগ্রগতির হার আরও ত্বরান্বিত করা আবশ্যক। বাংলাদেশের জন্য সংযোগ (কানেকটিভিটি) খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মধ্যে পরিবহন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ কিছু বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রেল, সড়ক ও সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন; ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা ও খরচ কমানো এবং কাগজবিহীন বাণিজ্য ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজন আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং জাতীয় পর্যায়ে নানা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন। উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয় নীতি আলোচনায় খুব গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

২০৩০ সাল নাগাদ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বাংলাদেশের একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন এবং একইভাবে এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সফলতার গল্পের ওপর নির্ভর করে একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনাও প্রয়োজন, যা এতদসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ উপশমে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের পক্ষে এসডিজি ৯ অর্জনে অর্থায়ন করা, বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। বাড়তি অর্থায়নের জন্য বহুমুখী ও উদ্ভাবনী কৌশল ও মডেল অনুসন্ধানে জোর দিতে হবে, যে কৌশলগুলোতে সরকারি সম্পদ ব্যবহার করা হয়। অভিঘাতসহনশীল ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নেএ ধরনের অর্থায়ন প্রয়োজন। এ ধরনের অবকাঠামো ও প্রযুক্তি একঘেয়েমিও সময়ক্ষেপণ কমায়, কার্বন নিঃসরণ কমায় এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে। এসব বিষয় এসডিজি-৯ অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পানির পাম্প, মিনি গ্রিড, বিদ্যুৎ ও পরিবেশবান্ধব চুলার কথা।

অর্থায়নের মডেল ও অন্য কৌশলগুলো যেন নারীদেরও আর্থিকভাবে ক্ষমতাশালী করতে পারে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য প্রয়োজন নারী উদ্যোক্তা ওব্যবসায় নারী স্বত্বাধিকারীকে সহায়তা দেওয়া এবং এমনভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করা উচিত, যা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। স্থানীয় অবকাঠামো ও উদ্যোক্তাদের মাঝে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হলে তা নারীদের অমূল্যায়িত কাজের বোঝা লাঘব করতে পারে। এতে বাজার ব্যবস্থাও সম্পদে নারীর অভিগম্যতা বাড়তে পারে। গ্রামীণ সড়কে বিনিয়োগ করা হলে তানারীর স্বাধীনভাবে চলাফেরা সহজতর করে। এমনকি এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে বেসরকারি খাতের উৎপাদনশীলতা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্কুল এনরোলমেন্ট, স্বাস্থ্যসেবায় অধিগম্যতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে।

বাংলাদেশে অবকাঠামো, পরিবহন, সেচ জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনও সব সম্প্রদায়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে। উৎপাদনশীলতা ও আয়ে প্রবৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়নে দরকার অপরিহার্য অবকাঠামোয় বিনিয়োগ। বাংলাদেশে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এরইমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এছাড়া পরিবেশগত লক্ষ্য, যেমন সম্পদের ব্যবহার ও জ্বালানি কার্যকারিতা অর্জনে যে প্রচেষ্টা রয়েছে, তার বুনিয়াদে রয়েছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ছাড়া শিল্পায়ন হবে না। আর শিল্পায়ন ছাড়া বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন ঘটবে না। কার্যকারিতা বাড়াতে বাংলাদেশের আরও বেশি বিনিয়োগ করা প্রয়োজন অতি উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যে, যার প্রাধান্য রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে। একইসঙ্গে মোবাইল সেলুলার সেবায় মনোযোগ বাড়াতে হবে, কেননা এটি মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ায়।

৯.৬ সারকথা

এসডিজি ৯ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা একদিকে নির্ভর করে অবকাঠামো, যেমন সব ধরনের পরিবহন ও আইসিটির ওপর; অন্যদিকে তা নির্ভর করে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর। এক্ষেত্রে অর্থায়ন, বাস্তবায়নকারী সংস্থার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা ও জমি অধিগ্রহণ-বিষয়ক জটিলতা হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জ। যেহেতু প্রাকৃতিক বিপর্যয়গত ভঙ্গুরতা বিদ্যমান এবং তা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাই বাংলাদেশ গুরুত্ব দিচ্ছে অভিঘাত-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে।

একইভাবে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই হতে হবে। বাংলাদেশে আয়ের সুযোগ তৈরি ও প্রত্যেকের জীবনমান উন্নত করার প্রাথমিক মাধ্যম হচ্ছে শিল্পোন্নয়ন। শিল্প ও সামাজিক রূপান্তরের সুযোগ করে দেয় অবকাঠামো। আর প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রসার ও নতুন দক্ষতা উন্নয়নে পথ দেখায় উদ্ভাবন।

বর্তমানে সারা বিশ্ব শিল্পায়ন অটোমেশন ও নতুন প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে, যা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা 'ফোরআইআর'নামে পরিচিত। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্স। এই পরিবর্তন গতানুগতিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন ও সেবা দেওয়ার ধারাবাহিকতায় দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। আর এই পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দুটোই তৈরি করবে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বর্তমান শিল্পায়ন প্রবণতার মূল, যা বাংলাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবকাঠামো ও অভিঘাত-সহনশীল উন্নয়নের ভিত্তি হতে পারে। বাংলাদেশে এসডিজি ৯ বাস্তবায়নে সামনের বছরগুলোতে উন্নয়ন পরিকল্পনা, পলিসি ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোয় সচেতন হতে হবে।

১০

অসমতা হ্রাস

দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমানো

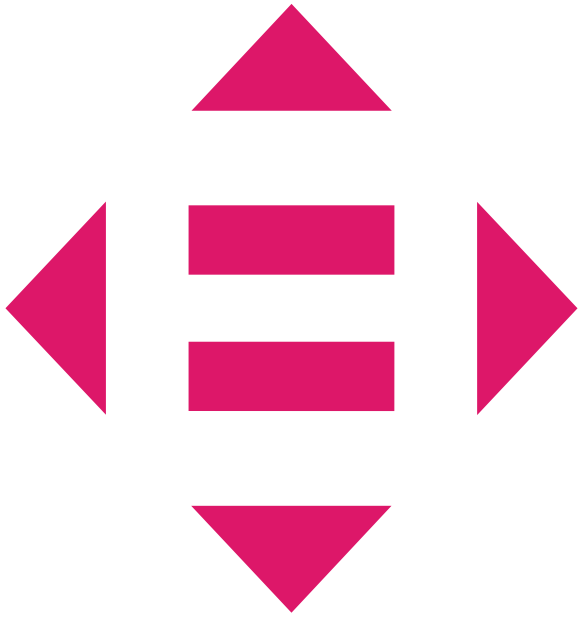

১০.১ এসডিজি ১০ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

এসডিজির মৌলিক লক্ষ্যগুলোর একটি দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্য কমানো। এসডিজি কাঠামোয় বৈষম্য মোকাবিলাকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা বৈষম্য কমানো গেলে তা সত্যিই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত এবং মানুষের উন্নতিকে সুদৃঢ় ও সর্বজনীন কল্যাণের দিকে চালিত করতে পারে।

সুযোগ, আয় ও ক্ষমতার বৈষম্য দূরীকরণে নানা প্রচেষ্টায় সফলতা সত্ত্বেও পৃথিবীজুড়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা এখনো ব্যাপক উদ্বেগের বিষয়। দেশগুলোর মাঝে নাটকীয়ভাবে বৈষম্য হ্রাস পাওয়ায় গত কয়েক দশকে পৃথিবীজুড়ে ধারাবাহিকভাবে আপেক্ষিক অসমতা কমেছে। তবে নিরঙ্কুশ অসমতা পরিমাপে দেখা যায়, গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আয়বৈষম্য ধারা অব্যাহত রয়েছে, যদিও পৃথিবীজুড়ে সম্পদের ভিত্তিতে নিচের দিকের ৪০ শতাংশ মানুষ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হারের অভিজ্ঞতা পেয়েছে।

'বৈশ্বিক সম্পত্তি প্রতিবেদন, ২০১৬' অনুযায়ী দুনিয়াব্যাপী সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয় সবচেয়ে ধনী এক শতাংশ এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের সম্পদের বিপরীতে পৃথিবীর বাকি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সম্পদের তুলনা করে। তলানির অর্ধেক মানুষ সামষ্টিকভাবে সব সম্পদের মাত্র এক শতাংশের মালিকানা ভোগ করে। এর বিপরীতে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের মালিকানায় ৮৯ শতাংশ সম্পদ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ৩ কোটি ৩০ লাখ (৩৩ মিলিয়ন) মানুষ, (যা মোট জনসংখ্যার ০.৭ শতাংশ) ১১৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ সম্পদের মালিক। এই সম্পদ পৃথিবীর মোট সম্পদের ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ। অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিদের প্রত্যেকে এক মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি পরিমাণ সম্পদের মালিক। বিপরীত দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র ৩৫০ কোটি (৩.৫ বিলিয়ন) বা মোট জনসংখ্যার ৭৩ শতাংশ মানুষ ৬ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদের মালিক। তাদের মাথাপিছু সম্পদ ১০ হাজার মার্কিন ডলারেরও কম।

২০১১-১৬ মেয়াদে ৯২টি দেশের তথ্য বিবেচনা করা হয় প্রতিবেদনে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি দেশের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিচের দিকে ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা সার্বিকভাবে জাতীয় গড়ের চেয়েও বেশি প্রবৃদ্ধির হারের অভিজ্ঞতা পায়। তবে নিচের ৪০ শতাংশ সার্বিক আয় বা ভোগের ২৫ শতাংশ পেয়েছে। অনেক দেশে আয়ের অধিকাংশই শীর্ষ এক শতাংশ ধনী লোকের হাতে যাচ্ছে, যা গভীর উদ্বেগের বিষয়। আন্তঃদেশীয় আয়বৈষম্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যের চেয়ে অনেক বেশি। এর পরিণতি হলো দেশে দেশে যে অসমতা বিরাজ করছে, তার চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে পৃথিবীব্যাপী অসমতার ধারা।

অতীতে বিশ্বব্যাপী মাথাপিছু আয়ের বিতরণ থেকে ধনী ও গরিব দেশের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন বোঝা যেত। আর দেশে দেশে পার্থক্য থেকে অন্যান্য উন্নয়ন সূচক, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অসমতা সম্পর্কে জানা যেত। তবে বর্তমান শতাব্দীতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পার্থক্য আরও অস্পষ্ট হচ্ছে। এর কারণ অনেক দেশে অসাধারণ পর্যায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। এছাড়া পৃথিবীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভৌগোলিকভাবে এখন আর একই জায়গায় আটকে নেই। ক্রমেই তা পৃথিবীব্যাপী উৎপাদনের নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর্থিক সেবায় সমানভাবে প্রবেশাধিকারের সহায়তা দিতে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ আর্থিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। ব্যাংকিং ব্যবস্থার শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমানতের বিপরীতে উচ্চমাত্রার ঋণ বিতরণ বা 'উচ্চঋণ সম্পদ প্রতিবন্ধকতা' (High Loan Asset Impairment) একটি সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ। এই প্রতিবন্ধকতা পরিমাপ করা হয় খেলাপি ঋণ ও আমানত গ্রহীতাদের মোট ঋণের অনুপাত থেকে। তথ্য সংগ্রহ করা ১৩৮টি দেশের প্রায় অর্ধেক দেশে মোট ঋণের মধ্যে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৫ শতাংশের কম। ২০১০-১৭ মেয়াদে খেলাপি ঋণের গড় মধ্যমা ছিল ৪ দশমিক ৩শতাংশ ।

উন্নয়নশীল দেশগুলো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও ডব্লিউটিওতে ৭০ শতাংশের বেশি প্রতিনিধিত্ব করে। অথচ এই দেশগুলোর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভোট দেওয়ার অধিকার অনেক সীমিত। শুধু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও ডব্লিউটিওতে সদস্যপ্রতি একটি ভোট দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। আইএমএফে শাসন প্রক্রিয়ায় সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকে কিছু পরিবর্তন গ্রহণ করা হয়। এই পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভোটাধিকার ৪০শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। এর পরও অন্য দেশের তুলনায় বিশ্বব্যাংকে এই দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব ৭৫ শতাংশের কম।

মোটাদাগে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি), উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহও উন্নয়নশীল অঞ্চলের জন্য শুল্কমুক্ত (ডিউটি ফ্রি) প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। উন্নয়নশীল দেশ থেকে বর্তমানে ৫০ শতাংশের বেশি পণ্য রপ্তানি হচ্ছে ডিউটি ফ্রি সুবিধার আওতায়। বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বেশি শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায় এলডিসিভুক্ত দেশগুলো। বিশেষ করে এসব দেশের শিল্প ও কৃষি খাত

এ সুবিধা বেশি পায়। ২০১৭ সালে ওইসিডির উন্নয়ন সহায়তা কমিটি বা ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি (ড্যাক) ও অন্যান্য বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ঋণ, অনুদান ও মঞ্জুরি বাবদ ৪১ হাজার ৪০০ কোটি (৪১৪ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ছাড় করে। এর মধ্যে ১৬ হাজার ৩০০ কোটি (১৬৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ছিল আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ)।

দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নতির পথে বাধা অসমতা। এর ফলে অনেকে দারিদ্র্যের শিকার এবং অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০০ সালের শেষ দিকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ধনীদের এক-পঞ্চমাংশের সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করার সম্ভাবনা দরিদ্রদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি ছিল।

অনেকেই এখন একমত, দারিদ্র্য দূরীকরণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। প্রবৃদ্ধির সুফল পেতে হলে তা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং এর মধ্যে টেকসই উন্নয়নের তিনটি বিষয়, যেমন অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশকে সম্পর্কিত করতে হবে। বাড়তে থাকা বৈষম্য মানোন্নয়নকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। অসমতাকে আমলে নিয়ে তৈরি মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়া বৈষম্যের কারণে এইচডিআই'র ২৫ শতাংশ মান হারায়। বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে প্রণীত নীতিগুলো সর্বজনীন হতে হবে। এখন মনোযোগ দিতে হবে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের প্রয়োজনের দিকে। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোয় সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব বয়সি মানুষ, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিকরণকে সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে।

অসমতা অবধারিত কোনো বিষয় নয়। বর্তমান বৈষম্যগুলোর মধ্যে বেশিরভাগের জন্যই দায়ী বিদ্বেষমূলক নীতিনির্ধারণ। বর্তমানে যে বিমাতাসুলভ করনীতি বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান, তা সংস্কারে নীতিনির্ধারকদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এ সংস্কারে সাধারণ করপোরেট কর কমানোর উদ্যোগ থাকতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশনে অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং দরিদ্রদের উন্নয়নে সরকারের স্বল্প বিনিয়োগ চরম বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর একটি কারণ হলো কর ফাঁকি, অন্যটি হলো বিদেশে অর্থপাচার। বিশ শতকে কিছুদিনের জন্য কমলেও বর্তমান বৈষম্য পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এমনকি ধনী দেশও ব্যতিক্রম নয়। বৈষম্য কমানোর জন্য একটি পরামর্শ হলো সম্পদ কর চালু করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে সম্মত হতে হবে। যেহেতু সম্পদ কয়েক প্রজন্ম ধরে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, সেহেতু স্বচ্ছ ও সুপরিকল্পিত সম্পত্তি কর দীর্ঘমেয়াদে চরম অসমতা দূর করতে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সরকার জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারে। ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পত্তি কুক্ষিগত এবং শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন না হওয়ার পরিণতি হচ্ছে নামমাত্র ও জীবনধারণে প্রয়োজনের চেয়ে কম মজুরি। এটিও অসমতাভিত্তিক সমাজের চিহ্ন।

১০.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১০ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সব সময় বৈষম্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়। ২০১৬ সালে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে জিনি সহগে (কোইফিশিয়েন্ট) বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ০.৪৮৩। গ্রামীণ এলাকায় তা ০.৪৯৮ এবং শহর এলাকায় ০.৪৫৪। চিত্র ১০.১-এ ১৯৬৩ সাল থেকে আয় অসমতার ধারা দেখানো হয়েছে। এ সূচকে মান এক বা এর কাছাকাছি থাকলে চরম বৈষম্য নির্দেশ করে।

১৯৬৩ থেকে ২০০০ সালের পুরো সময়ে জাতীয় জিনি ০.৩৬ থেকে বেড়ে ০.৪৮৩ দাঁড়িয়েছে, যা ৩৪ শতাংশের চেয়ে বেশি। একই সময়ে গ্রামীণ জিনি বেড়েছে ৩৮ শতাংশ এবং শহরে তা ২১ শতাংশ। এই সংখ্যাগুলো থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ জিনি সহগ গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেড়েছে। অর্থাৎ সমাজে আয়বৈষম্য বেড়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ১৯৯০ থেকে ত্বরান্বিত হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় বৈষম্য অনেকটা দ্রুত বেড়েছে। সেই তুলনায় শহর এলাকায় আয়বৈষম্যে মোটামুটি পর্যায়ের বৃদ্ধি দেখা গেছে।

চিত্র ১০.১: বাংলাদেশে আয়ের জিনি সহগ, ১৯৬৩-২০১৬

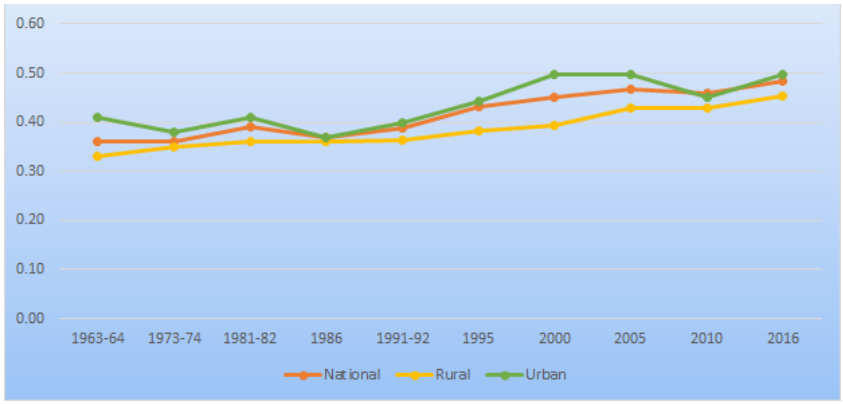

সূত্র: এইচআইইএস, বিভিন্ন বছর

গত কয়েক দশকে বস্তুগত অর্জনের একাধিকসূচকে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে ভালো মানের উন্নতি করেছে। উদাহরণস্বরূপ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। তবে তা সার্বিক চিত্রের একটিমাত্র অংশ। যদিও বর্তমান বাংলাদেশ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ধনী, কিন্তু প্রায় চার কোটি (৪০ মিলিয়ন) মানুষ এখনো দরিদ্র। সবচেয়ে ধনী পাঁচ শতাংশ পরিবার দেশের মোট আয়ের প্রায় ২৮ শতাংশ পায়। নিচের দিকে থাকা পাঁচ শতাংশ পায় মাত্র শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। দেশে সার্বিকভাবে মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। তা সত্ত্বেও প্রসবের সময় শহরের নারীর চেয়ে গ্রামীণ নারীর মৃত্যুঝুঁকি তিনগুণ বেশি। সামাজিক সুরক্ষার আওতা বেড়েছে। তবুও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাতে অন্যদের তুলনায় বাড়তি ব্যয়ের বোঝা টানার আশঙ্কা পাঁচ গুণ বেশি। বর্তমানে নারীরা আরও বেশি হারে কর্ম খাতে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু ভঙ্গুর কর্মসংস্থানে তাদের প্রতিনিধিত্ব সামঞ্জস্যহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে মানবতা ব্যাপকভাবে বিভাজিত থাকছে।

অনেকেই একমত যে, আয়বৈষম্যের চরম পরিস্থিতি বোঝার জন্য সেরা সূচক হচ্ছে পালমা রেশিও। এতে অসমতার চরম পরিস্থিতির দিকে আলোকপাত করা হয়, যেখানে সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে কম আয়ের অনুপাত জানা যায়। বাংলাদেশে (চিত্র ১০.২) চরম পর্যায়ের কিছু পরিবর্তন অবশ্য লক্ষণীয়। মাঝামাঝি পর্যায়ে আয়ের অংশ অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল। দেখা যাচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ে পালমা রেশিও ১৯৬৩-৬৪ সালে ১.৬৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ২০১৬ সালে ২.৯৩-এ পৌঁছেছে। নগর অঞ্চলে এটি ২.০০ থেকে ২.৯৬ পর্যন্ত বেড়েছে। আর একই সময়ে তা গ্রাম এলাকায় ১.৩৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ২.৫১।

চিত্র ১০.৩-এ জাতীয় পর্যায়ে আয় বিন্যাসে সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশ, মধ্যম পর্যায়ের ৫০ শতাংশ ও সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের আয়ের অংশ দেখানো হচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, মধ্যম পর্যায়ের ৫০ শতাংশের হিস্যা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল। দরিদ্র ৪০ শতাংশ মোট আয় থেকে তাদের আনুপাতিক হিস্যা হারাচ্ছে। সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ সুবিধা পাচ্ছে। নীতিনির্ধারণে উপনীত হওয়ার সময় বাংলাদেশের উচিত হবে 'চরম' অসমতার দিকে মনোনিবেশ করা। মনে রাখতে হবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ বৈষম্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। বিষয়টি সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও অসুবিধাজনক।

চিত্র ১০.২: বাংলাদেশ পালমা রেশিও, ১৯৬৩-২০১৬

নোট: তথ্যের সীমাবদ্ধতা থাকায় এ রেশিও গঠন করা হয়েছে সার্বিক খানা/পরিবারের আয়ের ভিত্তিতে, মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে নয়।

সূত্র: এইচআইইএস উপাত্ত ব্যবহার করে জিইডির হিসাব

চিত্র ১০.৩: জাতীয় পর্যায়ে মোট খানা আয়ে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী জনগোষ্ঠীর (ডিসাইলের)অংশ/হিস্যা, ১৯৬৩-২০১৬

সূত্র: এইচআইইএস উপাত্ত ব্যবহার করে জিইডির হিসাব

খানার আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপের তথ্য অনুসারে, ভোগবৈষম্যের চেয়ে আয়বৈষম্য বেশি। আর ভোগবৈষম্যের অনুপাতে আয়বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে। এতে বোঝা যায়, আয় ও ভোগে একই দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হলে ভোগদারিদ্র্য কমানোর চেয়ে আয়দারিদ্র্য কমানো ধীরগতির হবে। সবার জানা আছে, বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে সামাজিক সূচকগুলো বিভিন্ন রকম হয়। তবে তা বিভিন্ন আয়গোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, এমনকি তা একই দেশের ক্ষেত্রে হলেও। সারণি ১০.১-এ দেখানো হচ্ছে প্রকট সামাজিক বৈষম্য, যা বাংলাদেশে জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে ধনী জনগোষ্ঠীর (কুইন্টাইল) মধ্যে বিরাজ করছে।

সারণি ১০.১: বাংলাদেশে সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে ধনী শ্রেণির জন্য নির্বাচিত সামাজিক সূচকসমূহ

সূচক	জনগোষ্ঠী (কুইন্টাইল)	
	সবচেয়ে দরিদ্র (নিচের ২০%)	সবচেয়ে ধনী (নিচের ২০%)
পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের অপুষ্টির শতকরা হার	৪৫	১৭.৪
নবজাতক মৃত্যুহার	৪৩	২৪
পাঁচ বছরের নিচে শিশুর মৃত্যুহার	৫৩	৩০
মোট উর্বরতার হার	২.৮	২
কিশোরী মা (১৫-১৯ বছরের নারীর শতাংশ)	৪১.১	২২.৯
প্রশিক্ষিত সেবাদাতা থেকে শিশুর জন্মপূর্ব সেবা গ্রহণকারী নারীর হার	৩৫.৬	৯০
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রসবকারী নারীর হার	১৪.৯	৭০.২
খানাপ্রতি পুরুষের শিক্ষাগত অর্জন (মাধ্যমিকের ওপরে)	২	৩১
খানাপ্রতি নারীর শিক্ষাগত অর্জন (মাধ্যমিকের ওপরে)	১.১	২১.২

সূত্র: জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৪, বিবিএস

এ সারণিতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্য মৌলিক খাত উল্লেখযোগ্যভাবে আয় ও সম্পদের সঙ্গে জড়িত। বিবিএসের 'ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০১৪'-এর তথ্য অনুসারে, সবচেয়ে দরিদ্রদের মাঝে পাঁচ বছর বয়সি ৪৫ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। বিপরীতে ধনীদের মধ্যে এ হার ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০১৪ সালে দরিদ্রদের মাত্র ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ প্রশিক্ষিত সেবাদাতা থেকে প্রসব-পূর্ব যত্ন পায়। আর ধনী পরিবারে এ হার ৯০ শতাংশ। মাত্র ১৫ শতাংশ দরিদ্র নারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রসবের সুযোগ পান। ধনীদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা পায় প্রায় ৭০শতাংশ।

১০.১.১ জাতীয় পর্যায়ে আয় বিন্যাসে সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশ জনগণ এবং মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু খানা আয় ও ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার

জাতীয় পর্যায়ে আয় বিন্যাসে সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশ জনগণ এবং মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু খানা আয়ের তুলনা একটি দেশের অর্থনীতিতে আয়ের বন্টন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার আয়সীমার সবচেয়ে নিম্নে বসবাসকারী ৪০% জনগণের মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৭%। পক্ষান্তরে, একই জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৯.১%। এ ফলাফল বিগত কয়েক বছরে আয় বৈষম্য বৃদ্ধির অন্যতম নির্দেশক। তবে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ঋণ এবং আর্থ-সামাজিকখাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার সমাজের সকল স্তর থেকে আয় বৈষম্য দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর।

১০.২.১ জেন্ডার, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা অনুসারে মধ্যম আয়ের ৫০ শতাংশের নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫.৯৮ শতাংশ মধ্যম আয়ের ৫০ শতাংশের নীচে বসবাস করে। তবে খানা আয় ব্যয় জরিপে জেন্ডার, বয়স বা প্রতিবন্ধিতা অনুসারে উক্ত জনসংখ্যার পৃথক পৃথক অনুপাত পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১০.৩.১ বৈষম্য অথবা নিগ্রহের শিকার হওয়া জনসংখ্যার অনুপাত (পূর্ববর্তী ১২ মাসে); আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে

২০১৮ সালে জনসংখ্যার ৩৫.৬ শতাংশ উল্লেখ করেছে, তারা পূর্ববর্তী ১২ মাসে বৈষম্য অথবা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বলে ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন। এ বৈষম্যের মাপকাঠি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিষিদ্ধ আচরণের ভিত্তিতে নির্ধারিত।

১০.৫.১ আর্থিক স্বাস্থ্যের সূচক

ভিত্তিবছর	বর্তমান পরিস্থিতি
১. পর্যায় ১ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অনুপাতে সম্পদ: ৫.৪০	১. টায়ার ১ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অনুপাতে সম্পদ ৪.৭৪
২. পর্যায় ১ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মূলধন অনুপাতে ভরযুক্ত ঝুঁকিমূলক সম্পদ: ৮.০০	২. পর্যায় ১ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মূলধন অনুপাতে ভরযুক্ত ঝুঁকিমূলক সম্পদ: ৬.৭৭
৩. মূলধনের বিপরীতে খেলাপি ঋণের অনুপাতে নেট সঞ্চিতি: ৪৪.১৯	৩. মূলধনের বিপরীতে খেলাপি ঋণের অনুপাতে নেট সঞ্চিতি ৫৩.৩৬
৪. মোট ঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ: ৮.৪০	৪. মোট ঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ: ৯.৮৯
৫. সম্পদের বিপরীতে প্রাপ্তি বা রিটার্ন অন অ্যাসেটস: ১.৮৬	৫. সম্পদের বিপরীতে প্রাপ্তি বা রিটার্ন অন অ্যাসেটস: ০.৮৬
৬. স্বল্পমেয়াদি দায়ের বিপরীতে তরল সম্পদ: ৫১.১৩	৬. স্বল্পমেয়াদি দায়ের বিপরীতে তরল সম্পদ: ৪৪.৪৮
৭. নেট ওপেন পজিশন ইন ফরেইন এক্সচেঞ্জ টু ক্যাপিটাল: ৪.৭২	৭. নেট ওপেন পজিশন ইন ফরেইন এক্সচেঞ্জ টু ক্যাপিটাল: ৭.৪৩

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫ ও ২০১৮

সূচক ১০.ক.১: শূন্য শুল্কসহ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আমদানিতে আরোপিত শুল্ক রেখার অনুপাত

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে শূন্য শুল্কে আমদানির অনুপাত ডব্লিউটিওর দোহা রাউন্ডের সমঝোতা মোতাবেক একই রকম রয়েছে।

সূচক ১০.খ.১: প্রবাহের ধরন অনুযায়ী মোট উন্নয়ন খাতে সম্পদ প্রবাহ; এতে ওডিএ, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ও অন্য প্রবাহ অন্তর্ভুক্ত

বাংলাদেশ এখন আর অনুদাননির্ভর দেশ নয়।তবুও দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক খাতের কর্মকাণ্ড এবং অবকাঠামো উন্নয়নে ওডিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ওডিএর তথ্য থেকে বোঝা যায়, এধরনের উন্নয়ন সহায়তার প্রবৃদ্ধি পরিমিত পর্যায়ে থাকলেও জিডিপিতে এর অংশ সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কমছে। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালে ওডিএ'র প্রবৃদ্ধি ঘটে উল্লেখযোগ্য হারে। ওই সময়ে ১৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ হারে এটি বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তী বছরগুলোয় কমে যায়। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালে এফডিআই বছর বছর গড়ে ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। এ সময় মূলত টেলিযোগাযোগ, বস্ত্র এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগ বেশি হয়। পরে এফডিআই প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৮ শতাংশ বাড়ে। বাংলাদেশে ত্বরিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে অভ্যন্তরীণ সম্পদে গুরুত্ব রেখে বেশি পরিমাণ পুঁজি ব্যবহারের কৌশল রয়েছে, যার অংশ হিসেবে যথাযথ প্রক্রিয়ায় এফডিআই'র বাড়তি প্রবাহ কাজে আসতে পারে।

সারণি ১০.২: বিভিন্ন ধরন অনুযায়ী উন্নয়ন খাতে সম্পদপ্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
ওডিএ	১৭৭৭.০	১৮৪৭.০	২০৫৭.২	২৭৬০.৮	৩০৪৬.৮	৩০০৫.৫	৩৫৩১.৭	৩৬৭৭.৩	৬৩৬৯	..
এফডিআই	৯১৩.০	৭৭৯.০	১১৯৪.৯	১৭৩০.৬	১৪৩৮.৫	১৮৩৩.৯	২০০৩.৫	২৪৫৪.৮	৩৬১৩.৩০	৪৯৪৬

সূত্র: ইআরডি, ২০১৮ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৮-১৯

সূচক ১০.গ.১: দেশে পাঠানো প্রবাসী আয়ের অনুপাতে রেমিট্যান্স খরচ

বিশ্বব্যাপী অভিবাসী শ্রমিক জোগানদাতা দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। রেমিট্যান্স প্রবাহের হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম রেমিট্যান্স গ্রহণকারী দেশ। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুসারে, প্রায় শূন্য দশমিক ৭৩ মিলিয়ন (বা ৭লাখ ৩০ হাজার জন) শ্রমিক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদেশে গেছেন। এর আগের অর্থবছরে গিয়েছিলেন ১.০০৮ মিলিয়ন (বা ১০ লাখ ৮ হাজার) জন। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় ছিল ১ হাজার ৫৫৪ কোটি (১৫.৫৪ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার, যা ২০১৯ সালে বেড়ে হয় ১ হাজার ৮৩৫ কোটি (১৮.৩৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার (চিত্র: ১০.৪)। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স ছিল জিডিপির ৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি আয়ের ৬২ দশমিক ২৫ শতাংশ। পরবর্তী বছরগুলোয় রেমিট্যান্সের অবদান কমতে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ছিল ৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি আয়ের ৪০ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন একটি ব্যয়বহুল বিষয়। অভিবাসী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অভিবাসী পাঠাতে সবচেয়ে বেশি আর্থিক খরচ পড়ে বাংলাদেশ থেকে (আইওএম ২০১৮)। উচ্চব্যয়ের কারণে দরিদ্রদের জন্য অন্য দেশে অভিবাসন গ্রহণ বেশ কঠিন। নানা কারণে অভিবাসনের যথার্থব্যয়ের হিসাব নির্ধারণ করা কঠিন। কেননা এই খরচ নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়; যেমন–দক্ষতা, লিঙ্গ, ভিসার ধরন ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকার ওপর (সিদ্দিকী ২০১০)। সরকারের নীতি হলো প্রবাসী শ্রমিকদের বার্ষিক আয়ের অনুপাতে চাকরিতে নিয়োগের খরচ কমানো। এক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে ধরা হচ্ছে ২০১৬ সালে ১৭টি দেশের অভিবাসন ব্যয় ও আয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, একজন কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বার্ষিক আয়ের শতকরা হারে নিজেকেই ওই দেশে নিয়োগের ব্যয় বহন করতে হয়। ২০১৮ সালেও তা ভিত্তি মানথেকে পরিবর্তিত হয়নি। ২০১৫ সালে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের অনুপাতে খরচ ছিল ৪ দশমিক ০৬ শতাংশ। এ খরচ ২০১৮ সালে কিছুটা বেড়ে হয় ৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ (বিবি, ২০১৮)।

চিত্র ১০.৪: বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়, ১৯৭৬-২০১৯

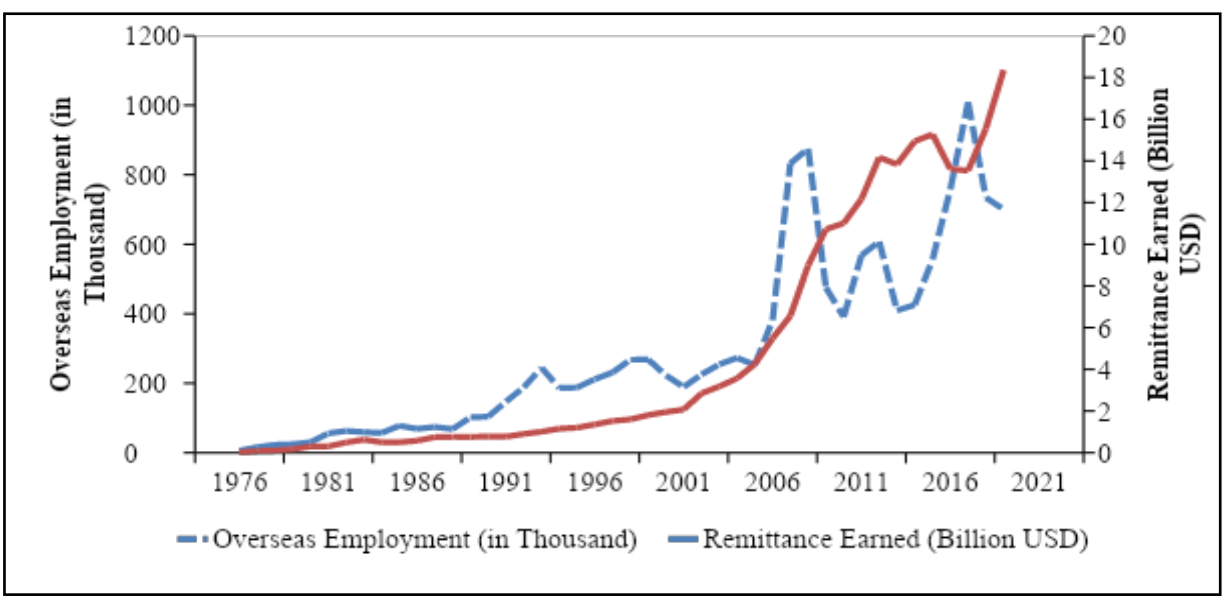

সূত্র: বিএমইটির তথ্য সংকলন

১০.৩ অসমতা হ্রাসে সরকারের প্রচেষ্টা

বৈষম্য দূর করতে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় এবং তা সহজ করতে সরকার একটি বিশদ মানচিত্রায়ণ নথি (ম্যাপিং) তৈরি করেছে। এতে রয়েছে চাহিদা মূল্যায়ন ও অর্থায়ন কৌশল, যাতে আওতাভুক্ত করা হয়েছে সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও এসডিজির লক্ষ্যসমূহ। যাতে করে ফাস্টট্র্যাক ভিত্তিতে এসডিজির নীতি এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন করা যায় (পিসি ২০১৭)। সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) অনেক উন্নয়ন কৌশল এসডিজির সঙ্গে সমন্বয় করেছে, যার ভিত্তিতে এসডিজির প্রথম ধাপের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাকি ধাপগুলো অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ২০৩০ সাল নাগাদ আওতাভুক্ত হবে। পরিকল্পনা কমিশনের অধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন এবং এসডিজি-বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট ।এ বিভাগটি সমন্বয়ক ও অনুঘটকের কাজ করে, বিশেষ করে আর্থিক প্রয়োজন মূল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে সর্বসম্মতি অর্জনে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি এসডিজির স্থানীয়করণ ও পুরো প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বশীল।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্কলন অনুযায়ী, এসডিজি বাস্তবায়নে স্থির মূল্যে স্বাভাবিক ব্যয়ের অতিরিক্ত আরও ৯২ হাজার ৮৪৮ কোটি (৯২৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। এটি ২০১৭-২০৩০ সালে পুঞ্জীভূত (অ্যাকিউমুলেটেড) জিডিপির প্রায় ২০ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ব্যয় হবে এসডিজি ৮-এর জন্য। কেননা উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যেকোনো বিচারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই মূল বিষয়। ২০১৭-২০৩০ মেয়াদে এসডিজির দশম অভীষ্ট অর্জনে মোট অতিরিক্ত খরচ হতে পারে ৬৯০ কোটি (৬ দশমিক ৯০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার, ২০১৫-১৬ স্থির মূল্য হিসাবে (পিসি, ২০১৭)। এ আভাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে সম্পর্কিত অন্য সব বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে এসডিজি ৮-এর ক্ষেত্রে শোভন কর্মসংস্থান এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্য মৌলিক সেবায় অসমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে আয় ও সম্পদের সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশের নীতি কাঠামোয় অসমতাকে বহুমাত্রিক এবং এসডিজির বেশিরভাগ অভীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। কাজেই সমতা ও ক্ষমতায়নের সর্বজনীন বাস্তবায়নের ওপর এই এজেন্ডা মনোনিবেশ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সুযোগের অসমতা, আইন ও এর প্রয়োগে বৈষম্য এবং শ্রমবাজারে নারী-পুরুষের অসম সুযোগ। এছাড়া রয়েছে আর্থিকভাবে অমূল্যায়িত গৃহস্থালি কাজের অসম বণ্টন, সম্পত্তিতে দরিদ্রদের সীমিত নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসা ও সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কম অংশগ্রহণ।

এসডিজি-১০-এর প্রেক্ষিতে দেশের নীতি কাঠামোর লক্ষ্য হলো তলানির ৪০ শতাংশ জনসংখ্যাকে নিয়মিত আয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং তা টেকসই করা। এক্ষেত্রে জাতীয় গড়ের চেয়ে তাদের উপার্যনের গতি বেশি থাকতে হবে। বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, অর্থনৈতিক কিংবা অন্য যেকোনো পরিচয়ের ঊর্ধ্বে থেকে সবার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা জরুরি। এছাড়া বৈষম্যমূলক আইন, নীতি ও অনুশীলন বিলোপ করে ফলাফলের অসমতা দূর করা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্থানীয় পর্যায়ে তিনটি মৌলিক নীতি-স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়েছে:

(ক) অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও পুনর্বণ্টিত নীতির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের সুযোগ ও অন্য পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে অসমতা নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে নেমে আসবে।

(খ) গুণগত সেবার জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, উন্নত সরবরাহ চ্যানেল এবং আরও ভালো লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাখাতে ব্যবধান কমানো। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় উল্লিখিত সেবার প্রাপ্যতা বাড়ানো।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৈষম্য এবং লিঙ্গ ও সামাজিক বহিষ্করণ দূর করা।

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে নীতিসমূহ মোটাদাগে তিনটি পন্থারওপর গুরুত্বারোপ করে:

কর ব্যবস্থাকে আরও প্রগতিশীল করা: আর্থিক সেবায় আরও ভালো অধিগম্যতা নিশ্চিত করা। লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট নিয়ম-নীতিমালা দূর করা।

নাগাল পাওয়ার হার ত্বরান্বিত করা: বাংলাদেশের দরিদ্রদের বেশিরভাগই গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত। কাজেই আয়বৈষম্য দূরীকরণে কৃষি উন্নয়ন অপরিহার্য। এর মাধ্যমে কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষের আয় সরাসরি বাড়ানো যাবে। বৈষম্য দূরীকরণের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিকভাবে বিনিময়ের অযোগ্য ও বিনিময়যোগ্য অকৃষিখাতকে সাধারণ সাম্যব্যবস্থা কাঠামোয় (মবহবৎধষ-বয়ঁরষরনৎরঁস ভৎধসবড়িৎশ) বিবেচনা করতে হবে। বিনিময়যোগ্য খাত স্থানিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চালিত হয়। আর এভাবে কৃষি উৎপাদনশীলতা দ্বারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। বিনিময়যোগ্য অকৃষিখাত (যেমন এমএসএমই) অপেক্ষাকৃত কম মজুরি এলাকায় ঘনীভূত হয়। ফলে তা কৃষি উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। এমএসএমই খাতে অল্প দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের প্রবণতা আছে। এ ধরনের কর্মসংস্থানের প্রসারগরিবের আয় বৃদ্ধি করে। অপেক্ষাকৃত সংগতিপূর্ণ পরিবারগুলো কৃষিশ্রমিক নিয়োগ দেয়। এতে গ্রামের অভ্যন্তরে অসমতা কমে। তবে এই কৌশল কাজ করতে পারে শুধু সঠিকভাবে কার্যকর শ্রম ও পণ্যবাজার এবং বহিঃস্থ উৎস থেকে চলনশীল মূলধনের উপস্থিতিতে। এভাবে মূলধন হাত বদলের প্রতিবন্ধকতা দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন: বৈষম্য দূর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সব মানুষের বিশেষ করে দরিদ্রদের বেশকিছু নাগরিক অধিকারে অধিগম্যতা নিশ্চিত করা। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসম্মত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ।

এই কাঠামোয় আরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এসডিজি অর্জনে স্থানীয় সংস্থার (যেমন স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ [এলজিআই], এনজিও-এমএফআই) পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকতে হবে। তাদের অংশগ্রহণ যেমন বাস্তবায়ন পর্যায়ে থাকবে, তেমনি থাকতে হবে এজেন্ডা নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণে। এলজিআইগুলো নারী ও পুরুষের সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম জোরালো করতে পারে। পানি সরবরাহ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত স্থানীয় অবকাঠামো কার্যকর বিনিয়োগ সহজ করতে পারে। অবৈতনিক পারিবারিক কাজে নারীদের সময় কমাতে পারে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে পারে, যারা নারীদের কাজের সুযোগ করে দেবে এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি করবে। এতে শিশুদেরও কল্যাণ হবে। এই কাঠামো পর্যাপ্ত গুণগত পরিমাণে মৌলিক সামাজিক সেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিতে কাজ করে। সরকারি ব্যয়ের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ায়, বিশেষ করে যেসব এলাকায় ও যাদের এটা বেশি দরকার, তাদের মাঝে।

এলজিআই এবং এনজিও-এমএফআইগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কাজে সফলতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসডিজি- ১০-এর আওতা থেকে বোঝা যায়, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে তারা সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। চলমান কর্মকাণ্ড আরও নিখুঁত করার বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রত্যেক এলজিআই'র উচিত এসডিজি অর্জনে তাদের আরও করণীয় বিষয়েগুরুত্ব দেওয়া। বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে স্থানীয় সক্রিয়তার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এসডিজি ১০-এর লক্ষ্যগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এসডিজি ১০-এর সমন্বিত ও রূপান্তরশীল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্য দরকার এমন নীতি, যা পদ্ধতিগতভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত খাতে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করবে। এই আলোকেস্থানীয় সরকার ও এনজিও-এমএফআইগুলো পরিবর্তনের অনুঘটক। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে এসডিজি ১০-এর সংযোগ স্থাপনে এগুলো সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এসডিজি ১০ অর্জনে অভীষ্টগুলোর দৃষ্টিকোণ একীভূত করবে। বিভিন্ন কৌশলসমূহ যা উদ্ভাবন,দক্ষতা,সবুজ প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে জড়িত, তা পুনঃযাচাই করবে, যেন এই কৌশলগুলো 'এসডিজি ১০-সচেতন' হয়এবং তা প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে সহায়ক হয়। এগুলো মাঠপর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত কাজে লাগাবে, যেন এসডিজি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা যায়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে প্রচুর পরিমাণে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য থাকে, যা দেশে এসডিজি ১০-এর ফলোআপ প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ থেকে দেখা যায়, ফলাফল ও সুযোগের অসমতা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত ও পারস্পরিকভাবে শক্তিশালী। শহর ও গ্রামাঞ্চল–দুই ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য হলেও গ্রামাঞ্চলে তা বেশি। এ কারণে সব মাত্রার অসমতা মোকাবিলায় একটি প্রণিধানযোগ্য নীতিকাঠামো দরকার। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশল এবং মানুষের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ফারাক দূর করার উদ্যোগের মাধ্যমে আয় অসমতা দূরীকরণের নীতিকাঠামো কাজে লাগানো দরকার।

উপরোল্লিখিত প্রেক্ষাপটে গৃহীত নীতিকাঠামোর লক্ষ্য:

(ক) সমন্বিত পরিকল্পনা ও তৃণমূল পর্যায়ে নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য বাড়ানো। স্থানীয় সরকারকে সমর্থন দেওয়া, যাতে এসডিজি-১০ বাস্তবায়নে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়।

(খ) এসডিজি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজাতীয় সরকারের ভূমিকা বিবেচনায় নেওয়া। আঞ্চলিক পর্যায়ে এসডিজি ১০-এর সংমিশ্রিত খাতের প্রেক্ষাপট তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নেটওয়ার্ক ও অংশীদারিত্ব তৈরি। এছাড়া সেবা সরবরাহে বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি বাড়ানো। এতে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কয়েকটি এসডিজির অন্তঃসংযুক্তির আরও প্রতিপালন হতে পারে।

(গ) অংশীদার ও মানুষের মাঝে এসডিজি ১০-এর বিষয়ে সচেতনতা এবং এ সম্পর্কে তাদের জানাশোনা বাড়ানো। তাদের এসডিজি ১০-এর সংশ্লিষ্টতা, সুযোগ ও স্থানীয়করণে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে পরিচিত করানো। স্থানীয় অংশীজনদের তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুধাবনে আগ্রহী করা। অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এটি স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করবে, যাতে আঞ্চলিক কৌশল ও পরিকল্পনায় এসডিজি ১০ অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করা যায় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দেওয়া যায়।

অধিকন্তু সরকার বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক প্রস্তুত করছে। এটি স্থান-সংক্রান্ত বৈষম্য দূর করার কাজে ব্যবহার হতে পারে। কেননা এর মাধ্যমে কয়েকটি আর্থসামাজিক সূচকের মাধ্যমে মানুষের ভৌগোলিক অবস্থানগত বঞ্চনার তথ্য প্রকাশ করার সুযোগ থাকবে। সুতরাং বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য অভূতপূর্ব লক্ষ্যনির্ভর নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০.৪ প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ

আয়বৈষম্য সামাল দেওয়া বাংলাদেশে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী বিষয়। সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের ক্ষেত্রে ব্যবধানের অনেক বিষয় বিবেচনায় আনা না হলে বর্ধনশীল আয় অসমতার বিষয়টি অনেক জটিল হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে দৈনিক ৩ মার্কিন ডলার ১ সেন্ট(২০১১ পিপিপি) উপার্জনকারী মানুষের সংখ্যা ৮ কোটি ৬১ লাখ ২০ হাজার (৮৬ দশমিক ১২ মিলিয়ন), যারা ধনীদের তুলনায় সঞ্চয় করতে পারে না বললেই চলে। বর্তমান সম্পদের মালিকানা এবং ভবিষ্যৎ সম্পদ আহরণের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিলে আগামী দিনের অসমতা পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।

সামাজিক প্রগতি সূচক ২০১৭ অনুসারে, ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭। অর্থাৎ এখানে নামমাত্র সামাজিক অগ্রগতি রয়েছে।[১] এই সূচকে বিভিন্ন দেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয় সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মকাণ্ডের ওপর। এরপরও বাংলাদেশ ২০১৪ ও ২০১৭ সালের মধ্যে সামাজিক প্রগতি সূচকে উল্লেখযোগ্য মানোন্নয়ন আনার জন্য স্বীকৃতি পেয়েছে। এই মানোন্নয়ন থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ আরও দ্রুতসামাজিক প্রগতি অর্জন করতে পারে। কেননা এখানে মানোন্নয়নের অনেক সুযোগ আছে এবং অন্য দেশের সফলতার উদাহরণ থেকে শেখার সুযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মান ও আয়বৈষম্যের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তত্ত্বগতভাবে দুর্বল প্রতিষ্ঠান আয়বৈষম্যকে উসকে দেয়। যেখানে গরিবদের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় সুরক্ষা দেওয়া হয় না, সেখানে তাদের সব অধিকার নিশ্চিত হয় না। এটাও বলা হয়, উচ্চ আয়ের বৈষম্য ধনীদেরকে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে এবং প্রতিষ্ঠানকে বিপথগামী করতে পারে। আসলেই বৈশ্বিক উদাহরণ থেকে দেখা যায়, আয় অসমতা এবং দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক মান একে অপরকে জোরালো করে। এসব কারণে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অসমতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো দেশে এ ধরনের সংস্কার কার্যকর করা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে তিনটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

- **পরিমাপ চ্যালেঞ্জ:** বাংলাদেশে বিভিন্ন সূচকের খুব কমই যথাযথও নিয়মিতভাবে পরিমাপ সম্ভব। কাজেই সরকার ও সুশীল সমাজকে এসডিজি ১০-এর অগ্রগতি পরিমাপের বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। এমনকি যদি
- **সামষ্টিকীকরণ প্রতিবন্ধকতা:** সংজ্ঞা অনুসারে, এসডিজি-১০ হচ্ছে বিভিন্ন লক্ষ্যের সমষ্টি। যেখানে অনেক বিষয় আওতাভুক্ত করার কোনো মডেল নেই। বাংলাদেশের একটি ধারণাগত মডেল প্রণয়ন করা দরকার, যেটা বিভিন্ন পদক্ষেপের সমন্বয় করবে।

১ ২০১৭ সালের সামাজিক প্রগতি সূচকে ১২টি উপাদান এবং ৫০টি স্বতন্ত্র নির্দেশক রয়েছে। এ সূচকে দেশগুলোকে শুধু প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে অবস্থান নির্ধারণ করা হয়না; বরং এর মাধ্যমে একটি দেশের সক্ষমতা এবং পিছিয়ে থাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে এ সূচকের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয় যা নীতি নির্ধারকগণকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কৌশলগত অগ্রাধিকার নির্ধারণে সহায়তা করে। ফ্রেমওয়ার্কটির উপাদানের মধ্যে রয়েছে মানুষের মৌলিক চাহিদা (পুষ্টি ও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও স্যানিটেশন, বাসস্থান, ব্যক্তি নিরাপত্তা), কল্যাণের ভিত্তি (মৌলিক শিক্ষার সুযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি লাভের সুযোগ, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা,পরিবেশের মান) এবং সুযোগ (ব্যক্তি অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তি, উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ)। দক্ষিণ এশিয়ার ৩টি দেশ (শ্রীলংকা, নেপাল ও ভারত) 'নিম্ন মধ্যম সামাজিক অগ্রগতিপ্রাপ্ত' দেশের তালিকায় রয়েছে। (সূত্র: পোর্টার ও অন্যান্য, ২০১৭)

- **স্থানীয়করণ চ্যালেঞ্জ:** এসডিজি ১০ বাস্তবায়নের অনেক কাজই আঞ্চলিক পর্যায়ে ঘটবে। অগ্রগতি তদারকি করতে স্থানীয় তত্ত্বের প্রয়োজন হবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের এলজিআইগুলোকে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে (যেমন এনজিও-এমএফআই ও সুশীল সমাজ) প্রয়োজনীয় উপায় বাতলে দিয়ে এসডিজি ১০-এর স্থানীয়করণ করতে হবে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে ত্বরান্বিত করে উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছে। একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচকে সফলতা পেয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত দারিদ্র্য মাপা হয় ভোগের ভিত্তিতে, আয়ের ভিত্তিতে নয়। ভোগ বর্তমান জীবনযাত্রার মানের নির্দেশক। ভোগকে 'চিরস্থায়ী আয়ের' মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। এতে বিবেচনা করা হয় না যে, দরিদ্ররা প্রায়ই ভোগ অব্যাহত রাখতে কেনাকাটা বা সম্পদ নগদীকরণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে এসডিজি ১০-এর প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য চিত্র ভালোভাবে বোঝা যায় স্থানীয় সামাজিক বাস্তবতায় বহুমাত্রিকতার প্রেক্ষিতে।

বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালে বেশ কিছু খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পর জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন শিক্ষায় জিডিপির ৩ শতাংশ, স্বাস্থ্যে ১ দশমিক ২ শতাংশ এবং সামাজিক সুরক্ষায় ২ দশমিক ৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যতীত অন্য লক্ষ্যগুলোয় লক্ষ্য পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। বাংলাদেশে বর্তমানে জিডিপির ১ দশমিক ৯০ শতাংশ শিক্ষাখাতে এবং শূন্য দশমিক ৮৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয়। সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে, যদি সরকারি পেনশন স্কিম বাদ দেওয়া হয়। এতে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বাজেটে বরাদ্দের জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা সেবা দেওয়ার সক্ষমতা এবং সব দরকারি প্যাকেজের বাস্তবায়ন মজবুত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে পিছিয়ে পড়া এলাকার দিকে।

১০.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

অন্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও অসমতা মোকাবিলায় সঠিক নীতিমালা কাঠামো নির্ধারণ করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সুযোগ ও ফলাফলের বৈষম্য একটি আরেকটির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সমান সুযোগ নিশ্চিত না হলেদরিদ্ররা নানা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সেবা না পেয়ে অসমতার ফাঁদে পড়ে। আর এ ধারা চলতে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। সমান সুযোগ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে পারে। ফলে লিঙ্গ, বর্ণ ও আঞ্চলিকতার মতো জন্মগত পরিচয় কারও জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। ফলাফল ও সুযোগের অসমতা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এ কারণে দুটো বিষয়কেই সামলাতে একটি প্রণিধানযোগ্য নীতিকাঠামো দরকার।

নীতির সংমিশ্রণ এবং সেগুলো কীভাবে বৈষম্য মোকাবিলায় কাজে আসবে, তা নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের ওপর। আর এগুলো বাংলাদেশের স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে নির্ধারিত। তথাপি অধিকতর ধারাবাহিক ও বেশি অসমতার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশ এখন দ্রুত নগরায়ণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখানে আয়বৈষম্য গ্রামের তুলনায় শহরে ধীরগতিতে বাড়ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যবধান বাড়ছে। বিশেষ করে গ্রামে ও বঞ্চিত এলাকায়। এগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে এখন নীতিনির্ধারকদের কাজে সহায়তার জন্য প্রণিধানযোগ্য একটি নীতিকাঠামো দরকার, যাতে তারা নানা জটিলতা ও যথাযথ নীতি নির্ধারণে তিনটি বিষয়ে ভিত্তি নির্ধারণ করতে পারে:

(ক) আয়বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে আনা, (খ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষায় পার্থক্য কমিয়ে আনাএবং (গ) বৈষম্য হটিয়ে ও কৃষ্টিগত আদর্শকে পুনর্জাগরিত করে সামাজিক বহিষ্করণ সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির ব্যাপক সুফল নিতে পারে অসমতা কমানোর নীতিমালা থেকে। এসডিজি ১০ অর্জনে বাংলাদেশে যথাযথ লক্ষ্যপূর্ণ কিছু নীতিমালা প্রয়োজন। যেমন:

- **কর ব্যবস্থা আরও প্রগতিশীল করা:** কর অব্যাহতি ও অন্য যেসব পদক্ষেপ সম্ভাব্য প্রাপ্তি (yield) কমিয়ে দেয়, তা পুনরায় যাচাই করা। বাংলাদেশের উচিত ব্যয়নীতিকে আরও তীক্ষ্ণ হাতিয়ারে পরিণত করা, যা বৈষম্যগুলোকে সামলাবে।
- **আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা:** সবার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্রেডিট ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা। এটি সব তথ্য কেন্দ্রীভূত করে নতুন লোককে ঋণদানে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করতে পারে। মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবা ব্যবহারে প্রবেশাধিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্যও আর্থিক সেবায় অভিগম্যতা বাড়ায়। এনজিও-এমএফআইগুলোর জন্য ক্রেডিট ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হলে তা গ্রামাঞ্চলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

- **জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা বিলোপ করা। এতে প্রবৃদ্ধি দৃঢ় করার ক্ষেত্রে দ্রুত সুফল পাওয়া যায়:** কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করলে অল্পতেই বেশি সুফল আসে। এ কথা বিবেচনা করে এসডিজি ১০-সহ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

- **কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া:** বাংলাদেশের অধিকাংশ গরিব মানুষ গ্রামে বাস করে এবং ক্ষেত-খামারে কাজকরে। আয়বৈষম্য দূর করতে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অপরিহার্য। এটি অর্থনীতির মূল স্রোতের বাইরে থাকা মানুষের আয় বাড়াতে সহায়ক।

- **বাণিজ্যিকভাবে বিনিময়যোগ্য ও অযোগ্য খাতে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা:** বৈষম্য দূরীকরণের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিকভাবে বিনিময়ে অযোগ্য এবং বিনিময়যোগ্য অকৃষিখাতকে সাধারণ সাম্যব্যবস্থা কাঠামোয় (general-equilibrium framework) বিবেচনা করতে হবে। বাণিজ্যিকভাবে অবিনিময়যোগ্য খাত স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে চালিত হয়। কাজেই তা কৃষি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। বিনিময়যোগ্য অকৃষিখাত (যেমন-এমএসএমই) অপেক্ষাকৃত কম মজুরিসম্পন্ন এলাকায় মনোযোগ দেয় এবং কৃষি উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়।

- **অসমতা দূরীকরণে চালিকাশক্তি এমএসএমই:** এমএসএমই খাতে অল্প দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের প্রবণতা আছে। এ ধরনের কর্মসংস্থানের প্রসার গরিবের আয় বৃদ্ধি করে। অপেক্ষাকৃতভাবে সংগতিপূর্ণ পরিবারে এ ধরনের দরিদ্র পরিবারগুলো কৃষিশ্রমিক নিয়োগ দেয়। এতে গ্রামের অভ্যন্তরে অসমতা কমে।

- **সঠিকভাবে কার্যক্ষম ইনপুট ও আউটপুট বাজার তৈরি করা:** কেবল সঠিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমিক ও পণ্যের বাজারে অসমতা দূরীকরণ কৌশল কাজে আসতে পারে। মূলধনের হাতবদলের প্রতিবন্ধকতা দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ।

- **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** বৈষম্য দূর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সব মানুষের, বিশেষ করে বেশকিছু নাগরিক সেবায় দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসম্মত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ।

- **উন্নয়ন স্থানীয়করণ:** এসডিজি-১০ অর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন স্থানীয় অংশীজনসমূহের (actors) (যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ [এলজিআই], এনজিও-এমএফআই) পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকতে হবে। তাদের অংশগ্রহণ যেমন বাস্তবায়ন পর্যায়ে থাকবে, তেমনি থাকতে হবে এজেন্ডা নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণে। স্থানীয় অংশীজনমূহকে পরামর্শমূলক ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামগ্রিক এসডিজি কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এলজিআইগুলো নারী ও পুরুষের সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম জোরালো করতে পারে। পানি সরবরাহ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত স্থানীয় অবকাঠামোয় কার্যকর বিনিয়োগ করতে পারে, যা নারীদের অবৈতনিক গৃহস্থালি কাজে সময় কমাতে পারে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে পারে, যা জেন্ডারভিত্তিক আয় বৈষম্য কমাবে এবং শিশুকল্যাণ ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি করবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষ্টিগতভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক উপায়ে মৌলিক সামাজিক সেবায় অধিগম্যতা নিশ্চিত করতে পারে। সরকারি ব্যয়ের বিষয়ে সজাগ করা, বিশেষত যেসব এলাকায় যাদের এটা বেশি দরকার, তাদের মাঝে। তারা মতামত দিতে পারে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও গ্রামীণ এলাকায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্য হ্রাসমূলক অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগের জন্য।

- **স্থানীয় প্রচেষ্টায় পুনরায় আলোকপাত করা:** এসডিজি ১০-এর লক্ষ্যগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। এলজিআই এবং এনজিও-এমএফআইগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কাজের সফলতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসডিজি ১০-এর আওতা থেকে বোঝা যায়, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে তারা সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। চলমান কর্মকাণ্ড আরও নিখুঁত করার বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রত্যেক এলজিআই'র উচিত এসডিজি অর্জনে তাদের আরও করণীয় বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনে স্থানীয় সক্রিয়তার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এসডিজি ১০-এর লক্ষ্যগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। এসডিজি ১০-এর সমন্বিত পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য দরকার এমন নীতি, যা পদ্ধতিগতভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় খাতে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করবে। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল পরিবর্তনের অনুঘটক। এগুলো সুবিধাজনক অবস্থানে আছে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে এসডিজি ১০-এর সংযোগ স্থাপনেও।

১০.৬ সারকথা

গত এক দশকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অসাধারণ, কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক বিবেচনায় তা পিছিয়ে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। প্রকৃত অর্থে ৮ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে বাংলাদেশের অসমতা দূরীকরণের উপযুক্ত সময় এখনই। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য যত কম হয়, প্রত্যেকে তুলনামূলকভাবে ততই সংগতিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। এ ধরনের সমাজে সবাই স্বাস্থ্য এবং অন্য সূচকে ভালো অবস্থায় থাকে। রাষ্টীয় বিভিন্ন নীতিকাঠামোয় উল্লেখ আছে যে,বৃত্তি, প্রতিবন্ধকতা, আঞ্চলিকতা, নৃতাত্ত্বিকতা এবং অন্য আর্থসামাজিক অবস্থান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে মূল ধারা থেকে বিচ্যুৎ করতে পারে। জাতীয় উন্নয়ন অভীষ্ট ও এসডিজি অর্জনে সরকার সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে সব বিচ্যুতি লাঘব করার লক্ষ্য নিয়েছে। এছাড়া অব্যাহত কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও টেকসই কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার উচিত আত্মনির্ভরশীল, গণমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিষয়ে আরও যত্নবান হওয়া। এতে পিছিয়ে পড়া মানুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা যাবে। দরিদ্রদের আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্থানীয় উদ্যোগ উৎসাহিত করতে হবে। বর্তমান বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ করা দরকার, যাতে তাদের ক্ষমতা ও সম্পদ দেওয়া যায়। এর ফলে তারা জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

সরকার অসমতা দূর করতে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এজন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে, যেটিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করার উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হয়। নিরাপদ অভিবাসন এবং প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্'ান নীতি, ২০১৬' অনুমোদন করেছে। এছাড়া ওডিএ ও এফডিআইতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে। অধিকন্তু স্থানীয় পর্যায়ের জনসমষ্টির উদ্যোগভিত্তিক শ্রমবাজার ও স্থানীয় উৎপাদনশীল সম্পদের ব্যবহার, আয়ের সুযোগ, শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিশুর যত্ন ও পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৈষম্য দূর করা যেতে পারে।

জাতীয় পর্যায়ে অসমতা দূর করার মতো বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন ভাতা, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি জোগান, বিনামূল্যে স্কুল-আহার জোগান দেওয়া হয়। এতে ভালো ফলাফল আশা করা যায়। গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নে সরকারের কৌশল বিকিকিনির জন্য কার্যকর সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, গবাদি ও অন্য খাতে দরিদ্র-বান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। এতে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন হবে। এছাড়া সেচ, সারের ব্যবহার, উন্নত বীজ এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক ব্যবসা সম্পর্কে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও আইডিয়া বিনিময় ঘটবে।

সেবা সরবরাহ অবকাঠামো উন্নয়নে গ্রোথ সেন্টারগুলোর প্রাধান্য রয়েছে। এর মাধ্যমে সামাজিক সক্ষমতা নিশ্চিত ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হয়। নানাবিধ আয় সৃজনকারী কর্মকাণ্ড ও ব্যবসার মাধ্যমে অর্থনীতির প্রসার ঘটতে পারে। এসব উন্নতি গ্রোথ সেন্টারগুলোতে অসমতা কমাতে ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখবে।

১১ টেকসই নগর ও জনবসতি

অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

১১.১ এসডিজি ১১ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

পৃথিবীতে জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শহরে বাস করে। ২০৫০ সাল নাগাদ তাদের দুই-তৃতীয়াংশ বা সাড়ে ৬০০ কোটি (৬.৫ বিলিয়ন) মানুষ শহরে বাস করবে। শহরের বিদ্যমান নির্মাণশৈলী ও ব্যবস্থাপনার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়। বর্ধনশীল জনসংখ্যা ও অভিবাসনের ফলে শহরগুলোর দ্রুত বিস্তৃতি ঘটছে। এর ফলে যেমন মেগাসিটি বাড়ছে, তেমনি এর অংশ হচ্ছে বস্তি। শহরকে টেকসই করার অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন এবং অভিঘাতসহিষ্ণু সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা। এর আওতায় আরও রয়েছে গণপরিবহনে বিনিয়োগ, সবার জন্য সবুজ খোলা চত্বর তৈরি এবং অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বনে নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা। বিশ্বব্যাপী যদিও বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবুও শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি উন্মুক্ত জায়গা ও পরিবহনে প্রবেশাধিকার সীমিত থাকছে। ক্রমেই জনসংখ্যার অনুপাতে শহরে পরিণত হওয়া এলাকার পরিসর বাড়ছে। ফলে তা টেকসই না হওয়ার যথেষ্ট শঙ্কা রয়েছে।

১৯৯০ ও ২০১৬ সালের মাঝে বিশ্বব্যাপী শহরে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বস্তিবাসীর সংখ্যা ৪৬ থেকে ২৩ শতাংশে নেমেছে। তবে এই উন্নতি ম্লান হয়েছে মূলতঃ শহরের নিজস্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রাম থেকে বেশি মানুষ শহরে অভিবাসন করায়। ২০১৬ সালে পৃথিবীতে প্রায় ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) মানুষ বস্তি কিংবা অনানুষ্ঠানিক আবাসস্থলে বাস করত। এর মধ্যে ৫৮ কোটি ৯০ লাখ (৫৮৯ মিলিয়ন) মানুষ পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার।

সহজলভ্য গণপরিবহন ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া মানুষের অনুপাত এখনো কম। কারও আবাসস্থল থেকে বাসস্টপ পর্যন্ত আধা কিলোমিটারের হাঁটা পথ। ট্রেন কিংবা ফেরি টার্মিনাল থেকে এ দূরত্ব এক কিলোমিটার হলে তা সহজলভ্য গণপরিবহন হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়। ২০১৮ সালে ৭৮টি দেশের ২২৭টি শহরের উপাত্তে দেখা যায়, সব অঞ্চলে গড়ে ৫৩ শতাংশ মানুষের গণপরিবহনের ওঠার ভালো সুযোগ রয়েছে। এ হার আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে সর্বনিম্ন ১৮ শতাংশ এবং সবচেয়ে বেশি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ৭৫ শতাংশ। যেসব এলাকায় গণপরিবহনে প্রবেশাধিকার কম, সেখানে অনানুষ্ঠানিক পরিবহন মাধ্যমের প্রসার বেশি এবং সেগুলোই শহরের সিংহভাগ বাসিন্দার যাতায়াতের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার তুলনায় নগর অঞ্চলের পরিধি আরও দ্রুত হারে বাড়ছে। ২০০০-২০১৪ সালের মধ্যে নগর এলাকা জনসংখ্যার তুলনায় ১.২৮ গুণ দ্রুত গতিতে বেড়েছে। এ ধারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শহরসমূহে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমছে। নগর অঞ্চলের পরিধি বৃদ্ধির এই ধারা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবেশগতভাবে গভীর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকছে। টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিত করার জন্য নগর প্রবৃদ্ধির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায় ২০০ কোটি (দুই বিলিয়ন) মানুষ বর্জ্য সংগ্রহ-সংক্রান্ত সেবায় প্রবেশাধিকার পায় না। আর নিয়ন্ত্রিত বর্জ্য নিঃসরণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ৩০০ কোটি (তিন বিলিয়ন) মানুষ। ২০১০ ও ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী ৮১ শতাংশ কঠিন বর্জ্য সংগৃহীত হওয়ার অনুপাতে সাব-সাহারা আফ্রিকায় তা ছিল মাত্র ৫২ শতাংশ। ২০১৬ সালে শহরে বসবাসকারী ১০ জনের ৯ জনই এমন দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড পরিপালন করে না। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম ২.৫) বা দূষিত কণা বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা পেয়েছে।

পৃথিবীর বেশিরভাগ শহরই নাগরিকদের জন্য সহজগম্য পর্যাপ্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হিমশিম খেয়েছে। সহজগম্য বলতে আবাসস্থলের ৪০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত খোলা জায়গা বোঝানো হয়েছে। ২০১৮ সালে ৭৭টি দেশের ২২০টি শহরের তথ্য অনুসারে ২১ শতাংশ মানুষ উন্মুক্ত খোলামেলা স্থানের সুবিধা পায়। জাতীয় নগর নীতিমালা হলো সুনির্দিষ্টভাবে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার নীতিকৌশল। ২০১৯ সালের শুরু পর্যন্ত ১৫০টি দেশ এমন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তাদের প্রায় অর্ধেকই এখন তা বাস্তবায়ন করছে।

বিশ্বের ২৩টি মেগাসিটির পাঁচটি দক্ষিণ এশিয়ায়। এই শহুরে জনসংখ্যার অর্ধেকই অপ্রাতিষ্ঠানিক আবাসস্থলে থাকে। এ ধরনের আবাসস্থলকে প্রায়ই 'বস্তি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ দক্ষিণ এশীয় শহরগুলোকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যেখানে দৈনন্দিন জীবনে বহুমাত্রিক বঞ্চনা ও অসমতা দেখা যায়। নীতির সফলতায় আহমেদাবাদ ও লাহোরের উদাহরণ উল্লেখ করার মতো। তারা ভূমি ব্যবহার ও পরিবহন পদ্ধতিতে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা এনেছে। এছাড়া সেখানে যাতায়াতকেন্দ্রিক সময় ব্যয় ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ উভয়ই কমে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত ঝুঁকি মাথায় রেখে, নগর

ব্যবস্থার অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে। সব দক্ষিণ এশীয় দেশে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো টেকসই, অভিঘাতসহনশীল ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

একুশ শতকে স্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে শহরে বসবাসের পরিবেশে অভূতপূর্ব চাপ প্রয়োগ। এই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয় পানি, মাটি ও সবুজ আচ্ছাদনকে। যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে সামাজিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা, জ্বালানি ও জনস্বাস্থ্যে। আধুনিক শহরগুলো আরও কিছু সমস্যা মোকাবিলা করবে, যেমন দারিদ্র্য, সামাজিক ভেদাভেদ ও অসমতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জ্বালানি সংকট, দুর্বল অবকাঠামো, ভূমির অপব্যবহার এবং পানি ও বাতাসদূষণ।

এ কারণে টেকসই উন্নয়ন ক্রমাগত নির্ভর করবে নগর প্রসারের সফল ব্যবস্থাপনার ওপর। মূল চ্যালেঞ্জগুলো হলো শহরের মানুষের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন সেবার প্রয়োজনীয়তা মেটানো। সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে আবাসন, পরিবহন, জ্বালানি পদ্ধতি, পানিসম্পদ ও সম্পর্কিত অন্য অবকাঠামো, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা। ভঙ্গুর জনসংখ্যাকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে এ অভীষ্ট গুরুত্ব দেয় নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায়। এই অভীষ্ট আলোকপাত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণে এবং অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই পরিকল্পনায়। এতে শহরের সঙ্গে গ্রামীণ এলাকার সংযুক্তি জোরালো হতে পারে এবং বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ হতে পারে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে খোলামেলা সবুজ এলাকায় নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সর্বজনীন প্রবেশাধিকারের সুবিধা থাকার মাধ্যমে। এজন্য বিশেষতঃ বিবেচনা করতে হবে নারী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের কথা।

১১.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১১ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

সূচক ১১.১.১: বস্তি, অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রতুল গৃহায়নে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের ফলে বস্তির প্রসার বেড়েছে খুব দ্রুত। শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও অগ্রহণীয় পর্যায়ে বেশি। ইউএন-হ্যাবিট্যাট বা জাতিসংঘ আবাসনের তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সালে শহরে জনসংখ্যার ৫৫ দশমিক ১ শতাংশ বস্তিতে বসবাস করত। আগামী ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ শহরে বাস করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ লক্ষ্য হলো শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা ২০ শতাংশে রাখা। বর্তমানে শহরে বসবাসকারী মানুষের ৬০ শতাংশের বেশি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতেই ঘনীভূত। ২০৩০ সাল নাগাদ গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের এই ধারা আরও সুস্পষ্ট হবে। জেলা পর্যায়ে নগরায়ণের ধারা সাতক্ষীরায় ৭ দশমিক ২ শতাংশ থেকে শুরু করে ঢাকায় তা ৯০ শতাংশের ওপর পর্যন্ত। ঢাকা ধূলিদূষণ, জলাবদ্ধতা, বর্জ্য নিঃসরণে দেরি ও যানজটের মতো সমস্যায় জর্জরিত।

নগরাঞ্চলে আবাসনের তুমুল চাহিদা থাকলেও জোগান খুবই সীমিত। ঢাকায় আবাসনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে মানুষের ভূমি উন্নয়নে দুর্বল ব্যবস্থাপনা এবং দরিদ্রদের আবাসনের প্রাপ্যতা নিশ্চিতে নিয়ন্ত্রণের অভাব। জনসংখ্যার বেশিরভাগই ভাড়াটিয়া অথবা বস্তিবাসী। বস্তির ৯৬ শতাংশ পরিবারই নিম্নমানের ঘরে (পাকা নয়) বাস করে। নাগরিকদের প্রায় ৪৪ শতাংশ কোনো একসময় একেবারেই অস্থায়ী কাঠামোয় বসবাস করত। ২৯ শতাংশ আধাস্থায়ী কাঠামোয় বাস করত (এইচআইইএস, ২০১৬)। এতে বোঝা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ঘরবাড়ির মানোন্নয়ন ঘটেছে।

সূচক ১১.২.১: গণপরিবহনে সহজ প্রবেশাধিকার পাওয়া জনগোষ্ঠীর অনুপাত; লিঙ্গ, বয়স ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ভেদে

শহরের প্রাণ হলো পরিবহন। যাতায়াতের সময় পরিবহন ব্যবস্থা পছন্দের সুযোগ থাকা শহরটির ভবিষ্যৎ প্রসারও উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত। পরিবহন খাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দারিদ্র্য বিমোচন, আঞ্চলিক সংহতি, জাতীয় উন্নয়ন ও গ্রিনহাউস গ্যাস কমানো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অসহনীয় যানজট ও ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় ঢাকা চাপের মধ্যে থাকা শহর হিসেবে বিশ্বে সপ্তম এবং এশিয়ায় শীর্ষে (জিপজেট, ২০১৭)। শহর ও গ্রাম এলাকার পরিবহন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত নয়। রাস্তার ধারণক্ষমতার তুলনায় গাড়ি ও ধীরগতিসম্পন্ন বাহনের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। পরিবহন সেবার জন্য অবিশ্বাস্য পর্যায়ের চাহিদা থাকায় মোটরচালিত ও অযান্ত্রিক যানের সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, বিশেষ করে ঢাকায়। পরিণতিতে তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট। যানজটে ঢাকায় প্রতিদিন ৫০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় বলে ধারণা। বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ সালের বিশ্লেষণ অনুসারে, প্রতি ঘণ্টায় গাড়ির গতি পূর্ববর্তী ১০ বছরে ২১ কিলোমিটার থেকে কমে মাত্র সাত কিলোমিটারে নেমে এসেছে। যানবাহনের এই ধীরগতি মানুষের হাঁটার গতির চেয়ে সামান্য বেশি। শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারীদের গণপরিবহন ব্যবস্থা, নিরাপদ যাতায়াত সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে যথাযথ

পরিকল্পনা করা অতি জরুরি। বাংলাদেশে নগর ও জনবসতিতে স্থিতিশীলতা আনার জন্য 'সংশোধিত পরিবহন পরিকল্পনা কৌশল, ২০১৬'প্রণয়ন করা হয় ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য। এতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে রাজধানী শহরে সড়ক উন্নয়ন এবং সমন্বিত ব্যাপক গণপরিবহন ব্যবস্থা। একই সঙ্গে যানবাহনের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

সূচক ১১.৪.১: সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণে মাথাপিছু মোট ব্যয় (সরকারি ও বেসরকারি): ঐতিহ্যভেদে (সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, মিশ্র ও বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র স্বীকৃতি); সরকারি পর্যায় (জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় বা পৌরসভা); ব্যয়ের ধরন (পরিচালন ব্যয় বা বিনিয়োগ) এবং বেসরকারি অর্থায়ন (অনুদান, বেসরকারি অলাভজনক খাত ও পৃষ্ঠপোষকতা)

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের (অথবা পৌরসভার) ১ দশমিক ৭২ পিপিপি মার্কিন ডলার (1.72 ppp $) বরাদ্দ হয়েছে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে।

সূচক ১১.৫.১: প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে মৃত, নিখোঁজ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা

বাংলাদেশের অনেক শহর মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ; যেমন আগুন ও ভবনধস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমন নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, বন্যা, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভঙ্গুরতা মোকাবিলায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নিয়েছে। উপকূলীয় অভিঘাত সহনশীলতায় মানুষের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে তাৎপর্যপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক অধিনায়ক বলে বিবেচনা করা হয়। এসব উদ্যোগের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুহার অনেকটা কমে এসেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ২০১৯ সালে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে ৪,৩১৮ জন দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এবং প্রতি এক লাখে শূন্য দশমিক ৩১৬ (০.৩১৬) মানুষ প্রাণ হারায়।

সূচক ১১.৫.২: দুর্যোগের কারণে বৈশ্বিক জিডিপির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সরাসরি আর্থিক লোকসান, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি এবং মৌলিক সেবা ব্যাহত হওয়ার পরিমাণ

দুর্যোগে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে দৃশ্যমান সম্পদ। এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে বাড়িঘর, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বাণিজ্যিক ও সরকারি ভবন, পরিবহন, জ্বালানি, অবকাঠামো, ব্যবসায়িক সম্পদ এবং উৎপাদন, যেমন ক্ষেতের ফসল, কৃষি স্থাপনা ও গবাদিপশু। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জিডিপির এক শতাংশ গচ্চা যায় এবং ভবিষ্যতে তা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বাড়বে (জিইডি ২০১৫)।

সূচক ১১.৬.১: বিভিন্ন শহরভেদে পৌর এলাকায় মোট কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের মধ্য থেকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ব্যবস্থাপনার অনুপাত

সব নগর এলাকায় কঠিন বর্জ্য অপসারণ যথাযথভাবে হয় না। ঢাকায় প্রতিদিন যে কঠিন বর্জ্য তৈরি হয়, তার ৬০ শতাংশ সিটি করপোরেশন সংগ্রহ করতে পারে। এই পরিস্থিতি কিছুটা ভালো যথাক্রমে সিলেট ও চট্টগ্রামে, সেখানে যথাক্রমে ৭৬ শতাংশ ও ৭০ শতাংশ কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। কম অনুপাতে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হয় রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল শহরে (জিইডি ২০১৫)।

সূচক ১১.৬.২: বিভিন্ন শহরে (ভরযুক্ত জনসংখ্যা) বার্ষিক সূক্ষ্ম দূষিত কণার (যেমন পিএম২.৫ ও পিএম১০) গড়

বিভিন্ন নগর এলাকায় পিএম ২.৫ ও পিএম ১০-এর মতো সূক্ষ্ম দূষিত কণার বার্ষিক গড় উপস্থিতি বাতাসের মান নির্দেশ করে। বাতাসে ২ দশমিক ৫ মাইক্রনের (পিএম২.৫)সমান বা এর চেয়ে ছোট দূষিত কণার উপস্থিতিতে মানবদেহে বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয় রোগতত্ত্ববিদ্যায়। জটিল মিশ্রণের দূষণ পরিমাপে পিএম ২.৫ একটি কার্যকর সূচক এবং রোগতত্ত্ববিদ্যার গবেষণায় জানা যাচ্ছে, এটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করে। দূষিতকণা, শক্ত কণা এবং তরল ক্ষুদ্রকণা, যা জৈব ও অজৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত, বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। (ইউএনএসকাপ২০২০)।

চিত্র ১১.১: ঢাকায় পিএম ১০ ও পিএম ২.৫-এর প্রবণতা (২০১৩-২০১৮)

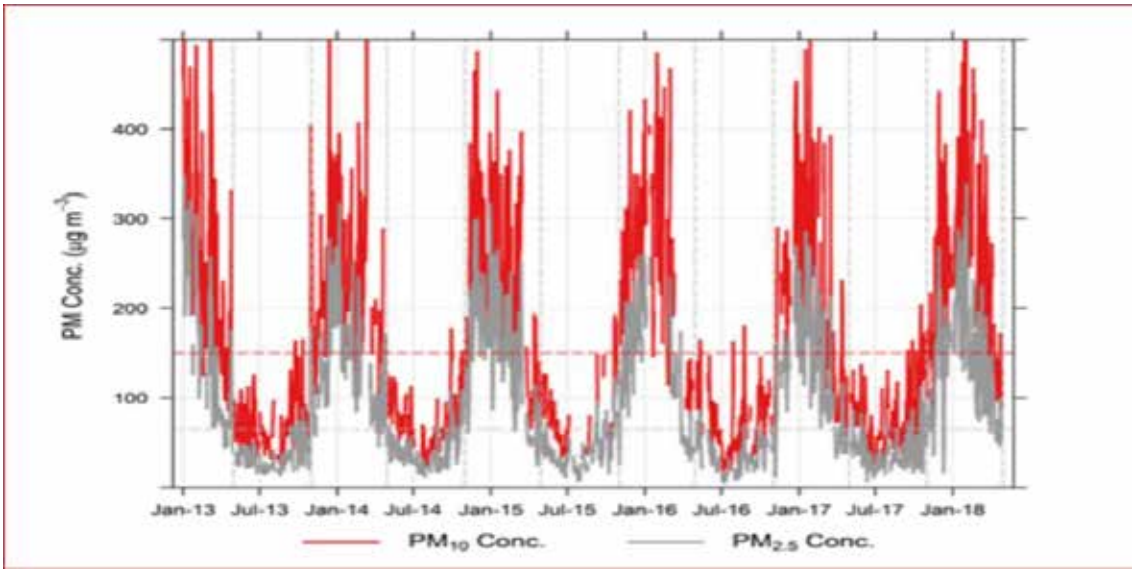

সূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০১৯

সূচক ১১.খ.১: 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, ২০১৫-২০৩০'-এর সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল অবলম্বনকারী ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা

'দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, ২০১৫-২০৩০'-এর সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল (২০১৬-২০২০) অনুমোদন করেছে। এগুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশ দুর্যোগঝুঁকি কমাতে আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে আরও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

সূচক ১১.খ.২: জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকারের অনুপাত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯ সালের তথ্য অনুসারে, জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে স্থানীয় পর্যায়ে সিটি করপোরেশন ০.০৮৩৩ (১/১২) এবং পৌরসভা ০.০০৯১ (৩/৩৩০) আনুপাতিক হারে আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল অবলম্বন করেছে।

১১.৩ টেকসই নগর ও জনবসতি নিশ্চিতে সরকারি প্রচেষ্টাসমূহ

আবাসন: সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আবাসনের গুণগত মানে বেশ উন্নতি দেখা গেছে। এর পাশাপাশি সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (দলিত, হরিজন, বেদে ও অন্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী) জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে। সরকারের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের লক্ষ্য আড়াই লাখ গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন। এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট ও ভবন তৈরি করা হচ্ছে। নগর আবাসনে পূর্বাচল উত্তরা ও ঝিলমিল প্রকল্পে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত কিছু এলাকা রেখেছে রাজউক।

যোগাযোগ অবকাঠামো: সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ। ২০১০ সালে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ ব্যয় হতো অবকাঠামোতে। ক্রমাগত বেড়ে তা ২০১৯ সালে দুই শতাংশে উপনীত হয়েছে। সড়ক অবকাঠামো ও দর্দমা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কাজ করে এলজিইডি, ওয়াসা এবং ইউএলজিআইগুলো।

সড়ক: আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২০১৮-১৯ সালের কর্মপরিকল্পনায় সর্বমোট ১৭৮টি উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। জাতীয় মহাসড়কে ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্ট চিহ্নিত ১২১টি এলাকায় পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবা, মান ও নিরাপত্তায় গুরুত্ব রেখে জাতীয় মহাসড়ককে এ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

সড়ক নিরাপত্তায় নেওয়া উদ্যোগসমূহ

- 'জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-২০২০'প্রণীত হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ সালে তিন লাখ ২৫হাজার ১৫০টি রেট্রো রিফ্লেকটিভ নাম্বার প্লেট এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ উৎপাদন করা হয়েছে।
- সর্বমোট তিন লাখ ৩৫ হাজার ৯১৩টি স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ করা হয়েছে।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (এনএইচ১) ছয় লেনে উন্নীত হবে। এছাড়া অন্য মহাসড়কগুলো পর্যায়ক্রমে ২০২১সাল নাগাদ চার লেনে পরিণত হবে।
- বর্তমানে সরকারের অর্থায়নে নাগরিক সেবা বাড়াতে এলজিইডি ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডির কাছে রয়েছে আরও আটটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, যা সহায়তা পাচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে। বর্তমানে চলমান নগর উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে ৭,৩৬০ কিলোমিটার সড়ক, ১,৫০২ কিলোমিটার নর্দমা, ৩,৩২৯ মিটার সেতু বা কালভার্ট, ৩৬টি বাস বা ট্রাক টার্মিনাল, ২২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, ১৫২কিলোমিটার ফুটপাত, ৪০টি নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভাগাড় এবং ৩৫টি পয়োবর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হবে।

রেলওয়ে: ৪৪টি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২,৯৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নেটওয়ার্ক রয়েছে। দেশে ৩৮টি ট্রেন সার্ভিস চলমান। আধুনিকায়ন করা হয়েছে ১,১৩৫.২৩ কিলোমিটার রেললাইন, ৬৪৪টি রেলসেতু ও ১১৭টি স্টেশন ভবন। আধুনিকায়ন হয়েছে ৯০টি স্টেশনের সিগন্যাল ব্যবস্থা; একই ব্যবস্থার পুনর্বাসন হয়েছে ৯ স্টেশনে, মেরামত করা হয়েছে ৪৩০টি যাত্রীবাহী কোচ ও ২৭৭টি ওয়াগন। ২০০৯ সাল থেকে নিম্নলিখিত অর্জন লিপিবদ্ধ হয়েছে:

- ৩৩০ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ
- ২৯৫টি সেতু স্থাপন, ৯১টি স্টেশন ভবন নির্মাণ
- ২৪৮ দশমিক ৫০কিলোমিটার রেল সংযোগ ডুয়াল গেজে রূপান্তর

নৌপরিবহন: বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) সম্প্রতি ২৩টি প্রকল্প শুরু করেছে। আর সেবার মানোন্নয়নে বিআইডব্লিউটিসি ১৯টি ফেরি, দুটি অভ্যন্তরীণ যাত্রী বহনকারী নৌযান, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ৪টি কন্টেইনারবাহী জাহাজ এবং সব মিলিয়ে ৪১টি সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক নৌযান তৈরি করেছে।

বিমান পরিবহন: কার্যকর ও আকর্ষণীয় যোগাযোগ ও পরিবহন নেটওয়ার্ক বিস্তারে সরকার গুরুত্বপূর্ণ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে:

- পণ্যবাহী উড়োজাহাজের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দ্বিতীয় রানওয়ে নির্মাণ
- চট্টগ্রাম ও সিলেটে রানওয়ে সম্প্রসারণ
- ক্রমবর্ধমান বিমানের সংখ্যা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিমানসেবা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা হালনাগাদকরণ

পদ্মা বহুমুখী সেতু–স্বপ্নের মেগা প্রকল্প: বাংলাদেশে গৃহীত সবচেয়ে বড় অবকাঠামো পদ্মা সেতু রয়েছে অগ্রগতির ল্যান্ডমার্ক হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। নিজস্ব অর্থায়নে ৩৬৫ কোটি মার্কিন ডলারের স্থাপনা এটি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনা করে প্রণীত নকশায় হচ্ছে সেতুটি। আশা করা হচ্ছে, এটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের তিন কোটি (৩০০ মিলিয়ন) মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক হবে।

নিষ্কাশন অবকাঠামো: ঢাকা ওয়াসা চমৎকার পদক্ষেপ নিয়ে একটি নিষ্কাশন মহাপরিকল্পনার উন্নয়ন করেছে। সংস্থাটি নর্দমা ও পয়োনিষ্কাশনের জন্য চারটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোতেও নিষ্কাশন পদ্ধতি উন্নয়ন ওব্যবস্থাপনায় প্রকল্প রয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (বিসিসিটিএফ) সহায়তায় বিভিন্ন পৌরসভা ১০০টির বেশি নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহিষ্ণুতা উন্নয়নের জন্য। নির্বাচিত কিছু পৌরসভায় অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে এলজিইডির মাধ্যমে (ইআরডি ২০১৮)।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের শহরগুলোয় দৈনিক ২৫ হাজার টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের চার ভাগের এক ভাগ হয় ঢাকা শহরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাথাপিছু আবর্জনার উৎপাদন বাড়ায় শহরে কঠিন বর্জ্য বেড়ে ২০২৫ সাল নাগাদ

দৈনিক ৪৭ হাজার টনে পৌঁছাতে পারে। এ নিয়ে কাজ করছে নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (ইউএলজিআই)। ভূমি সংকটের কথা বিবেচনায় নিয়ে সরকার ইনসিনারেশন বা চুল্লিরমতো আধুনিক প্রযুক্তির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে একনেক এরই মধ্যে ডিএনসিসি, ডিএসসিসি ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (এনসিসি) জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া সিটি করপোরেশনগুলো প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রণয়নে জোর দিচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে থ্রি-আর ব্যবস্থাপনা টুল। অর্থাৎ, Reduce বা কমানো, Recycle বা পুনরুৎপাদন এবং Reuse বা পুনর্ব্যবহার। পরিবেশভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প 'প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের অধীনে কম্পোস্ট বা জৈব সার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ, রংপুর ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এবং কক্সবাজার পৌরসভা এলাকায়।

পানি সরবরাহ: চারটি সিটি করপোরেশন– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) পানি সরবরাহ এবং নর্দমা ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। সরকার পানি সরবরাহে তিনটি মেগা প্রকল্প নিয়েছে। এর একটি দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার সরবরাহ ক্ষমতার পদ্মা (জশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্প। দ্বিতীয়টি দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার সক্ষমতার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (তৃতীয় ধাপ)। তৃতীয়টি দৈনিক ৫০ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ঢাকা পরিবেশগত টেকসই পানি সরবরাহ প্রকল্প।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'বাংলাদেশ পৌরসভা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার মান বাড়ানো এবং এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন।

স্যানিটেশন বা তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নাগরিকদের কাছে স্যানিটেশন সেবা পৌঁছাতে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ হয়েছে এবং স্যানিটেশন সুবিধা বেড়েছে ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ (বিইআর ২০১৯)। পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। চারটি ওয়াসা অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ ও নগর এলাকায় সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংস্থাটির উন্নয়ন করা নানা ধরনের ভৌত কাঠামোর মধ্যে রয়েছে পিট ল্যাট্রিন ও শেয়ারড ল্যাট্রিনসহ অন্যান্য কাঠামো। নানা অভৌত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সংহতি ও স্বাস্থ্যবিধি আচরণ প্রশিক্ষণ। ২০২২ সাল নাগাদ সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশ-ব্লক (WASH-block) ল্যাট্রিন স্থাপনে ডিপিএইচই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ও শিক্ষার্থীদের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বা 'ওয়াশ'-সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণ করতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) আনুষ্ঠানিকভাবে মানববর্জ্য (এফএসএম) ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক–আইআরএফ) উন্মোচন করেছে ২০১৭ সালের অক্টোবরে (জিওবি২০১৭)। আইআরএফ-এফএসএমের লক্ষ্য হলো শহর ও গ্রাম এলাকায় মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা। এটি সেপ্টাজ (septage) ব্যবস্থাপনা হিসেবেও পরিচিত। এফএসএমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেপটিক ট্যাংক, ল্যাট্রিনও ময়লা পানি পরিশোধনাগার থেকে তরল বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনও পরিশোধনের যাবতীয় প্রযুক্তি ও কৌশল পদ্ধতি (জিওবি ২০১৭, ঢ়. রী)।

নগর অভিঘাতসহনশীল প্রকল্প: নগর অভিঘাত সহনশীল প্রকল্পের (ইউআরপি)মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশি সরকারি সংস্থা ডিএনসিসি, ডিএসসিসি, এসসিসি, ডিডিএম, রাজউক, এফএসসিডি ও পিসিএমইউ'র সক্ষমতা বাড়ানো, যাতে এগুলো যেন কার্যকর এবং কর্মক্ষমভাবে বারংবার ঘটা ও বড় মাপের দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থার সময় দায়িত্ব পালন করতে পারে। এছাড়াএ প্রকল্পের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানগুলো যেন ঢাকা ও সিলেট শহরে নির্মাণকাজ অনুমোদন এবং ভৌত নিরীক্ষা উন্নত করতে পারে ও পরিচালনা করতে পারে। নগর অভিঘাতসহনশীল প্রকল্প চেষ্টা করে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ও স্থানীয়ভাবে গৃহীত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিস্থিতি তৈরি করতে, শহরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মনোনিবেশ করার ক্ষেত্রে ইউআরপি হচ্ছে ধারাবাহিক বিনিয়োগের শুরুর পর্যায়। এটি কাজ করে শহর পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা উন্নয়নে। এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকে জরুরি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, যোগাযোগ পদ্ধতি, পরিকল্পনা এবং এ-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়া।

বায়ুদূষণ: দ্রুত নগরায়ণের কারণে সারা দুনিয়ায় বায়ুদূষণ বাড়ছে। এই দূষণ বাড়ে দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং যানবাহন ও কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ১১টি বিরামহীন বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রের (সিএএমএস) কার্যক্রম চালানো হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল সিটি করপোরেশন এলাকায়। এই সিএএমএস কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত পরিমাপ করা হচ্ছে বায়ুদূষণের উপাদান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– ওজোন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও

কার্বন মনোঅক্সাইডের পরিমাণ। এ দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে বিকেন্দ্রীকরণ। এ বিকেন্দ্রীকরণের জন্য মহানগর বা মেট্রোপলিশের ধারণা থেকে সরে এসে বড় নগরগুলো থেকে অনেক দূরে আত্মনির্ভরশীল উপশহর নির্মাণের ধারণা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, যা ঢাকার ওপর বিপুল জনসংখ্যার চাপ কমাবে (জিইডি ২০১৯)।

১১.৪ প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ দেশটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকে গতিশীল করেছে। তবে এ দেশটিকে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটিতে পরিণত করতে চাইলে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন: নগরায়ণের গতি ও আওতা কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। এর মধ্যে রয়েছে সাশ্রয়ী আবাসনের বাড়তি চাহিদা মেটানো, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটির মতো নগর দরিদ্র যারা অনানুষ্ঠানিক আবাসস্থলে থাকে। কাজেই ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার জন্য মৌলিক অবকাঠামো-সংবলিত একটি টেকসই শহর উন্নয়ন করা খুব জরুরি। যদিও সরকার আবাসন সমস্যা দূর করার জন্য বহু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন খুব চ্যালেঞ্জিং। এর কারণ দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অত্যন্ত উচ্চ জন ঘনত্ব বিশেষ করে শহর এলাকায় এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা।

সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও টেকসই নগর পরিবহন: পরিবহন ব্যবস্থার অগ্রগতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও ভবিষ্যৎ পরিবর্তন নিয়ে পরিবহন খাত, বিশেষ করে নাগরিক পরিবহন গভীর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে। পরিবেশের ক্ষতি না করে সম্ভাব্য ন্যূনতম সামাজিক ব্যয়ে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী শহরের প্রায় ৬০০ কোটি (ছয় বিলিয়ন) বাসিন্দার বাড়তি পরিবহন চাহিদা কীভাবে মেটানো যায়, তা দেখার বিষয়। এ সূত্রে সরকারি নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণে। ২০৩৫ সাল নাগাদ পাঁচটি মেট্রো রেল সংযোগ, দুটি বাস র‍্যাপিড রুট, এক হাজার ২০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা, ছয়টি ফ্লাইওভার ও তিনটি রিং রোড নির্মাণের পর ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে উন্নত হবে। ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে 'সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা, ২০১৬'। অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজধানীর সড়ক উন্নয়ন এবং সমন্বিত গণপরিবহন ব্যবস্থা। এছাড়া পরিবহন নিরাপত্তা অব্যবস্থাপনা বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে উন্নয়নের জন্য।

বায়ুমানের উন্নয়ন: বাতাস দূষণ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং তা দিন দিন মৃত্যুর বড় কারণ হচ্ছে। অন্তত এক লাখ ২৩ হাজার মানুষ বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেছে বাসস্থানের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের বায়ুদূষণের কারণে। বিষয়টি উঠে এসেছে 'বৈশ্বিক বায়ু পরিস্থিতি, ২০১৯' শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে। নগরায়ণ ও অবকাঠামো নির্মাণের সময় শুষ্ক মৌসুমে বায়ুদূষণ রকেট গতিতে ঊর্ধ্বমুখী থাকে। দূষণের প্রধান প্রধান কারণ শিল্পনির্গত দূষণ, যানবাহনের ধোঁয়া ও বর্জ্য পোড়ানো। আইন থাকলেও বেশকিছু ইটভাটা ঢাকা শহরের চারদিকে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ায় প্রচুর ধুলা এবং ধোঁয়া তৈরি করে, যা ঢাকার ৫২ শতাংশ দূষণের জন্য দায়ী। প্রায় ৬০ শতাংশ ইটভাটা কার্যকর জ্বালানি ব্যবহার শুরু করেছে। সরকার একনিষ্ঠভাবে এ ইটভাটাগুলোর পরিচালনা নজরদারি করছে, যেন এগুলো কার্যকর ও টেকসই জ্বালানি ব্যবহার করে। এছাড়া সরকার অনিবন্ধিত ইটভাটাগুলোর কার্যক্রম বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। শহরে যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে সড়কে যানজট কমানো ও আনফিট বা পুরোনো বাহন সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। পুরোনো বাহন অদক্ষ উপায়ে জ্বালানি পোড়ায় এবং বেশি বেশি দূষিত কণা বাতাসে ছাড়ে।

নগরে অভিঘাত-সহনশীলতা: দরিদ্রগ্রামীণ জনগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন শহরে পরিযায়ী হয়, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ঢাকামুখী। ঢাকায় আসা পরিযায়ীরা প্রধানতঃ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। তারা উপকূল ও হাওর সংক্রান্ত পরিবেশগত ঝুঁকি দুর্যোগ, মঙ্গা এবং নদী ভাঙনের শিকার হয়। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা ও আকস্মিক বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় এলাকার কয়েক মিলিয়ন মানুষকে ঢাকামুখী হতে বাধ্য করবে। ঢাকার ওপর থেকে চাপ কমাতে সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক শহর গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেগুলো হবে অভিঘাত-সহনশীল ও পরিযায়ীবান্ধব। সরকার নাগরিক সেবা দিচ্ছে উপজেলা সদর দপ্তর (৪৯১টি) থেকে, যেন এগুলো ক্ষুদ্র শহর হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে এবং গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি সেন্টারগুলোকে (১৪০০টি) কেন্দ্র করে আবাসন গড়ে ওঠে (ইআরডি ২০১৮)।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা: দেশে দ্রুত নগরায়ণ ও সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নতি সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আরও উন্নত নাগরিক সেবার চাহিদা বাড়িয়েছে। জিইডির এসডিজি অর্থায়ন কৌশল, ২০১৮-এর মূল্যায়ন অনুযায়ী, এসডিজি-১১-সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে

২০২০ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ২৬ কোটি (০.২৬ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার, ২০২৫ সাল নাগাদ ২৮ কোটি (০.২৮ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ও ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৪ কোটি (০.৩৪ বিলিয়ন) মার্কিন মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। আশা করা হচ্ছে, এঅর্থের ২০ শতাংশ সরকারি খাত থেকে, ৬০ শতাংশ বেসরকারি খাত থেকে এবং ২০ শতাংশ পিপিপি থেকে জোগাড় হবে।

ঢাকা ও অন্যান্য শহরে প্রধান প্রধান অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়: শহর এলাকায় অনেক সেবা সরবরাহকারী সংস্থা ও অংশীজন রয়েছে। বাংলাদেশের অনেক নগর এলাকায় জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংযোগ এবং নর্দমা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবেশবান্ধব সবুজ পরিবহন ব্যবস্থা, বাস্তুসংস্থানের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন গগনচুম্বী ভবন তৈরির পাশাপাশি রাজউক, ঢাকা সিটি করপোরেশন ও ওয়াসার মধ্যে সমন্বয় সাধন। 'দূষণকারীই ক্ষতিপূরণ দেবে' এমন শিল্পায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নগরায়ণ হওয়া উচিত ইনটেলিজেন্ট বা বুদ্ধিমান নগরায়ণ তত্ত্বের ভিত্তিতে।

নীতিসমূহ, কৌশল ও মহাপরিকল্পনার মধ্যে ছন্দ তৈরি করা: সিটি করপোরেশন (সিসি) এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রায় সব সংস্থার নিজস্ব উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এই মহাপরিকল্পনাগুলোর মধ্যে প্রায়ই সুসংগতি থাকে না, ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় একটির সঙ্গে আরেকটির বৈপরীত্য দেখা দেয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে উন্নয়ন হস্তক্ষেপ জনদুর্ভোগ বয়ে আনে, যা এড়ানো সম্ভব এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের অপচয় কমানো যেতে পারে। সিটি করপোরেশনগুলোকে মহাপরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সুসংগত করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

১১.৫ সারকথা

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শহর ও গ্রাম দুই জায়গাতেই অমীমাংসিত সংকটগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবেশবান্ধব সবুজ পরিবহন ব্যবস্থা, বাস্তুসংস্থানের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন গগনচুম্বী ভবন তৈরির পাশাপাশি রাজউক, ঢাকা সিটি করপোরেশন এবং ওয়াসার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন। 'দূষণকারীই ক্ষতিপূরণ দেবে' এমন শিল্পায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নগরায়ণ হওয়া উচিত 'ইনটেলিজেন্ট' বা বুদ্ধিমান নগরায়ণ তত্ত্বের ভিত্তিতে। ধনী ও গরিবের ভেদাভেদ সমাধান করা দরকার। একই সঙ্গে প্রয়োজন টেকসই নগরায়ণ নিশ্চিতে সামাজিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার সমাধান করা। নগরের কিছু এলাকায় এখনো পানীয় জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংযোগ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও আবাসন সুবিধার অভাব রয়েছে।

টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ার জন্য আরও মনোযোগ দিতে হবে পরিবেশগত নিরাপত্তা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, জনমুখী প্রযুক্তি ও অবকাঠামো অবলম্বন, সময়োপযোগী জমি ব্যবহার পরিকল্পনা, সামাজিক নিরাপত্তায় প্রবেশাধিকার, পরিবহনমুখী উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ, জনঅংশগ্রহণ ও আঞ্চলিক একাত্মকরণ বা ইন্টিগ্রেশনের প্রতি। সাধারণভাবে এগুলো নির্ভর করে কতটা ভালোভাবে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, তার ওপর। প্রকৃত নগর উন্নয়ন ও নানা প্রতিকূলতার মোকাবিলায় অবস্থান দৃঢ় করতে বাংলাদেশ এরই মধ্যে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিকূলতাগুলোর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও টেকসই নগর উন্নয়নের বাধাসমূহ। বাংলাদেশ বেশকিছু ভালো নীতি গ্রহণ করেছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর পরিবহনে প্রবেশাধিকার উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। এ মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ হলো সময়মতো দরকারি সমন্বয় ও গুণগতমান ঠিক রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উৎপাদন ধারা ও পরিমিত ভোগ নিশ্চিতকরণ

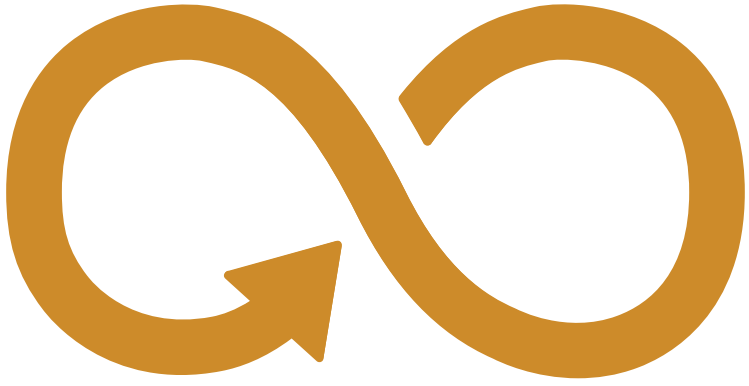

১২.১ এসডিজি ১২ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বিশ্বজুড়ে মাথাপিছু বস্তুগত ভোগের দ্রুত প্রসারের পাশাপাশি বস্তুগত সম্পদের ওপর মাথাপিছু জনসংখ্যার চাপও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি এসডিজি ১২ ও অন্য এসডিজির অভীষ্ট অর্জনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। বর্তমান বস্তুগত ভোগ উৎপাদন ও ভোগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের ফলে যেন প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবনমন না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্পদ কার্যকারিতা উন্নত করা, অপচয় কমানো এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির সব খাতে স্থিতিশীলতার অনুশীলন মূলধারায় আনার জন্য নীতিমালা দরকার।

২০১৭ সালে পৃথিবীব্যাপী বস্তুগত ভোগ ছিল ৯২ দশমিক ১ বিলিয়ন টন, যা ২০১৫ সালের ৮৭ বিলিয়ন টনের চেয়ে বেশি। ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছরই সম্পদ আহরণের গতি বাড়ছে। এতে প্রতীয়মান হয়, প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বাড়ছে, যাতে পরিবেশগত উৎসের ওপর অযাচিত চাপ তৈরি হচ্ছে। জরুরি ও সম্মিলিত কার্যক্রম নেওয়া না হলে বৈশ্বিক সম্পদ উত্তোলন ২০৬০ সাল নাগাদ বেড়ে ১৯০ বিলিয়ন টন হতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনসংখ্যার মাথাপিছু চাপ (ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট) উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সীমিত সম্পদের ওপর পুরো মানবজাতির চাপ বেড়েছে। ১৯৯০ সালে বছরে একজন ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হতো ৮ দশমিক ১ টন প্রাকৃতিক সম্পদ। আর ২০১৫ সালে একজন ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাতে দরকার হয় ১২ টন সম্পদ।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক কমানো দরকার। কেননা সীমিত সম্পদে মানুষের চাপ (ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট) ও অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ খুব দ্রুত বাড়ছে। এখন নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো আটকে পড়ছে সম্পদ-ঘনিষ্ঠ ভোগ এবং প্রজন্ম ধরে উৎপাদন ধারার ওপর। দক্ষিণ এশিয়ায় রাজস্বের বড় একটা অংশ আসে খাদ্য ও অন্য পণ্য উন্নত দেশে রপ্তানি থেকে। এভাবে এ অঞ্চলের পরিবেশগত ক্ষতির অনেকটাই হয় পণ্য উৎপাদনে, অথচ তা ভোগ হয় এই অঞ্চলের বাইরের দেশে। এসডিজি-১২-এর আলোকে দক্ষিণ এশিয়ায় অগ্রাধিকার পাচ্ছে জীবনচর্চা ও আচরণ এবং রাসায়নিক ও বর্জ্য-সম্পর্কিত বিষয়গুলো। টেকসই সংগ্রহ অনুশীলনের পাশাপাশি কোম্পানিগুলোর টেকসই অনুশীলন ও টেকসই প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া অবলম্বনকে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। গুরুত্ব পাওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে আরও রয়েছে বর্জ্য উৎপাদন কমানো, রসায়নির পদার্থ ও বর্জ্যসমূহের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা, বায়ু, পানি ও মাটিতে ক্ষতিকর উপাদানের নিঃসরণ কমানো ও মাথাপিছু খাদ্য নষ্ট করার হার কমানো। ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহারে সফলতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে এসব লক্ষ্য নির্ধারণ করা রয়েছে। এছাড়া পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর ১০ বছর মেয়াদি কর্ম কাঠামো (১০ ওয়াইএফপি) বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে রিও+প্লাস সম্মেলনে ১০ ওয়াইএফপি গ্রহণ করা হয়। এটি প্রণয়ন করা হয়েছে পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (এসসিপি বা সাসটেইনেবল কনজাম্পশস অ্যান্ড প্রোডাকশন) এবং সম্পদ-কার্যকারিতায় উদ্যোগ সৃষ্টি করার জন্য। এছাড়া এগুলো আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুকরণ এবং আরও বড় পরিসরে বাস্তবায়ন করার জন্য। একই সঙ্গে এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সম্পদের ব্যবহার ও পরিবেশের ক্ষতির মধ্যকার সম্পর্ক কমাবে।

পৃথিবীব্যাপী ফসল আহরণ-পরবর্তী অপচয় (পিএইচএল) অনেক বেশি। এজন্য কার্যকর প্রযুক্তি খাদ্য নিরাপত্তায় নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। এ প্রযুক্তি লোকসান কমিয়ে কৃষক, গ্রামীণ দরিদ্র ও শহুরে ভোক্তাদের ভোগের জন্য বেশি পরিমাণ খাদ্যের জোগান দিতে পারে। লোকসান কমানো গেলে তা থেকে ভোক্তারা কম দামে কেনার সুযোগ পায় এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া প্রক্রিয়া ও বিপণনের মতো ফসল ওঠানোর পরবর্তী কার্যক্রম কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং কৃষি খাতে খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি করে। আহরণ-পরবর্তী লোকসান কমানো হলে তা সুস্পষ্টভাবে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার প্রচেষ্টাগুলোর পরিপূরক হতে পারে।

খাবার অপচয় কমানোর কৌশলের জন্য সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোজন প্রয়োজন। কেননা এ ধরনের লোকসান ঘটে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে। বিশ্বে নিম্ন আয়ের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে, আয় বাড়াতে ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টায় খাদ্য অপচয়ের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন-ধরন নিশ্চিতে মৌলিক পরিবর্তন সক্রিয় করতে সুচিন্তিত জাতীয় নীতিকাঠামো জরুরি। ২০১৮ সালে ৭১টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৩০৩টি নীতিকৌশলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। মন্ট্রিয়ল প্রটোকল এবং ব্যাসেল, রটারড্যাম ও স্টকহোম কনভেনশনের অংশীদাররা চুক্তির আওতায় তাদের করণীয় বিষয় বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্য পাঠাতে সম্মত হয়েছে। তবে তথ্য পাঠানোর হারে ব্যাপকভাবে তারতম্য ঘটে। এই চারটি চুক্তিতে গড় প্রতিপালনের হার ৭০ শতাংশ।

১২.২ বাংলাদেশে এসডিজি ১২ অর্জনে হালনাগাদ চিত্র

সূচক ১২.১.১: জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন (এসসিপি) অন্তর্ভুক্তকারী অথবা জাতীয় নীতিমালায় এসসিপি অগ্রাধিকার বা লক্ষ্য হিসেবে মূলধারায় রাখা দেশগুলোর সংখ্যা

এই সূচকে কিছু দেশকে সংখ্যায় পরিমাপ ও পরিবীক্ষণ করা হয়, যে দেশগুলো পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রণীত বাধ্যগত ও অবাধ্যগত নীতিচক্র অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জন করছে। এই কাঠামোর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: 'পণ্য ও সেবার ব্যবহার যা জীবনমান উন্নত করতে মৌলিক প্রয়োজন মেটায়। একই সঙ্গে তা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং বিষাক্ত উপাদান ও বর্জ্য দূষণ পদার্থের নিঃসরণ কমিয়ে আনে এবং তা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনকে বিপদে ফেলে।' (ইউএনএসকাপ, ২০২০)

২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে একটি ১০ বছর মেয়াদি পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন কাঠামো তৈরির কাজ করছে।

সমষ্টিগত ভোগের পদাঙ্ক (ফুটপ্রিন্ট) থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে সার্বিক ভোগের প্রবণতা ও জিডিপি অনুপাত কমছে, যদিও জীবনযাপনের মানে উন্নতি দেখা গেছে (চিত্র ১২.১)। জিডিপির প্রতি ইউনিটে ভোগের প্রবণতা ও মাথাপিছু ভোগ অনুযায়ী এ দুটির সম্মিলন থেকে বোঝা যায়, একদিকে ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (স্থির বাংলাদেশি টাকায়) ১১ দশমিক ২ শতাংশ হারে বাড়ছে। অন্যদিকে জিডিপির (স্থির মানে) প্রতি ইউনিটে ভোগ ব্যয়ের প্রবণতা ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে বাড়ছে। এর অর্থ অর্থনীতি পরিমিত ভোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে (চিত্র ১২.২)।

চিত্র ১২.১: জিডিপির শতাংশ হিসাবে ভোগের প্রবণতা

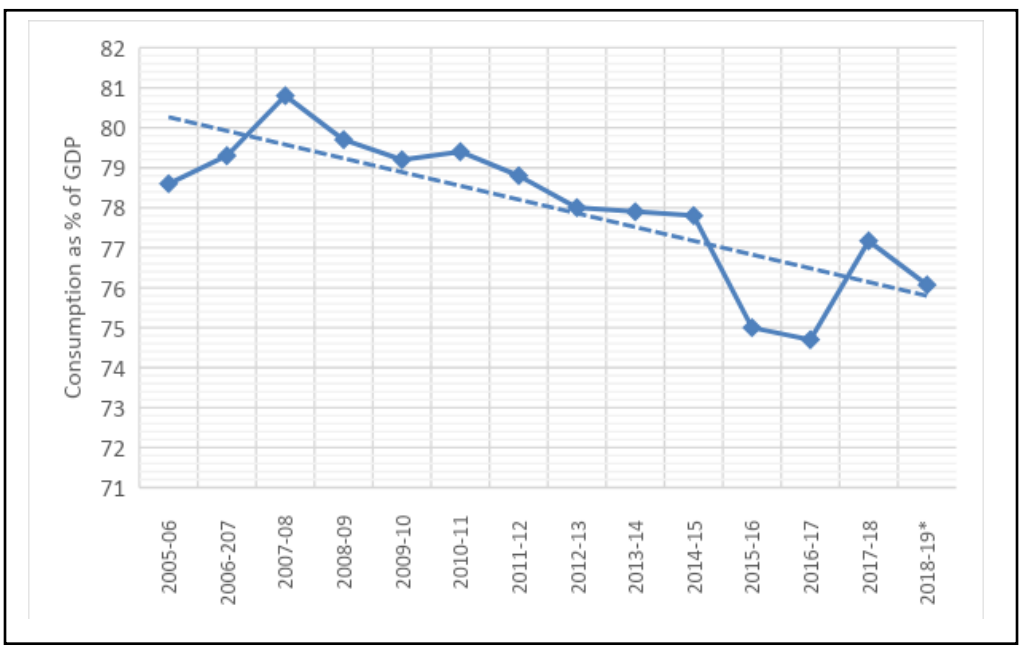

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯

চিত্র ১২.২: ভোগ ব্যয়ের প্রবণতা

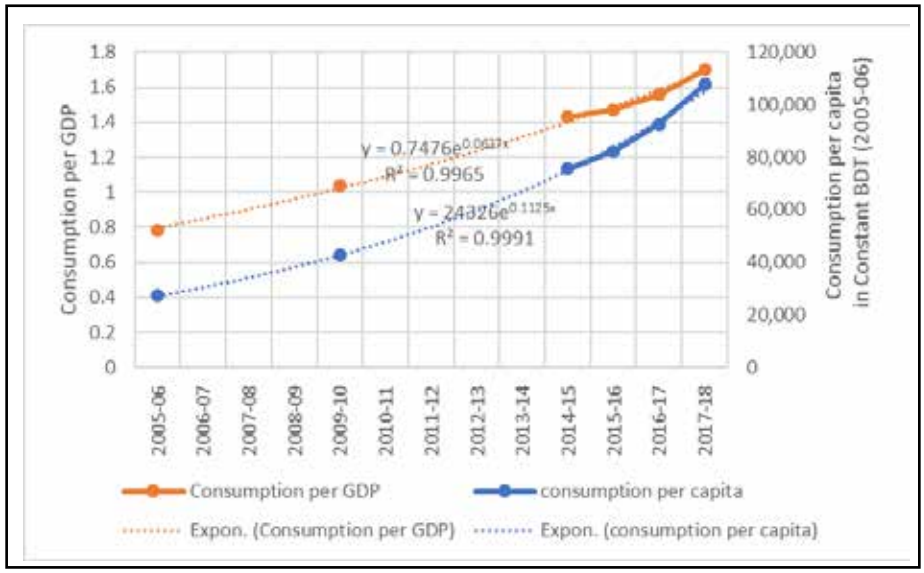

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯

টেকসই উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট উৎপাদনে জ্বালানি ব্যবহারের হ্রাস পাওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি কার্যকর জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি টেকসই উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। বাংলাদেশে জিডিপির প্রতি এক হাজার মার্কিন ডলারে জ্বালানি (প্রাথমিক জ্বালানি) ব্যবহার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমছে, যা উৎপাদনে জ্বালানি কার্যকারিতার বৃদ্ধিকে ইঙ্গিত করছে (চিত্র ১২.৩)।

চিত্র ১২.৩: জিডিপির প্রতি এক হাজার ডলারে প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহার

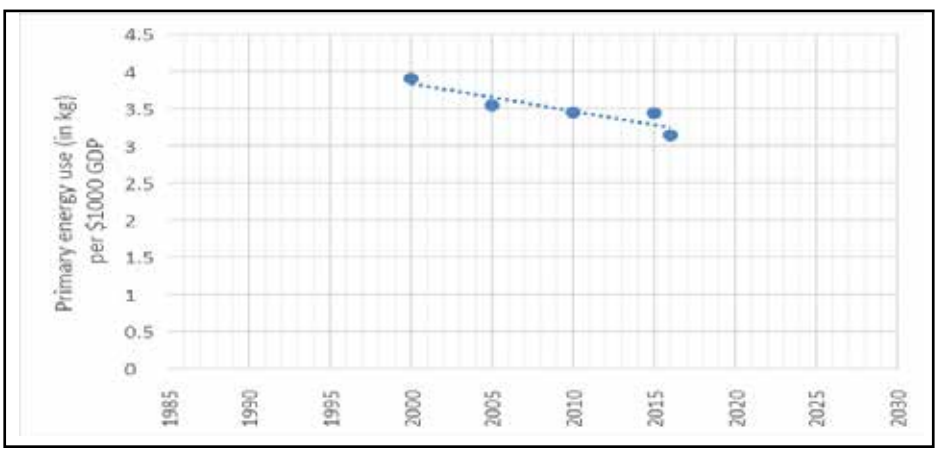

সূত্র: বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত

সূচক ১২.২.১: উপাদান পদাঙ্ক, মাথাপিছু উপাদান পদাঙ্ক ও প্রতি জিডিপিতে উপাদান পদাঙ্ক

উপাদান পদাঙ্ক (এমএফ) হলো কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত চাহিদা মেটানোর জন্য বৈশ্বিক উপাদান আহরণ। মোট উপাদান পদাঙ্ক হলো বায়োম্যাস, জীবাশ্ম জ্বালানি, আকরিক ধাতু ও আকরিক অধাতু উপাদান পদাঙ্কের সমষ্টি। এটা হিসাব করা হয় আমদানি করা কাঁচামাল এবং অভ্যন্তরীণভাবে আহরিত উপাদান যোগ করে তা থেকে কাঁচামাল রপ্তানির সমমূল্য বিয়োগ করে। উপাদান পদাঙ্ক ইঙ্গিত করে একটি দেশে জাতীয় চাহিদার (খরচ ও মূলধন বিনিয়োগ) জন্য সম্পদের পরিমাণ অথবা নিঃসরণ। এটি একটি দেশের জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য সরবরাহ শৃঙ্খলের সম্পদ ও নিঃসরণ (পৃথিবীর যে প্রান্তেই ঘটুক না কেন) দেখায় একটি দেশের ভোগের দায়িত্ব। এ পদাঙ্ক কৌশল বাণিজ্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহের জন্য প্রত্যক্ষ সূচকগুলোকে সংশোধন করে (সূত্র: ইউএনইপি, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সম্পদের ব্যবহার)।

সারণি ১২.১: বাংলাদেশের উপাদান পদাঙ্ক

বছর	বায়োম্যাস (মাথাপিছু টন)	অ-ধাতব খনিজ (কেজিপ্রতি মার্কিন ডলার (২০১০) জিডিপি)	জীবাশ্ম জ্বালানি, (মাথাপিছু টন)	উপাদান পদাঙ্ক, মোট (মিলিয়ন টন)
২০০০	১.০০৮১৩	১.৩৫৯৪	০.০৬২২৪২৫	২২৮.১০৭
২০০৫	১.০১২২৬	১.২২৪৮৭	০.০৮২০৩৯৯	২৫৯.২০৭
২০১০	১.১২২৮৯	১.০২৭৬২	০.১২০৮৭৯	৩০৪.৯৯
২০১৫	১.১৪৪৫৬	১.০১৪৫৯	০.১৫৬৯০৭	৩৬৭.৪৬৭
২০১৬	১.১৫৮২৯	০.৯৭৯০৭১	০.১৬১৬২৩	৩৭৮.১৬৮
২০১৭	১.১৭১৮১	০.৯৪৩৫১৩	০.১৬৬২৫৬	৩৮৮.৮৭

সূত্র: ইউএনএসকাপ, ২০২০

সূচক ১২.২.২: অভ্যন্তরীণ উপাদান ভোগ, মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উপাদান ভোগ এবং জিডিপিপ্রতি অভ্যন্তরীণ উপাদান ভোগ

অভ্যন্তরীণ উপাদান বা বস্তুগত ভোগ (ডিএমসি) হলো উপাদান প্রবাহ হিসাবরক্ষণের (এমএফএ) পরিমাপক। এটি একটি জাতীয় অর্থনীতির বার্ষিক বস্তুগত ভোগ হিসাব করে। এটি পরিমাপ করা যেতে পারে মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ হিসাব (আমদানি বাদ দিয়ে), বায়োম্যাস ভোগ, অধাতু খনিজ, জীবাশ্ম জ্বালানি অথবা ধাতু আকরিক ব্যবহার থেকে। এটি সারণি ১২.২-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.২: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভোগ

বছর	মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ (মাথাপিছু টন)	অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ–বায়োম্যাস (কেজিপ্রতি মার্কিন ডলার [২০১০] জিডিপি)	অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ–অধাতব খনিজ (কেজিপ্রতি মার্কিন ডলার [২০১০] জিডিপি)	অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ–জীবাশ্ম জ্বালানি (মাথাপিছু টন)	অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ–জীবাশ্ম জ্বালানি (কেজিপ্রতি মার্কিন ডলার [২০১০] জিডিপি)	অভ্যন্তরীণ বস্তুগত ভোগ–ধাতু আকরিক (মিলিয়ন টন)
২০০০	২.০০৩৭৬	২.৭১৮৬৮	১.০০২০৩	০.০৭৮৪৮৬৪	০.১৫২৯৮৯	২.১০২৫৬
২০০৫	২.২২৮৮৮	২.২৯৮৯৫	১.১৪৮৮২	০.০৯৮৭০৬২	০.১৬০৮৪৯	২.০০৫৯৯
২০১০	২.৪৭৬৭২	২.০৭৭০৫	০.৯২২৮৬৫	০.১৩১৯০৮	০.১৭০০০১	২.৫২২৫৮
২০১৫	২.৬৫৫৩১	১.৬৭৪৭৫	০.৮০১২৩৮	০.১৬৫৯৬৩	০.১৬৬৬৮৩	৩.৭৫৮৩
২০১৬	২.৭০০২৮	১.৬০১১৯	০.৭৭৩৫২৫	০.১৭০৬৩১	০.১৬১৭৫২	৩.৮৮৪১৩
২০১৭	২.৭৪৪৫	১.৫২৯৫৪	০.৭৪৫৭৩২	০.১৭৫২১২	০.১৫৬৬৯৩	৪.০০৯৯৬

সূত্র: ইউএনএসকাপ, ২০২০

সূচক ১২.৩.১: বৈশ্বিক খাদ্য লোকসান সূচক

অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও ভোগের সময় খাদ্য অপচয় ও লোকসান ঘটে, যা বড় একটি উদ্বেগের বিষয়। এটাই সত্য, অথচ কয়েক মিলিয়ন মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটের কারণে অপুষ্টিতে ভোগে এবং দুর্দশার শিকার হয়। বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রেফ্রিজারেটরের ব্যবহার বাড়ছে। এর কল্যাণে খাদ্য তৈরি-পর্যায়ে অপচয় কমছে। বর্তমানে ৯২ শতাংশের বেশি মানুষের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। উপরন্তু পরিবহন নেটওয়ার্ক, প্রশিক্ষণ এবং অন্য কার্যক্রমের কল্যাণে খাদ্যগ্রহণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও তৈরি পর্যায়ে নৈপুণ্য বাড়ছে। একটি সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের অপচয় ৫ দশমিক ৫ শতাংশ, যার ৩ শতাংশ হয় ক্রয় ও প্রস্তুতি পর্যায়ে। ১ দশমিক ৪ শতাংশ অপচয় হয় পরিবেশন ও ১ দশমিক ১ শতাংশ হয় প্লেটে (আহমেদ ২০১৬)। যাহোক, পৃথিবীর অন্য অংশের মতোই শহর এলাকায় খাদ্য অপচয়ও একটি উদ্বেগের বিষয়। এছাড়া ফসলের প্রায় ১০ শতাংশই আহরণ-পরবর্তী কার্যক্রমের সময় লোকসান হয়।

সূচক ১২.৪.১: বিপজ্জনক এবং অন্যান্য রাসায়নিক ও বর্জ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক বহুপক্ষীয় পরিবেশগত চুক্তিতে অংশীদারের সংখ্যা, যারা প্রতিটি প্রাসঙ্গিক চুক্তির প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণে তাদের অঙ্গীকার ও বাধ্যবাধকতা পূরণ করে

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে: ক. বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর ও তা অপসারণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাসেল কনভেনশন; খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নির্দিষ্ট কিছু বিপজ্জনক রাসায়নিক ও কীটনাশকের জন্য আগাম অবহিতকরণপূর্বক সম্মতি প্রক্রিয়ার জন্য রোটারডাম কনভেনশন; গ. ধারাবাহিক জৈব দূষণীয়ের বিষয়ে স্টকহোম কনভেনশন; ঘ. ওজোন স্তর ক্ষয়কারী পদার্থের বিষয়ে মন্ট্রিয়ল প্রটোকল; এবং ঘ. পারদ সংক্রান্ত মিনামাতা কনভেনশন। নিচের মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি চুক্তির বিন্যাস অনুযায়ী স্কোর গণনা হয়: (ইউএনএসকাপ, ২০২০)

ক. ব্যাসেল কনভেনশন:

১. একটি ফোকাল পয়েন্ট এবং একটি অথবা তারও বেশি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মনোনীত করা (১ পয়েন্ট)
২. অবহিতকরণের সময় বার্ষিক জাতীয় প্রতিবেদন দাখিলকরণ (প্রতি রিপোর্টে ১ পয়েন্ট)

খ. স্টকহোম কনভেনশন:

১. স্টকহোম কনভেনশনের আনুষ্ঠানিক কন্টাক্ট পয়েন্ট ও জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট মনোনীতকরণ (১ পয়েন্ট)
২. জাতীয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা দাখিলকরণ (১ পয়েন্ট)
৩. প্রতিবেদনের সময়কালে 'কনফারেন্স অব পার্টিস'-এ অবলম্বন করা সংশোধনীর সঙ্গে সংগতি রেখে যাচাইকৃত জাতীয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (পরিকল্পনাগুলো) জমা দেওয়া (প্রতিটি যাচাইকৃত ও হালনাগাদকৃত পরিকল্পনার জন্য ১ পয়েন্ট)।

গ. মন্ট্রিয়ল প্রটোকল:

১. মন্ট্রিয়াল প্রোটোকলের অধীনে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী বস্তুর উৎপাদন ও ভোগের বিষয়ে প্রতিবেদনের শর্ত প্রতিপালন (১৫ পয়েন্ট)
২. মন্ট্রিয়াল প্রোটোকলের (আর্টিকেল ৪বি) অধীনে লাইসেন্সিং পদ্ধতির তথ্য জমা দেওয়া (৫ পয়েন্ট)

চিত্র ১২.৪: ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যসংক্রান্ত চুক্তিতে প্রতিপালনে স্কোর

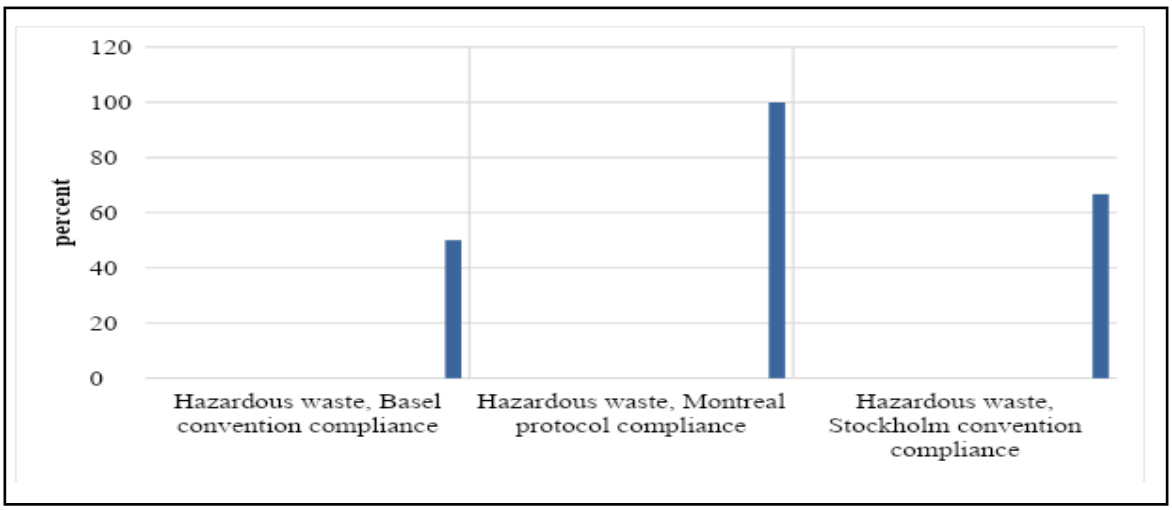

সূত্র: ইউএনএসকাপ, ২০২০

সূচক ১২.৪.২: বর্জ্য শোধনের ধরনভেদে মাথাপিছু ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য তৈরি এবং তা পরিশোধনের অনুপাত

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা বড় একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলদেশ হিমশিম খাচ্ছে পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য, শিল্পবর্জ্য এবং শহরে বাতাসদূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়ে। অন্য অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশও পরিচ্ছন্ন নগর (স্মার্ট সিটি) উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। ঢাকা

ও চট্টগ্রামের মতো বড় মহানগরের জন্য কাজটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। তবে ছোট ছোট শহরে বর্জ্য পুনঃচক্রায়ণ ও পুনর্ব্যবহার করে কমপোস্ট সার তৈরির কাজ চলছে। বাংলাদেশে 'স্মার্ট সিটি' ধারণা প্রসারে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নানা উদ্যোগ রয়েছে। সম্প্রতি যশোর শহরে প্রথমবারের মতো সমন্বিত ভাগাড় ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শহরের প্রতিদিনের বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ ও সার তৈরি হচ্ছে। সিলেট সিটি করপোরেশনে সবুজ শহরের ধারণার প্রসার হচ্ছে এবং নাগরিক উদ্যোগে বর্জ্য প্রক্রিয়া করে তা থেকে সার তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

সূচক ১২.গ.১: জিডিপির (উৎপাদন ও ভোগ) প্রতি ইউনিটে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকির পরিমাণ এবং মোট জাতীয় ব্যয়ের অনুপাত হিসাবে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকি

জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকি পরিমাপের জন্য তিনটি উপসূচকের সমষ্টিতে এ সূচকের সৃষ্টি। উপসূচক তিনটি হলো: ১. সরাসরি সরকারি তহবিল থেকে ভর্তুকি; ২. মূল্য সহায়তা হিসেবে ভর্তুকি; এবং ৩. একটি ঐচ্ছিক উপসূচক হিসেবে কর ও অন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্য প্রণোদনা এবং সরকারিভাবে পণ্য ও সেবার কম মূল্য নির্ধারণ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও, ১৯৯৪) অধীনে আইইএ পরিসংখ্যান ম্যানুয়াল (আইইএ, ২০০৫) এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিস অ্যান্ড কাউন্টারভেইলিং মিজারসের (এএসসিএম) আলোকে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান দপ্তরের 'সেন্ট্রাল প্রোডাক্ট ক্লাসিফিকেশন' থেকে প্রমিত বিবরণ ব্যবহার করে স্বতন্ত্র জ্বালানি পণ্যের শ্রেণিকরণ করা উচিত।

সারণি ১২.৩: জীবাশ্ম জ্বালানি ভর্তুকি

বছর	জীবাশ্ম জ্বালানি কর-পূর্ব ভর্তুকি (ভোগ ও উৎপাদন) (মাথাপিছু মার্কিন ডলার)	জীবাশ্ম জ্বালানি কর-পূর্ব ভর্তুকি (ভোগ ও উৎপাদন) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	জীবাশ্ম জ্বালানি কর-পূর্ব ভর্তুকি (ভোগ ও উৎপাদন) (জিডিপির %)
২০১৩	২৭.৪০	৪,২৮৯.৯৭	২.৬৫২
২০১৫	১৫.৫২	২,৪৮১.৬৪	১.১৮৬
২০১৮	১.৮০	২৯৪.১১	০.৬৩

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার ও (ইউএনএসকাপ ২০২০)

১২.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

সার্বিকভাবে পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (এসসিপি) ধরনের জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন করা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের আভাস দেয়। এর মধ্যে রয়েছে এসসিপিতে পরিবর্তনের জন্য দেশের সামষ্টিক নীতি, নিয়ন্ত্রক, স্বেচ্ছা, অথবা আর্থিক দলিলের নথিকরণ। এছাড়া অনুশীলনে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে এ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন করাও বড় বিষয়।

যেহেতু জীবাশ্ম জ্বালানি পরিবেশের নানা উপায়ে ক্ষতি করে, তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে এর সম্পর্ক কমানো এসসিপি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যে লোকসান ও অপচয় কমাতে বেশ কিছু উদ্যোগ এবং মধ্যস্থতা প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো সরকারি-বেসরকারি খাতসহ সব সংশ্লিষ্টকে নিয়ে বৃহৎ আবহে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যাহোক সমস্যার কারণ শনাক্ত ও তার সুপারিশ নির্ধারণে গবেষণাসহ আরও লক্ষ্যকৃত উদ্যোগ নেওয়া দরকার। অন্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে লক্ষ্য নির্ধারণ, নীতিমালার উন্নয়ন, আইনি কাঠামো কার্যকর করা, বাজারভিত্তিক দলিল (যেমন কর, প্রণোদনা ও ভর্তুকি কর্মসূচি) এবং অবকাঠামোয় বিনিয়োগ। একই সঙ্গে জাতীয় ক্যাম্পেইন ও শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি ও অ্যাডভোকেসি করা। এসডিজি ১২-এর অধীনে অনেক লক্ষ্যের পর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ কাঠামো নেই, যা একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ। অনেক সূচকই টায়ার থ্রি সূচক। অর্থাৎ এই সূচকের জন্য এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কোনো ব্যবস্থা (পদ্ধতি/মানদণ্ড) নির্ধারণ নেই, যা পদ্ধতি/মানদণ্ড উন্নয়ন ও তার যাচাইয়ে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

বিকাশমান ধারা ও কৌশলগত শূন্যতা শনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন খাত ও সংস্থায় এসসিপিতে পরিবর্তনের ধারা পরিবীক্ষণ করা অপরিহার্য। এছাড়া উদ্ভাবনী ও ফলপ্রসূ অনুশীলনগুলোকে অনুকরণ ও বড় পরিসরে পরিচালনার জন্য এবং পরিবর্তনে আরও বেশি গতি বাড়ানোর ও এসসিপির সুবিধাগুলো দেখানোর জন্য এটি অপরিহার্য।

একটি দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য ভোগের আগেই অনেক বেশি অনুপাতে (প্রায় চার ভাগের এক ভাগ) লোকসান বা অপচয় হয়। এটি সম্পূর্ণ খাদ্য উৎপাদন শৃঙ্খলের জন্য হুমকি। উদ্ভাবন ও যান্ত্রিকীকরণসহ অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার কৃষি উৎপাদনের সব পর্যায়ে অপচয় ও লোকসান কমাতে পারে। নানা পর্যায় বলতে ফসল মাড়াই, আহরণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও খানা পর্যায়ে ভোগ বোঝায়।

এসডিজি ১২-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নানা সক্ষমতার পর্যায় উন্নয়নে বাংলাদেশের জন্য সক্ষমতা বিনির্মাণ ও টেকসই অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ। সফল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও এতে প্রবেশাধিকার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১২.৪ ভবিষ্যৎ করণীয়

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৪ শতাংশ আশা করা হচ্ছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৌশলগত নীতিমালা। পরিবেশের ক্ষতি না করেই দীর্ঘ মেয়াদে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতেই এ নীতিমালার উদ্ভব (জিইডি, ২০১৬)। অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থান তৈরির মধ্য দিয়ে মানুষের ক্ষমতায়ন এবং শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া। এছাড়া রয়েছে শ্রমশক্তির কর্মদক্ষতা উন্নয়নে সমর্থন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা দেওয়া।

উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বর্জ্য কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করার বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সংক্রান্ত অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে রয়েছে, কৃষিকাজ টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অংশিদারিত্ব তৈরি করা; আইসিএম, আইএনএম, আইডিএম, আইপিএমের (সেক্সফেরোমন, জৈবিক কীটনাশক ও জীববৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ) ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করা; ভূ-উপরিস্থিত ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার এবং কৃষিকাজে সৌরশক্তির প্রয়োগ; জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির কৃষক, পরামর্শদাতা, ব্যবসায়ী, বিতরণকারী, উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রশিক্ষক ও গবেষকদের সামর্থ্য বাড়ানো; বৃষ্টিনির্ভর কৃষি উন্নয়ন; কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর কৌশল অবলম্বন; জীববৈচিত্র্যে (গাছপালা, প্রাণী, মাছ, পরাগায়নকারী ইত্যাদি) রক্ষা করা; নিরাপদ খাদ্য, পুষ্টি ও আহার বৈচিত্র্য জনপ্রিয় করা; পানি, মাটি ও জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা; কৃষি অনুশীলনের আর্থিক সম্ভাব্যতা টিকিয়ে রাখা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য সক্ষমতার পরিবেশ তৈরি করা।

এসডিজি ১২-এর অঙ্গীকার পূরণে সরকার বেশকিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সরকার পরিকল্পনা করছে ২০৩০ সাল নাগাদ শতভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন এবং পরিচালনা করবে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬০ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ আঙিনায় বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) বসিয়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ চালু ইটভাটার ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবেশবান্ধব নতুন প্রযুক্তি অবলম্বন করেছে। এ হার ভিত্তিবছর বা ২০১৫ সালে ছিল ৫০ দশমিক ২ শতাংশ। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ শতভাগ ইটভাটা পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।

পৌর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দেশের জন্য অগ্রাধিকার। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাসাবাড়ি, উৎপাদক ও নির্মাণ কোম্পানির সঙ্গে কাজ করা দরকার। নিশ্চিত করতে হবে যেন ই-বর্জ্যসহ সব ধরনের বর্জ্য শক্তি অথবা সারে পরিণত করা হয়। এই বর্জ্য ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনো শিল্পে রিসাইকেল করতে হবে, যেন পৌর এলাকায় আবর্জনার পরিমাণ কমে।

পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য যদি যথাযথভাবে পরিশোধন করা না যায়, তাহলে তা ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে প্রবেশ করে সেখানে মজুত থাকা পানি দূষিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, কার্যকর নীতিমালা না থাকায় শহর এলাকায় জীবনযাত্রার মান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু কঠিন বর্জ্য তৈরির মাত্রা বাড়ছে। আকাশচুম্বী ভবনের বাসিন্দাদের মাথাপিছু দৈনিক বর্জ্য উৎপাদন আগের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়ে এক কেজিতে পৌঁছেছে।

১২.৫ সারকথা

এসডিজি ১২-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইটভাটার দূষণ নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে দেশের একটি লক্ষ্য আছে। সব ইটভাটাকে ২০২৫ সাল নাগাদ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় আনার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু উদ্যোগে রয়েছে। পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ও শিল্পবর্জ্য কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণিধানযোগ্য কৌশল অবলম্বন করা দরকার। এর প্রেক্ষিতে পরিবীক্ষণ করা চ্যালেঞ্জিং কাজ হওয়ায় কারখানাভিত্তিক ইটিপি ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। এর পরিবর্তে কৌশলটি হতে পারে বড় বড় শিল্প এলাকার সংস্থাগুলোকে সিইটিপি বসানোর দায়িত্ব দেওয়া, তার ব্যবস্থাপনা করা এবং গুরুত্বপূর্ণ নগরকেন্দ্রে পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এসটিপি বসানোর দায়িত্ব দেওয়া। একই সময়ে বেসরকারি খাতকে জড়িয়ে বর্জ্যকে জ্বালানি ও সারে রূপান্তরে নীতিমালা তৈরির প্রয়োজন রয়েছে।

১৩ জলবায়ু কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ

১৩.১ এসডিজি ১৩ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

পৃথিবীব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণ বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবণতা ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। দুনিয়ার সব অঞ্চলে সুস্পষ্টভাবে এর প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। জলবায়ুখাতে অর্থায়ন প্রবাহে ইতিবাচক পদক্ষেপ ও এ-সংক্রান্ত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রগতি দেখা গেলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উপশম ও অভিযোজনের আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করা দরকার। অর্থায়নের প্রাপ্যতা ও সামর্থ্য জোরদারকরণ আরও দ্রুত করা দরকার, বিশেষ করে কম উন্নত ও আরও বেশি জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবিত দেশের ক্ষেত্রে এটি জরুরি।

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে বেড়ে চলা জিএইচজি নিঃসরণ। ২০১৭ সালে জিএইচজি ঘনত্ব নতুন উচ্চতায় পৌঁছে। বিশ্বব্যাপী সিওটুর তিল ভগ্নাংশন (মোল ফ্র্যাকশন) প্রতি মিলিয়নে অংশ বা পিপিএম (parts per million) ২০১৫ সালের ৪০০.১ পিপিএম থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে পৌঁছায় ৪০৫.৫ পিপিএমে। ২০৩০ সালের নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা, যা ২ ডিগ্রি ও ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্জনে কার্বন নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব সফলতা আনতে হবে।

১৯৯৮ থেকে ২০১৭ সালের মাঝে দুর্যোগের কারণে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লাখ কোটি (তিন ট্রিলিয়ন) মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। জলবায়ু-সম্পর্কিত ও ভূ-প্রকৃতিগত দুর্যোগের কারণে প্রাণ হারায় ১৩ লাখ (১.৩ মিলিয়ন) মানুষ। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৮৫ দেশ ও সংস্থা প্যারিস চুক্তি অনুমোদন করেছে। প্যারিস চুক্তি অনুমোদনকারী অংশীদারদের জাতিগতভাবে নির্ধারিত উদ্যোগ (এনডিসি) তৈরির বিধান রয়েছে। এ বিধান পরিপালন ও তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল আবশ্যক। এ পর্যন্ত ১৮৩টি দেশ ও সংস্থা জলবায়ু কার্যক্রম বিষয়ে জাতিগতভাবে নিজেদের নির্ধারিত উদ্যোগ সম্পর্কে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন রূপরেখা সম্মেলনের (ইউএনএফসিসিসি) সচিবালয়কে অবহিত করেছে। এই চুক্তির আওতায় সব দেশকে নতুন করে জাতিগতভাবে নির্ধারিত উদ্যোগের বিষয়ে অবহিত করতে হবে ২০২০ সালের মধ্যে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সংশোধিত ও আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা।

দক্ষিণ এশিয়ায় সব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাবের সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ আগের তুলনায় অনেক বেশি এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন জলবায়ু রীতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না হলে এতে অমোচনীয় পরিণতি দেখা দেবে। জলবায়ু-সংক্রান্ত দুর্যোগের কারণে বার্ষিক গড় আর্থিক ক্ষতি দ্রুত বাড়ছে। একই সঙ্গে জলবায়ু-সংক্রান্ত ভূ-প্রকৃতিগত বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ছে মানুষের ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে থাকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় জরুরি ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও নিম্ন-কার্বন নিঃসরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা দরকার।

ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সহায়তা দেওয়া হলে তা অভীষ্ট ১৩ এবং অন্য এসডিজি অর্জনে সরাসরি অবদান রাখবে। জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অন্তর্ভুক্ত দুর্যোগঝুঁকি পদক্ষেপ, টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মানব নিরাপত্তার সঙ্গে এই কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, বাড়তি বিনিয়োগ ও বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করেই এখনো বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা শিল্পায়ন-পূর্ব যুগের চেয়ে বাড়তি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা সম্ভব। বর্তমানে এটি শিল্পায়ন-পূর্ব তাপমাত্রার চেয়ে বাড়তি দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দরকার জরুরি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামষ্টিক কার্যক্রম।

জলবায়ুকার্যক্রমে বৈশ্বিক অর্থায়ন প্রবাহ২০১৩-১৪ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে ১৭ শতাংশ বেড়েছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্য অভিযোজন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার জন্য ২০১৯ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ২৮টি দেশ সবুজ জলবায়ু তহবিলের (জিসিএফ) অর্থ পেয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে বিতরণ করা তহবিলের পরিমাণ সাড়ে সাত কোটি (৭৫ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও অভিযোজন পরিকল্পনা পদ্ধতির জন্য সর্বমোট ৭৫টি দেশ জিসিএফের সহায়তা চেয়েছে। তাদের দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ ১৯ কোটি ১০ লাখ (১৯১ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার।

১৩.২ অগ্রগতির পর্যালোচনা

সূচক ১৩.১.১: দুর্যোগের কারণে প্রতি এক লাখের মধ্যে মৃত, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা

বাংলাদেশের নিচু সমতল ভূ-সংস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব, আর্থসামাজিক পরিবেশ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব দেশটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে অসহায় করে তুলেছে। যেসব দুর্যোগ প্রায়শ হানা দেয় তার মধ্যে রয়েছে অননুমেয় বৃষ্টিপাত, বাড়তি তীব্র

বন্যা, খরা ও চরম তাপমাত্রা। দুর্যোগ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রায় ১৩ শতাংশ খানা ও ১২ দশমিক ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করে। ২০১৪ সালে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে ১২ হাজার ৮৮১ জন দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' (বিডিপি ২১০০) ইঙ্গিত দেয়, 'জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা ও অন্য বদ্বীপ-সম্পর্কিত পরিবেশ ঝুঁকির কারণে নদী মোহনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে। তবে অর্থনৈতিক আকার বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতির পরিসর হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে উপকূলীয় এলাকা।' বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ার তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা প্রতি লাখে দেড় হাজারের মধ্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

সারণি ১৩.১: দুর্যোগের কারণে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি

বছর	১০০,০০০-এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত	১০০,০০০-এ মৃত
২০১৬	১২৮৮১	০.২০৪৫
২০১৭	৭৬৫৬	০.৪৪২৭
২০১৮	২২	০.২৩৭৫
২০১৯	৪৩১৮	০.৩১৬

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে আঘাত হানা প্রধান দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডোও ভূমিকম্প। চিত্র ১৩.১ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ ভূমিই বন্যাপ্রবণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের প্রবণতাও পরিবর্তিত হচ্ছে। হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহ হ্রদে বন্যার (জিএলওএফ বা গ্লেসিয়ার লেক আউটবার্সট ফ্লাডিং) আশঙ্কা বাড়ছে। এসবের ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও বেশি বন্যা মোকাবিলার আশঙ্কা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এত কিছুর সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে। এছাড়া বেশি বেশি ঘূর্ণিঝড় এবং উপকূলীয় অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় খরা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

চিত্র ১৩.১: বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকা

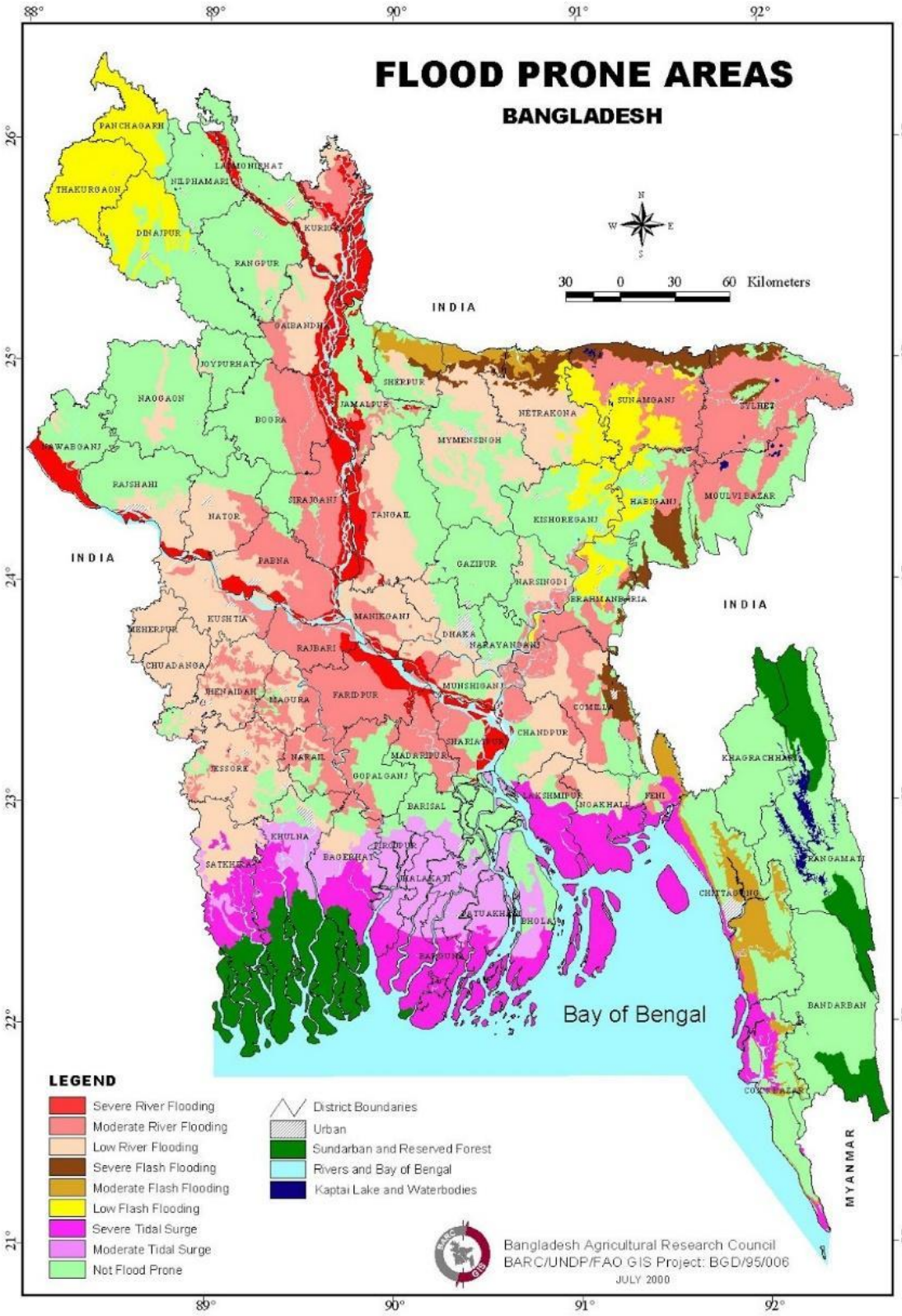

বাংলাদেশ গত বছরগুলোয় অনেকে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় সরকার দৃষ্টান্তমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি তৈরি করেছে, যা ঘূর্ণিঝড়ের হতাহতের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমাতে পেরেছে। এটি অনেক দেশের দুর্যোগ প্রস্তুতিতেও রোল মডেল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৯৮ ও ২০১০ সালের মধ্যে দেশে এক লাখ ৯১ হাজার মানুষ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় বিশ্বব্যাপী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৩২ কোটি ৩০ লাখ (৩২৩ মিলিয়ন)।

বাড়তি বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে ভূমিধসের ঘটনা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, ভূমিধসের প্রবণতা এবং এ থেকে হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়ই ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস ঘটে। বাংলাদেশে আরও কয়েক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত করে। চিত্র ১৩.২-এ দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ০.৬ শতাংশ ও বন্যায় ২৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। অধিকাংশ দুর্যোগ জলবায়ু-সম্পর্কিত এবং এ কারণেই বাংলাদেশের উচিত বহু রকমের কৌশল উন্নয়ন করা।

চিত্র ১৩.২: দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত খানার অনুপাত (২০০৯-২০১৪ সাল)

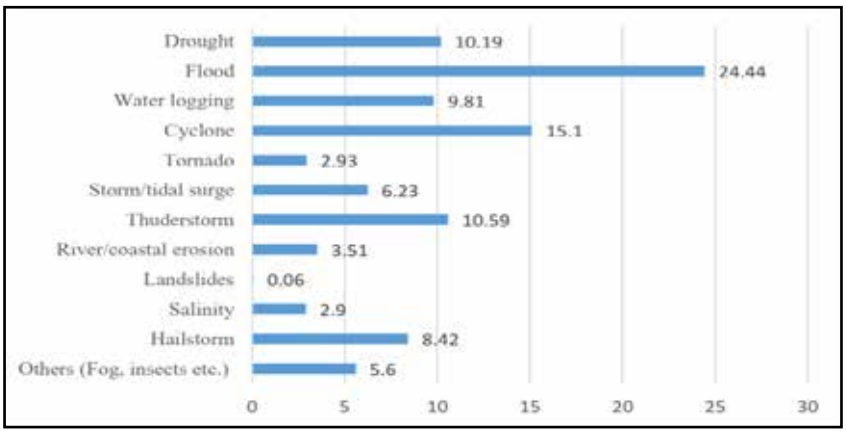

সূত্র: জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৮

সূচক ১৩.১.৩:'দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, ২০১৫-২০৩০'-এর সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল অবলম্বনকারী ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা

'দুর্যোগঝুঁকি প্রশমনে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, ২০১৫-২০৩০'-এর সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল (২০১৬-২০২০) অনুমোদন করেছে। এগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু আন্তর্জাতিক প্রটোকলে অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

সরকার জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে। এতে সুশীল সমাজ সংগঠন ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে নিয়ে যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্যোগঝুঁকি প্রশমন (ডিআরআর) পদ্ধতি অনুসরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ডিআরআর পদ্ধতি দুর্যোগ-সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা বাংলাদেশ দুর্যোগ-সহনশীল বাসস্থান নির্মাণ, দুর্যোগ-সহিষ্ণু ফসল উদ্ভাবন এবং দুর্যোগ সহনশীল জীবনযাত্রা কৌশল উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, ২০১৫-২০৩০'-এর সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল (২০১৬-২০২০) অনুমোদন করেছে সরকার। এগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু আন্তর্জাতিক প্রটোকলে অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয় কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে ১২ সিটি করপোরেশনের একটি এবং ৩৩০ পৌরসভার মধ্যে ১২টিতে স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

সূচক ১৩.২.১: একটি সমন্বিত নীতি/কৌশল/পরিকল্পনা প্রণীত বা প্রযুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ওইসব দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিসহ গ্রিনহাউস গ্যাসনির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে, যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনোভাবে হুমকির সম্মুখীন না হয় (যেমন জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান, জাতীয় যোগাযোগ, দ্বিবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা অন্যান্য)।

কার্বন নিঃসরণ কমাতে জাতীয় প্রতিশ্রুতি (এনডিসি) বা ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনে সিওটু নিঃসরণ কমানোর অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগে স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটে ৫ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় আরও ১৫ শতাংশ কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) হালনাগাদ করেছে। এনডিসি'তে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দিয়েছে বিদ্যুৎ, পরিবহন,জ্বালানি ও শিল্পের হালনাগাদকরণে বিনিয়োগ করার বিষয়ে। যাতে এসব উদ্যোগ সিওটু নিঃসরণ কমাতে সহায়ক হয়। সবুজ প্রবৃদ্ধি থেকে কম নিঃসরণ কৌশলের বিষয়েও বাংলাদেশ কাজ করছে।

সূচক ১৩.খ.১: নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অগ্রাধিকারসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপদ্ধতি এবং অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বিনির্মাণসহ সহায়তার পরিমাণ ও বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ বা রাষ্ট্রের সংখ্যা।

বাংলাদেশ ২০১৮ সালে সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) থেকে অর্থ পেয়েছে তিনটি কর্মসূচির জন্য। এগুলো হলো পরিচ্ছন্ন রান্না কর্মসূচি, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং বাংলাদেশ অভিঘাত-সহনশীল অবকাঠামো মূলধারায় উন্নীতকরণ। এ কর্মসূচির কিছুঅংশ অন্য উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকেও অর্থ সহায়তা পায়।

পরিচ্ছন্ন রান্না কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত রান্নার চুলা ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা দূর করা হচ্ছে। এতে গৃহস্থালি পর্যায়ে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমানো এবং ব্রিকেট, এলপিজি ও বায়োগ্যাসের মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার জনপ্রিয় করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে দুই লাখ ১১ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থী পরিবার এলপিজি পেয়েছে। ফলে আশ্রয় শিবির ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জ্বালানি কাঠের ব্যবহার ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প

দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) একটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কোম্পানি। এটি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প ব্যবহার বাড়াতে অর্থায়ন করছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত এক হাজার ৬৩০ সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো প্রচলিত বিদ্যুৎচালিত কিংবা ডিজেলচালিত সেচ পাম্পগুলোকে স্থানান্তর করেছে (বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০ শতাংশ হয় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে)। এ পাম্পগুলোর মোট ক্ষমতা প্রায় ৩২ এমডব্লিউপি বা মেগাওয়াট পিক।

নাজুক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানো

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধির আশঙ্কার ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ। এ জন্য সেখানে সরকারের রয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, বিকল্প জীবিকা অর্জন কৌশল, লবণাক্ততা-সহিষ্ণু জাতের ধানের প্রসার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভিঘাত-সহনশীলতা তৈরি।

১৩.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে নিয়মিত সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়। সময়ের ব্যবধানে এগুলো তীব্রতর হয়েছে এবং নতুন ধরনের দুর্যোগ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর এ কারণে অভিবাসন সমস্যা সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে কৌশলে পরিবর্তন এসেছে। তবে যেহেতু বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের (ইউএমআইসি) দেশ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই দেশটিকে উপশম কৌশলের আওতা বাড়াতে হবে, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে চাকরির নিরাপত্তা ও কয়েক মিলিয়ন মানুষের সম্পদ রক্ষা। অসংখ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পদ রক্ষার জন্য বাংলাদেশ কৌশল উন্নয়ন করেছে, যে মানুষগুলোর জীবন নির্ভর করে

কৃষিকাজ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু পালন ও মৎস্য চাষের ওপর। এসব মানুষের অধিকাংশই দুর্যোগের সময় ব্যাপক নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাব সাংঘাতিকভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে এ দেশের অনেক সাফল্যকে, যা অর্জিত হয়েছে গত দুই দশকে।

১৩.৪ ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং আশা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তহবিল পাবে। তবে জিসিএফ থেকে অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে ধীরগতি রয়েছে। ২০১৯ সাল নাগাদ নিম্নআয়ের দেশের জন্য অনুমোদিত অর্থের মাত্র ৩২ দশমিক ৪ শতাংশ ছাড় হয়েছে। এই হার নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ ও উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে ২৫ দশমিক ১ শতাংশ। তহবিল ছাড়করণ প্রক্রিয়ায় কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে, যেন বাংলাদেশের মতো দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। উপরন্তু সরকারের উচিত সঠিকভাবে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। এটি ভবিষ্যৎমুখী অভিযোজনমূলক একটি পরিকল্পনা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য গৃহীত হয়েছে।

এছাড়া নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেশি হুমকির সম্মুখীন। কেননা তাদের বহুমাত্রিকভাবে দরিদ্র হওয়ার আশঙ্কা বেশি। পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্যোগে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা যেমন বেশি, তেমনি রয়েছে বাস্তুচ্যুত হওয়ারও আশঙ্কা। জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অসমতার মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের অসমতা উপেক্ষা করে'লিঙ্গ-অন্ধ' হওয়া উচিত হবে না। এসডিজি ১৩-এর অগ্রগতি পরিমাপে জলবায়ু পরিবর্তনে নারীর ওপর প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। এছাড়া জলবায়ু কর্মসূচিতে লিঙ্গবৈষম্য মোকাবিলায় দৃঢ় পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গতানুগতিক ধারার বাইরে উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি তা মূল্যায়ন করাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে সহজলভ্য উপাত্তের বাইরে জেন্ডার সংবেদনশীল সূচকগুলোর পরিমাপ অত্যন্ত দুরূহ।

১৩.৫ সারকথা

মানুষের দুর্দশা লাঘবে বাংলাদেশ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যা সমন্বিত ভৌত ও অভৌত কৌশলের ফল। এসব পদক্ষেপের অংশ হলো আবাসের জন্য আশ্রয় ও বাঁধ নির্মাণ, মানুষের সামর্থ্য বাড়ানো, স্বেচ্ছাসেবীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো, যেন মানুষকে আগে ভাগেই দুর্যোগের বিষয়ে অবগত করা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে বন্যার পার্থক্য রয়েছে। বন্যা জটিল একটি বিষয় এবং একাধিক স্থিতি মাপকের ভিত্তিতে এটি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হয়। উপরন্তু অনেক শহর তৈরি হয়েছে প্লাবনভূমি এলাকায়। এতে বন্যা ও জলাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিস্থিতির সঙ্গে কার্যকরভাবে মানিয়ে নিতে জাতীয় সীমান্তের ভেতরে ও বাইরে খুব গুরুত্বের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। নতুন বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে ধীরে ধীরে শুরু হওয়া খরা, কম মাত্রার ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি। এগুলোর কারণে ব্যাহত হতে পারে উপকূলীয় গ্রাম বাংলায় কয়েক মিলিয়ন মানুষের জীবনযাত্রা। এ কারণে এমন নতুন কৌশল দরকার, যা শুধু জীবনই রক্ষা করবে না, বরং আয়ের উৎস এবং অন্য সম্পদও রক্ষা করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের গভীর প্রভাব রয়েছে জীববৈচিত্র্যে ও মানুষের জীবনে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু এবং সাগর উষ্ণ হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি ও আরও তীব্র খরাহুমকিতে ফেলছে মিঠাপানির জোগান ও ফসলকে। এতে ঝুঁকির মুখে পড়ছে দেশের বর্ধনশীল জনসংখ্যার আহার জোগানোর উদ্যোগ। এ পরিস্থিতির উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়া পরিবর্তনশীল জলবায়ু দেশের খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করবে, যেখানে এখনই খাদ্যের অনিশ্চয়তা রয়েছে। এটি শস্য, গবাদিপশু ও মাছের উৎপাদনশীলতা কমানোর মাধ্যমে খাদ্যের জোগানে প্রভাব ফেলবে। এছাড়া যারা উপার্জনের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল, এমন কয়েক মিলিয়ন গ্রামীণ মানুষের জীবিকা বাধাগ্রস্ত হবে। যেহেতু বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের অর্থনীতি দুটোই কোভিড-১৯ মহাদুর্যোগের মুখোমুখি, তাই এ মহামারি-পরবর্তী সময়ে দেশকে পরিবেশবান্ধব সবুজ অর্থনীতির দেশ হিসেবে পুনর্নির্মাণ করাও জরুরি।

১৪ জলজ জীবন

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

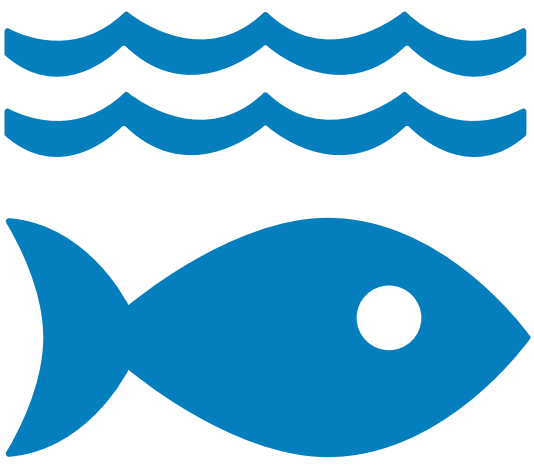

১৪.১ এসডিজি ১৪ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সাগরে সংরক্ষিত এলাকার আওতা বাড়ানো এবং সমুদ্র সম্পদের সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতির ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতির পাশাপাশি অতিরিক্ত মৎস্য শিকারের প্রতিকূল প্রভাব ও উপকূলীয় শ্যাওলার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মহাসাগরে বর্ধনশীল অম্লত্ব মোকবিলা করা যাচ্ছে না। কয়েকশ কোটি মানুষ তাদের জীবিকা অর্জন ও খাদ্যের জন্যনির্ভর করে মহাসাগরের ওপর, যার সীমানা স্পর্শ করে অসংখ্য দেশ। সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও তা সংরক্ষণে সকল পর্যায়ে বাড়তি প্রচেষ্টা ও হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড (সিওটু) গ্রহণের ফলে সমুদ্রের অম্লত্ব বাড়ছে। এতে সাগরের পানির রাসায়নিক গঠন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সাগরের অম্লত্বের বিষয়ে ৩০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় গড়ে ২৬ শতাংশ অম্লত্ব বেড়েছে। এ হারে চলতে থাকলে এই শতকের শেষ নাগাদ ১০০ শতাংশ থেকে ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত অম্লত্ব বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে সামুদ্রিক জীবনের ওপর গুরুতর প্রভাব পড়বে।

মৎস্য ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে মাছের মজুত জীববৈজ্ঞানিক ও টেকসই উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। বিশ্লেষণে জানা যায়, জৈবিকভাবে টেকসই পর্যায়ে মাছের মজুত ১৯৭৪ সালের ৯০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৫ সালে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

২০১৮ সালের শেষ নাগাদ সাগরের ২৪ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার (১৭ দশমিক ২ শতাংশ) অঞ্চল সমুদ্র সংরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয় (কোনো দেশের জাতীয় সীমানার শূন্য থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল ওই দেশের অধিক্ষেত্রভুক্ত) যা ২০১৫ সালের তুলনায় ১২ শতাংশ এবং ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। বৈশ্বিক সংরক্ষিত অঞ্চলের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকা ২০০০ সালের ৩১ দশমিক ২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ৪৫ দশমিক ৭ শতাংশ হয়েছে।

সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান ও মৎস্য আহরণের ওপর অনেক মানুষের জীবিকা নির্ভর করে। কিন্তু অবৈধ, অগোচরীভূত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাছ ধরার কারণে টেকসই মৎস্য আহরণ ও মানুষের জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইনসমূহের একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে, যা মৎস্য ব্যবস্থাপনার নানাদিক নির্দেশ করবে। বেশিরভাগ দেশ অযাচিত মাছধরা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এর ব্যবস্থাপনায় নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। অবৈধ, অগোচরীভূত ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা প্রতিরোধ, চিহ্নিত ও নির্মূল করার জন্য 'দি এগ্রিমেন্ট অন পোর্ট স্টেট মিজারস' শীর্ষক চুক্তিটি এ ধরনের প্রথম আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার চুক্তি। এটি ২০১৬ সালে কার্যকর হয়। এই চুক্তিতে অনুস্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৮ টিতে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশও এর আওতাভুক্ত।

প্রায় সব দেশেই স্বল্প পরিসরে মাছ ধরা অব্যাহত রয়েছে, পরিমাণ ও মূল্যের হিসেবে যা মোট আহরণের প্রায় অর্ধেক। উৎপাদনশীল সম্পদ, সেবা ও বাজারে ক্ষুদ্র পর্যায়ের মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার প্রসারে অধিকাংশ দেশ উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করেছে। তবে ২০ শতাংশের বেশি দেশে এই কাঠামো বাস্তবায়নের হার নিম্ন বা মাঝারি পর্যায়ে রয়েছে।

১৪.২ এসডিজি ১৪ অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান

জৈব ও অজৈবসহ সব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রক্ষায় সংরক্ষিত সমুদ্র এলাকা নির্ধারণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সামুদ্রিক সম্পদ মৌলিক অবস্থায় সংরক্ষণ করা। সামুদ্রিক সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ ৩৮টি সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর মধ্যে আটটি উপকূলীয় সংরক্ষিত সমুদ্র এলাকা রয়েছে।

সুন্দরবন থেকে শুরু হয়ে সেন্টমার্টিন দ্বীপ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ তটরেখা রয়েছে। বাস্তুসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা (হটস্পট) সেন্টমার্টিন দ্বীপ। দ্বীপটির দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরে প্রবাল এবং একটি কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে। এটাই একমাত্র প্রবালবসতি, যা দ্বীপের পূর্ব তীরে অবস্থিত। সেখানে ব্যাপক বৈচিত্র্য এবং সামুদ্রিক শ্যাওলা ও শামুকের পরিমিত ঘনত্ব রয়েছে। অন্যদিকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও লোনা পানির কুমির রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান (হটস্পট) হল সুন্দরবন।

বাংলাদেশ ২০১৫-১৬ সালে ৬ লাখ ২৬ হাজার টন সামুদ্রিক মাছ আহরণ করে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ উৎসে উৎপাদিত হয় ৩২ লাখ ৫১ হাজার টন মাছ। এতে বোঝা যায়, গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের সম্পদ আহরণের সক্ষমতা সীমিত। এছাড়া বাংলাদেশ গভীর সমুদ্র রিজার্ভ থেকে তেল ও গ্যাস আহরণে এখনো কোনো কৌশল উন্নয়ন করেনি। স্থানীয়ভাবে পরিচিত ইলিশকে বাংলাদেশের জাতীয় মাছ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মেধাস্বত্ব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ২০১৭ সালে ইলিশকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে জিআই স্বত্ব নেওয়া হয়। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছের একটি অন্যতম মাছ ইলিশ, যা মোট আহরিত মাছের ১৬ শতাংশ।

সূচক ১৪.৫.১: মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি

পাওয়া যাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সংরক্ষিত অঞ্চলের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১-এ দেওয়া আছে। সারণি ১৪.২ হতে দেখা যায়, দেখাচ্ছে, সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা (এমপিএ) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রসার হচ্ছে। ২০১৪ সালে সরকার বঙ্গোপসাগরে সংরক্ষিত এলাকার আওতায় চারটি জোন ঘোষণা করার ফলে এর আওতা দ্রুত বেড়েছে।

সারণি ১৪.১: সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকার আওতা

সময়	সমুদ্র অঞ্চলের তুলনায় সংরক্ষিত এলাকা (ইইজেড) (রাষ্ট্রাধীন জলজ এলাকার%)	সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা (ইইজেড) (বর্গকিমি)	সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতাভুক্ত সামুদ্রিক গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকার অনুপাত (শতকরা)
২০১৪			৩৪.৪৬৮৬
২০১৫			৩৪.৪৬৮৬
২০১৬			৩৪.৪৬৮৬
২০১৭	৫.৩৫৬৯৪	৪,৫২৯.৯৯	৩৪.৪৬৮৬
২০১৮	৫.২৭২২১	৪,৪৫৮.৩৫	৩৪.৪৬৮৬

সূত্র: ইউএনএসকাপ, ২০২০

সরকার দেশের প্রথম সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা হিসেবে ২০১৪ সালের অক্টোবরে 'দ্য সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া' প্রতিষ্ঠা করে। 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২'-এর আওতায় এটি তিমি, ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, হাঙ্গর এবং অন্য সামুদ্রিক প্রাণী রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৩' অনুসারে বঙ্গোপসাগরের 'মিডল গ্রাউন্ড অ্যান্ড সাউথ প্যাচেস'-এ আরেকটি এলাকা সংরক্ষিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো একত্রে দুই লাখ ৪৩ হাজার ৬০০ হেক্টর এলাকা (সারণি ১৪.২) নিয়ে গঠিত, যা বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক এলাকার (১১,৮৮১,৩০০ হেক্টর বা ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার) আড়াই (২.৫) শতাংশ। সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ইলিশের ডিম ছাড়ার মৌসুমের সংরক্ষিত এলাকাও অন্তর্ভুক্ত হলে এর মোট আয়তন বেড়ে দাঁড়াবে ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ। ২০৩০ সাল নাগাদ এর পরিমাণ ১০ শতাংশে পৌঁছানোর লক্ষ্য রয়েছে।

সারণি ১৪.২: বাংলাদেশের সংরক্ষিত সামুদ্রিক অঞ্চল

প্রতিষ্ঠার বছর	অবস্থান	আয়তন(হেক্টর)	সংরক্ষিত এলাকার নাম
১৯৮০	কক্সবাজার	১৭২৯	হিমছড়ি এনপি
১৯৮১	ভোলা	৪০	চর কুকরিমুকরি ডব্লিউএস
১৯৮৩	কক্সবাজার	১১৬১৪.৫৭	টেকনাফ ডব্লিউএস
১৯৯৬	খুলনা	৩৬৯৭০.৪৫	সুন্দরবন দক্ষিণ ডব্লিউএস
২০০১	নোয়াখালী	১৬৩৫২.২৩	নিঝুম দ্বীপ এনপি
২০০৪	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২	মেধাকচ্ছপিয়া ডব্লিউএস
২০০৭	কক্সবাজার	১৩০২.৪২	ফাসিয়াখালী ডব্লিউএস
২০১০	চট্টগ্রাম	৪৭১৬৫.৫৭	দুদপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি ডব্লিউএস
২০১০	পটুয়াখালী	১৬১৩	কুয়াকাটা এনপি
২০১২	পটুয়াখালী	৫৬০	সোনার চর ডব্লিউএস
২০১৪	বঙ্গোপসাগর	২৪৩৬০০	সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড পার্ক (৪ জোন)

সূত্র: চৌধুরী, ২০১৫

সূচক ১৪.৭.১: উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত দেশ এবং সব দেশের জিডিপি অনুপাতে টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষ

এই সূচক টেকসই মৎস্য আহরণের মান নিরূপণ করে। দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণে মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারনিশ্চিত করে। ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং উইংয়ের (এনএডব্লিউ, ২০১৮) হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে জিডিপির অনুপাতে টেকসই মৎস্য আহরণের মান ৩ দশমিক ১৪ শতাংশ, যা ২০১৫ সালের ভিত্তি বছরে জিডিপির ৩ দশমিক ২৯ শতাংশের তুলনায় কিছুটা কমেছে।

সূচক ১৪.গ.১: আইনগত নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মহাসাগর সম্পৃক্ত দলিলাদির মাধ্যমে মহাসাগরের সম্পদ ও তার স্থিতিশীল ব্যবহারকল্পে সাগর আইন বিষয়ে জাতিসংঘ কনভেনশনে প্রতিফলিত যে আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, তাতে অনুসাক্ষর ও স্বীকৃতিদানসহ বাস্তবায়নে অগ্রগামী দেশের সংখ্যা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (২০১৯) হিসাবে, সমুদ্র বিষয়ে বাংলাদেশের অনুমোদন দেওয়া অথবা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়া আন্তর্জাতিক প্রটোকল/চুক্তি/আইন/দলিলের সংখ্যা ১০০টি। এগুলো জাতিসংঘ-সমর্থিত পন্থায় আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করে। মহাসাগর ও এগুলোর সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রণীত আন্তর্জাতিক চুক্তির নাম 'দ্য কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি'। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত প্রায় ৯০টি সমুদ্র-সম্পর্কিত আইন কার্যকর করেছে।

১৪.৩ সরকারের প্রচেষ্টা

সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার বাংলাদেশের অগ্রাধিকারের একটি বিষয়। কেননা এখন পর্যন্ত এ সম্পদের ব্যবহার কমই হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। সমুদ্র হলো বিশাল একটি সংরক্ষণাগার। এটি ভবিষ্যতের খাদ্য, জলবায়ু রক্ষা, জ্বালানি, খনিজ এবং চিকিৎসাসেবার জোগানদাতা। বাংলাদেশের জন্য এখন যেটা জরুরি তা হলো– সাগরকে দূষণ থেকে রক্ষার পাশাপাশি সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং এর সম্পদ টেকসইভাবে ব্যবহার করা। বাংলাদেশ ২০১৪ সালে রাজধানী ঢাকায় একটি সম্মেলন আয়োজন করে, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল বঙ্গোপসাগরের চারদিকে অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে সামুদ্রিক অর্থনীতি উন্নয়ন করা। এছাড়া বাংলাদেশ 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন' বা আইওআরএ'র অংশ। এর উদ্দেশ্য হলো ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সহযোগিতা ও আলোচনা জোরদার করা।

বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় ছোট ও বড় প্রাণের অস্তিত্বের উৎস সাগর ও মহাসাগর। বাংলাদেশ সামুদ্রিক প্রাণিসম্পদের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কেননা নতুন খাদ্য, জৈব রসায়ন, ওষুধ, প্রসাধন ও জৈব জ্বালানির প্রয়োগে এগুলোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। টারবাইনের সহায়তায় দূর সমুদ্রের বাতাস কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রবাল প্রাচীরগুলো কেবল দৃষ্টিনন্দন নয়, বরং এগুলোর আরও উপকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোরাল প্রাচীর প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$) যৌগ। সাধারণত প্রবাল প্রাচীরের ৫০ শতাংশের বেশি ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি হয় শ্যাওলা থেকে। এটা গঠিত হয় প্রবাল ও এদের কঙ্কালের মতো মৌলিক উপাদান দিয়ে। চট্টগ্রামের সমুদ্র বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ১৩ প্রজাতির প্রবাল চিহ্নিত করেছে। এছাড়া রয়েছে কয়েক প্রজাতির মাছ ও শ্যাওলা। সেন্টমার্টিন দ্বীপ ৮৫ প্রজাতির পাখি, ১২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২০ প্রজাতির বেশি সরীসৃপ এবং চার প্রজাতির উভচর প্রাণীর আবাসস্থল।

বঙ্গোপসাগর মৎস্য সম্পদে ভরপুর। সাগরের মৎস্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে প্রবেশাধিকার তৈরি করা সরকারি নীতির উদ্দেশ্য। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনে ২০ শতাংশ অবদান রাখে। দেশের পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ সরাসরি এ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

ছোট ছোট পরিশোধন ইউনিটের মাধ্যমে বাংলাদেশে লবণ তৈরি হয়, যদিও উৎপাদনের পরিমাণ অপর্যাপ্ত। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিল্পলবণ উৎপাদন করা যেতে পারে। এমনকি তা রপ্তানি পণ্য হিসেবেও আবির্ভূত হতে পারে। বাংলাদেশের সমুদ্রগর্ভে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ, যেমন তামা, ম্যাগনেসিয়াম, নিকেল ও মূল্যবান ধাতু এবং কোবাল্ট পাওয়া যায়। এসব খনিজ সম্পদ অন্বেষণ করে বিভিন্ন শিল্পখাতের কাঁচামাল সরবরাহ করা যেতে পারে। সরকার নানা উদ্যোগ নিচ্ছে যেন সমুদ্রে পাওয়া সব সম্পদের পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায়।

১৪.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের সংরক্ষিত অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো জনসংখ্যার চাপ। অসংখ্য মানুষের বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে এসব অঞ্চলের ব্যবহার হয় কিংবা সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটে। আনুষঙ্গিক জিনিসের সীমাবদ্ধতা থাকায় সংরক্ষিত সামুদ্রিক অঞ্চলে নজরদারি করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের মোট সমুদ্র এলাকা ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার, যা প্রায় আরেকটি বাংলাদেশের সমান। এই অঞ্চল পর্যবেক্ষণে রাখতে স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ পদ্ধতিভিত্তিক (এআইএস) প্রযুক্তি ব্যবহারে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কয়েকটি নদীতে ৪৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় বছরে ৬৫ দিন ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করাও একটি চ্যালেঞ্জ।

সমুদ্রে নানা ধরনের প্রতিকূলতার প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের সামগ্রিকভাবে সমুদ্র বিজ্ঞান অবলম্বন করা দরকার। এসব প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা, দূষণ, উপকূলীয় ভাঙন, পলি জমা, নদী ভাঙন ও অতিরিক্ত মাছ ধরা। মূলত উচ্চ ব্যয়ের কারণে বাংলাদেশে সমুদ্র গবেষণা অথবা এ সম্পর্কিত সেবা ও প্রয়োজনীয় নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা কঠিন। সমুদ্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতে কারিগরি শিক্ষারও অপর্যাপ্ততা রয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ নদীর পানি দূষণ ও নদী তীরের জীবের টিকে থাকা। বাংলাদেশের প্রায় ২৩০টি ছোট-বড় নদী রয়েছে। দেশের প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি (১৬৫ মিলিয়ন) মানুষ জীবিকা ও পরিবহনের জন্য এসব নদীর ওপর নির্ভর করে। অথচ দূষণ ও দখলের কারণে অনেক নদী শুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা মারা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়, ঢাকার চারপাশে চারটি বড় নদী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীতে দৈনিক সাত হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ১৫ লাখ (দেড় মিলিয়ন) ঘনমিটার দূষিত পানি নিষ্কাশিত হয়। এর বাইরে এনদীগুলোয় আরও পাঁচ লাখ (০.৫ মিলিয়ন) ঘনমিটার দূষিত পানি নামে অন্য উৎস থেকে। অনিয়ন্ত্রিতভাবে জবর দখলের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। চিকিৎসা বর্জ্য এবং নৌপথের নৌ যাত্রীদের তৈরি বর্জ্য নদীতে অপসারণ করায় সমস্যা আরও জটিল হচ্ছে। পরিণামে নদীর পানি মানুষ কিংবা গবাদি পশুর ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

বুড়িগঙ্গা নদীর পানি এতটাই দূষিত যে, সেখানে সব মাছ মারা গেছে। ক্রমাগত আবর্জনা ও মানববর্জ্য ফেলার কারণে নদীর পানি থিকথিকে ঘন কালো পদার্থে পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধের কারণে এ নদীতে নৌকা চালানোও খুব কঠিন। যাহোক, বুড়িগঙ্গার এ দুর্দশা বাংলাদেশের অনেক নদীর শোচনীয়তার প্রতীক। এ দেশের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী। এগুলোর নাব্য ধরে রাখা এবং এর পানি মানুষ ও জলজ জীবনের জন্য নিরাপদ রাখা এক কঠিন লড়াই। সরকার নদীতে বর্জ্য অপসারণ রোধে এবং জবর দখল থেকে রক্ষায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

১৪.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

অবৈধ, অগোচরীভূত ও অনিয়ন্ত্রিত (আইইউইউ) মাছ শিকার সমুদ্রে টেকসই মৎস্য সম্পদ আহরণের বড় প্রতিবন্ধকতা। ২০১৬ সালে 'পোর্ট স্টেট মেজারস এগ্রিমেন্ট' একটি আন্তর্জাতিক যুক্তি হিসেবে কার্যকর হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ চাহিদার কথা স্বীকৃতি দেওয়া হয় এ চুক্তিতে। এতে অর্থায়ন কৌশল প্রতিষ্ঠা এবং তা কার্যকর করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ কলাকৌশলের লক্ষ্য হলো পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির সক্ষমতা উন্নয়ন এবং তা জোরদার করা। এছাড়া পোর্ট স্টেট মেজারস এগ্রিমেন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রতিপালন করা। এ চুক্তিতে বন্দর ব্যবস্থাপক, পরিদর্শক এবং প্রয়োগকারী ও আইনি ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা রয়েছে।

২০১৩ সালে এফএওর উদ্যোগে 'ব্লু গ্রোথ ইনিশিয়েটিভ' বা সমুদ্র অর্থনীতি প্রসারের উদ্যোগ সূচনা করা হয়েছে। এটি গুরুত্ব দেয় মাছ শিকার, মাছ চাষ, বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য, জীবিকা ও খাদ্য ব্যবস্থায় সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের ওপর। এ কৌশলে পরিবেশের অবনমন, জীববৈচিত্র্যের লোকসান এবং অটেকসইভাবে সম্পদের ব্যবহার কমানোর কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ বাড়ানো কথা বলা হয়েছে, যা শক্তিশালী জনগোষ্ঠী তৈরিতে সহায়ক। এ কৌশলে মাছ শিকার ও মাছ চাষের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের জন্য সক্রিয় পরিবেশ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। একই সঙ্গে সেইসব কর্মীদের জন্যও যারা সামুদ্রিক খাদ্যমান শৃঙ্খলের অংশ। তারা শুধু সম্পদের ব্যবহারকারী নন, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায়ও সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। এসডিজি-১৪ অর্জনও সমুদ্র অর্থনীতি প্রবৃদ্ধিকে জাতীয় নীতি ও কর্মসূচি মূলধারায় আনতে বাংলাদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। দেশের সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণ ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে মজবুত করার জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

১৪.৬ সারকথা

বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড'-এর চারপাশে চারটি স্থান নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে সফলতার সঙ্গে সংরক্ষিত সমুদ্র অঞ্চলের প্রসার ঘটিয়েছে। বিস্তীর্ণ এ এলাকায় সম্পদ রক্ষা ও মাছ ধরার অবৈধ নৌযান পাকড়াও করায় পর্যবেক্ষণও গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে দরকার তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ। ইলিশের অভয়াশ্রমের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। যাহোক, দেশের অধিকাংশ মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীই উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় মাছ ধরে। হাজারো মাছ ধরা নৌকা বাংলাদেশের সমুদ্রতট বরাবর মাছ শিকার করে।যখন এসব মানুষ মাছ শিকারের অনুমতি পায় না, সেসময় তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি তৈরির প্রয়োজন রয়েছে।

এছাড়া ইউএনসিএলও কাঠামো প্রতিপালন ও আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে সামুদ্রিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় সমুদ্রসীমার বাইরের থাকা জীববৈচিত্র্যের বিষয়ে সমঝোতা বা বিবিএনজে-এর মতো বিদ্যমান কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি, সমুদ্র নিরাপত্তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ধরে রাখার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো সমুদ্র সুশাসন। এতে মাছ ধরার এলাকা, অফশোর জ্বালানি, পর্যটন ও জাহাজ চলাচলের মতো কার্যক্রমে বৃহত্তর সমন্বয় করতে হবে। বাংলাদেশে এসডিজি ১৪-এর প্রেক্ষিতে মাছ ধরা-সম্পর্কিত বিষয় ও মাছ আহরণে নিয়ন্ত্রণ কাঠামো জোরদার করা এবং অতিরিক্ত ও অবৈধ মাছ ধরার মতো বিষয়গুলোর সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৫

স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা দান, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয়রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

১৫.১ এসডিজি ১৫ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

পার্থিব বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিশ্বে ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বন উজাড়ের হার কমছে। বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যের এলাকা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আর্থিক সহায়তার প্রবাহ বাড়ছে। এর পরও ২০২০ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত এসডিজি-১৫-এর লক্ষ্যগুলো অর্জন করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কেননা জমির অবক্ষয় অব্যাহত রয়েছে, আশঙ্কাজনক হারে জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া শিকারি প্রজাতি এবং অবৈধ শিকার ও বন্য প্রাণীর পাচার অব্যাহত রয়েছে। এ সবের ফলে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুসংস্থান ও প্রজাতি রক্ষা এবং আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সব প্রচেষ্টা হুমকির সম্মুখীন।

স্থলজ ও স্বাদুপানির জীববৈচিত্র্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো সংরক্ষণ করা জরুরি। এর ফলে স্থলজ ও স্বাদুপানির প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকার বৈশ্বিক গড় শতকরা হার ২০০০ সালের ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে হয় ৪৬ দশমিক ১ শতাংশ। স্বাদুপানির এলাকার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ২০০০ সালের ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে হয় ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ। একই মেয়াদে পার্বত্য এলাকায় সংরক্ষণ ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশে উপনীত হয়।

উঁচু-নিচু সব ধরনের এলাকার যথাযথ বাস্তুসংস্থান নিশ্চিতের জন্য অপরিহার্য বিষয় হলো সঠিক পার্বত্য বাস্তুতন্ত্র। ২০১৭ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর পার্বত্য এলাকার ৭৬ শতাংশ সবুজের আওতাভুক্ত রয়েছে; এর মধ্যে ৪১ শতাংশ বন, ২৯ শতাংশ তৃণভূমি এবং বাকি ৬ শতাংশ শস্যভূমি।

২০০০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ভূমির পাঁচ ভাগের এক ভাগ অবক্ষয় হয়। এটি ঘটে মূলত মরুকরণ, কৃষিজমির প্রসার ও নগরায়ণের মতো মানবপ্ররোচিত কর্মকাণ্ডের কারণে। একই মেয়াদে জমির উপরিভাগের উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক অবনমন হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতি হয় তৃণভূমির। মানুষের জন্য প্রকৃতি থেকে কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সবচেয়ে অপূরণীয় ও মৌলিক ক্ষতি। লাল তালিকা সূচকে (রেড লিস্ট ইনডেক্স) বিভিন্ন প্রাণীর বিলুপ্তির ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়। এই সূচকে মান ১-এর অর্থ কোনো প্রাণী বিলুপ্তির ঝুঁকিতে নেই এবং মান শূন্য হলে সব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে বোঝাবে। ২০১৯ সালে এই সূচক ০.৭৩ পয়েন্টে ঠেকেছে, যা ১৯৯৩ সালে ছিল ০.৮২।

এ-সংক্রান্ত জাতিসংঘের নাগোয়া প্রটোকলে টেকসইভাবে জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১১৬টি দেশ নাগোয়া প্রটোকলে অনুস্বাক্ষর করেছে। প্রটোকলের আওতায় ৬১টি দেশ তথ্য বিনিময় করেছে। ২০১৭ সালে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দ্বিপক্ষীয় ওডিএ'র পরিমাণ ছিল ৮৭০ কোটি (৮ দশমিক ৭ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় প্রকৃত হিসাবে ১৫ শতাংশ বেশি। দক্ষিণ এশিয়ায় এসডিজি-১৫ বাস্তবায়নে দরকার স্থলজ জীবন বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সম্মেলনে নির্ধারিত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া।

বন উজাড়ের আওতা ও এর জটিলতা এবং জীববৈচিত্র্যের বিপরীতে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সংরক্ষণ ও বনায়নের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। এই অভীষ্টের সঙ্গে অন্য এসডিজি একীভূত করলে তা হবে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বড় উদ্ভাবন। তবে এক্ষেত্রে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ দুটোই রয়েছে। জমির জন্য প্রতিযোগিতার ফলে এসডিজি ১৫ এবং অন্য এসডিজির মধ্যে ভারসাম্য (ট্রেড অফ) থাকবে। তবে এমন কিছু সুফল ও সুযোগ রয়েছে, যা উপলব্ধি করা দরকার।

১৫.২ অর্জন অগ্রগতি পর্যালোচনা

স্থলজ বাস্তুতন্ত্র

জমির আয়তন হিসেবে বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। তবুও এখানকার বাস্তুতন্ত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বৈচিত্র্য রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ২০°২৫মি.ও ২৬°৩৮মি.উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১মি.ও ৯২°৪০মি. পূর্ব দ্রাঘিমার মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১ কোটি ৪৪ লাখ (১৪.৪ মিলিয়ন) হেক্টর। এখানকার ভূমিবৈচিত্র্য মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্লাবনভূমি ৮০ শতাংশ, সোপান ভূমি আট শতাংশ এবং পাহাড়ি এলাকা ১২ শতাংশ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২ মিটার বা ৩৯ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড়ি

এলাকার গড় উচ্চতা যথাক্রমে ২৪৪ ও ৬১০ মিটার। বাংলাদেশের জলবায়ু প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করে। বিপরীতে সবচেয়ে ঠাণ্ডা জানুয়ারিতে। তখন দেশের অধিকাংশ এলাকায় গড় তাপমাত্রা থাকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০০ থেকে ৪০০ মিলিমিটার। এ দেশে মূলত চারটি ঋতু বিরাজ করে: ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারিতে শীত, মার্চ-মে মাসে গ্রীষ্ম, জুন-সেপ্টেম্বরে বর্ষা এবং অক্টোবর-নভেম্বরে শরৎ।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ভাগ হলো স্থলজ, অভ্যন্তরীণ জলমগ্ন এলাকা এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র। বাংলাদেশে প্রধান স্থলজ বনের মধ্যে রয়েছে ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন, ক্রান্তীয় প্রায় চিরসবুজ বন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন (শালবন), ম্যানগ্রোভ বন; স্বাদুপানির জলাভূমি বন, ভিটাবাড়ির বন ও কৃত্রিম বন। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেকই জলাভূমি। এই বাস্তুতন্ত্রসমূহের গঠনে রয়েছে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মতো বড় তিন নদী। আরও রয়েছে এগুলোর ৭০০-এর বেশি উপনদী, শাখা নদী ও প্লাবনভূমি। প্রায় ছয় হাজার ৩০০ স্থায়ী বা মৌসুমি বিল, ৪৭টি বড় হাওর, বাঁওড়, মৌসুমি জলাভূমি এবং পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়। বাংলাদেশের অবস্থান প্রাচ্য অঞ্চলের ইন্দো-হিমালয় এবং ইন্দো-চায়না উপ-অঞ্চলের মাঝামাঝিতে। এ কারণে বাংলাদেশ দুটি উপ-অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী ভূমি এলাকা, স্থলসেতু এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জীববৈজ্ঞানিক করিডোর হিসেবে কাজ করে। এদেশে প্রায় ৭৫০ প্রজাতির পশু এবং ১০ হাজার ৩০০ প্রজাতির গাছপালা রয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার বৈচিত্র্যকে নির্দেশ করে।

সূচক ১৫.১.১: মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত

এই সূচকে বর্গকিলোমিটারে বন এলাকা এবং মোট ভূমি আয়তনের অনুপাত পরিমাপ করা হয়। 'বনাঞ্চল'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'শূন্য দশমিক পাঁচ (০.৫) হেক্টরের বেশি ভূমি যেখানে পাঁচ মিটারের বেশি উঁচু গাছ রয়েছে এবং উপরে পাতার আচ্ছাদন ১০ শতাংশের বেশি। অথবা এই গাছপালা উল্লিখিত পর্যায়ে পৌঁছানোর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে জমি প্রধানত কৃষিকাজে ও শহুরে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।'

আরও নির্দিষ্টভাবে বলা হলে, বনাঞ্চলে গাছপালা থাকবে এবং এই জমি অন্য কাজে ব্যবহৃত হবে না। গাছের উচ্চতা হবে কমপক্ষে পাঁচ মিটার। ওইসব গাছই কেবল চারাগাছের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলো ভবিষ্যতে উচ্চতায় পাঁচ মিটার কিংবা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যে গাছ তার উচ্চতার ১০ শতাংশের সমপরিমাণ ছায়া সৃষ্টিতে সক্ষম। কোন গাছপালা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপর্যস্ত কিংবা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ফেলে রাখা হলেও যদি পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে পুনর্জন্ম নেওয়ার আশা থাকে, তাও বন হিসেবে গণ্য হবে। আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে এতে আরও বেশি সময় লাগতে পারে। অভ্যন্তরীণ পথ, ফায়ার ব্রেক বা ফাঁকা জায়গা ও অন্যান্য উন্মুক্ত এলাকা, জাতীয় উদ্যানের বন ও অন্য সংরক্ষিত অঞ্চল; যা পরিবেশগত, বিজ্ঞানসংক্রান্ত, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক অথবা আধ্যাত্মিক কারণে সংরক্ষিত হয়, তাও বনের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে আরও রয়েছে জোয়ার এলাকায় ম্যানগ্রোভসহ সমগোত্রীয় অঞ্চল। এটি ভূমি হিসেবে শ্রেণীকৃত নয় এবং সেখানে রাবার, কর্ক, ওক এবং ক্রিসমাস গাছও লাগানো নয়। জমির আওতা, গাছের উচ্চতা অন্য শর্তসাপেক্ষে বাঁশ ও বাঁশজাতীয় গাছও অন্তর্ভুক্ত। যাহোক, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ ফলের গাছ, আমজাতীয় গাছ ও জলপাই বাগান বনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বাংলাদেশ বন বিভাগের তথ্য অনুসারে, অভ্যন্তরীণ জলজ এলাকা বাদ দিয়ে দেশের মোট বনাঞ্চলের মোট আয়তন ১৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ (বিএফডি ২০১৮)।

সূচক ১৫.১.২: বাস্তুতন্ত্রের ধরন অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় জলজ ও মিঠাপানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত

স্থলজ ও স্বাদুপানির জীববৈচিত্র্যের জন্য সংরক্ষিত এলাকার জন্য নেওয়া পদক্ষেপ এই সূচকে পরিমাপ করা হয়। এতে এ ধরনের প্রতিটি সংরক্ষিত অঞ্চলে সাময়িক প্রবণতা দেখা হয় (বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে)। প্রকৃতি সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সংঘের (আইইউসিএন) সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংরক্ষিত অঞ্চল হলো ভৌগোলিক স্বীকৃত এলাকা, যা আইনগত ও অন্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃতি সংরক্ষণে নিবেদিত থাকে। আর এই প্রকৃতি বাস্তুতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত। (ইউএনএসকাপ, ২০২০)

বাংলাদেশে সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতাভুক্ত স্থলজ ও মিঠাপানির আওতায় জীববৈচিত্র্যের অনুপাত বেড়েছে। ২০১৩-১৪ সালের ১ দশমিক ৭ শতাংশের তুলনায় তা বেড়ে ২০১৮ সালে ৩ দশমিক ০৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়–এমওইএফ, ২০১৩-১৪)।

বাংলাদেশের সর্বমোট ১৪ লাখ ৪৩ হাজার হেক্টর জমি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত, যা মোট ভূমি এলাকার ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। যাহোক, এই ভূমি এলাকা হিসাব করা হয় মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষিত জলাভূমি বাদ দিয়ে। এই সংরক্ষিত অঞ্চল ছাড়াও সরকার অন্যসব বনভূমিকে উদ্যানে পরিণত করেছে। সেখান থেকে কাঠ সংগ্রহের সুযোগ রাখা হয়নি (জ্বালানি কাঠ ও কাঠ ভিন্ন বনসম্পদ ব্যতীত)। এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মোট ভূমি আয়তনের ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ জুড়ে রয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও উদ্যান। ২০৩০ সাল নাগাদ তা ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে (চিত্র ১৫.১)। এখন বাংলাদেশে ৪০টি সংরক্ষিত এলাকা (প্রোটেক্টেড এরিয়া–পিএ) আছে, যা চিত্র ১৫.৩-এ দেখানো হয়েছে এবং সারণি ১৫.৪-এ উল্লেখ আছে। এছাড়া বাংলাদেশের ১০ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে গাছপালার আদি বাসস্থলের (এক্স সিটু) বাইরে অন্য জায়গায় সংরক্ষণ করার জন্য।

বনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ দুটি স্থানকে 'রামসর সাইট' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এগুলো হলো টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবনের তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম। সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পুরো সুন্দরবন এলাকা ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। দুটি আলাদা আইনের অধীনে বাংলাদেশ সংরক্ষিত এলাকার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪' এবং 'বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২'। প্রথম আইনের অধীনে তিন ধরনের সংরক্ষিত অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো–জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম ও বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র বা গেম রিজার্ভার। দ্বিতীয় আইনের অধীনে সংরক্ষিত অঞ্চলগুলোকে বলা হয় জাতীয় উদ্যান, অভয় আশ্রম, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কমিউনিটি কনজারভেশন, সাফারি পার্ক ও কুঞ্জবন।

চিত্র ১৫.১: সংরক্ষিত অঞ্চলের মানচিত্র (দুটি সংরক্ষিত সামুদ্রিক অঞ্চল দেখানো হয়নি)

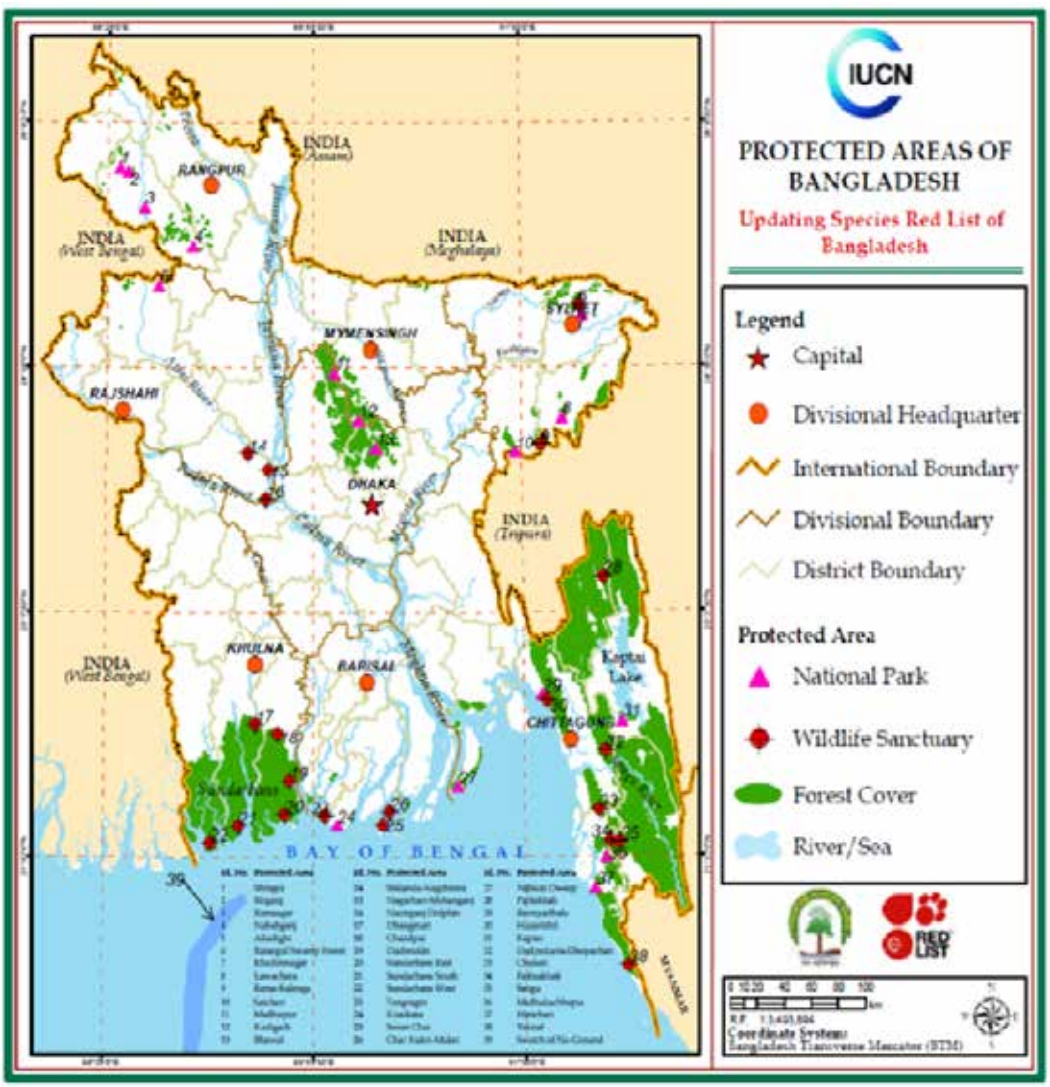

সারণি ১৫.১: বাংলাদেশের সংরক্ষিত এলাকাসমূহ

ক্রমিক	বছর	সংরক্ষিত অঞ্চল	বাস্তুতন্ত্র	জেলা/অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
১	২০০৬	খাদিমনগর এনপি	মিশ্র চিরসবুজ	সিলেট	৬৭৮.৮
২	১৯৯৬	লাউয়াছড়া এনপি	মিশ্র চিরসবুজ	মৌলভিবাজার	১২৫০
৩	২০০৫	সাতছড়ি এনপি	মিশ্র চিরসবুজ	হবিগঞ্জ	২৪২.৯২
৪	১৯৯৬	রেমা-কালেঙ্গা এনপি	মিশ্র চিরসবুজ	হবিগঞ্জ	১৭৯৫.৫৪
৫	১৯৮৩	পাবলাখালী এনপি	মিশ্র চিরসবুজ	খাগড়াছড়ি	৪২০৬৯.৩৭
৬	১৯৯৯	কাপতাই এনএস	মিশ্র চিরসবুজ	রাঙামাটি	৫৪৬৪.৭৮
৭	২০১০	সাঙ্গু	মিশ্র চিরসবুজ	বান্দরবান	২৩৩১.৯৮
৮	১৯৮৩	টেকনাফ ডব্লিউএস	মিশ্র চিরসবুজ	কক্সবাজার	১১৬১৪.৫৭
৯	১৯৮০	হিমছড়ি এনপি	মিশ্র চিরসবুজ	কক্সবাজার	১৭২৯
১০	২০০৪	মেধা-কচ্ছপিয়া ডব্লিউএস	মিশ্র চিরসবুজ	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২
১১	২০০৭	ফাসিয়াখালী ডব্লিউএস	মিশ্র চিরসবুজ	কক্সবাজার	১৩০২.৪২
১২	১৯৯৬	চুনাতি ডব্লিউএস	মিশ্র চিরসবুজ	চট্টগ্রাম	৭৭৬৩.৯৭
১৩	২০১০	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি ডব্লিউএস	মিশ্র চিরসবুজ	চট্টগ্রাম	৪৭১৬.৫৭
১৪	২০১০	হাজারিখিল ডব্লিউএস	মিশ্র চিরসবুজ	চট্টগ্রাম	১১৭৭.৫৩
১৫	২০১০	বারইয়াঢালা এনপি	মিশ্র চিরসবুজ	চট্টগ্রাম	২৯৩৩.৬১
১৬	২০০১	নিঝুম দ্বীপ এনপি	রোপিত ম্যানগ্রোভ বন	নোয়াখালী	১৬৩৫২.২৩
১৭	১৯৮১	চর কুকরিমুকরি	Planted Mangrove Forest	Bhola	৪০
ডব্লিউএস	রোপিত ম্যানগ্রোভ বন	ভোলা	৪০	Patuakhali	১৬১৩
১৮	২০১০	কুয়াকাটা এনপি	রোপিত ম্যানগ্রোভ বন	পটুয়াখালী	১৬১৩
১৯	২০১২	সোনার চর ডব্লিউএস	রোপিত ম্যানগ্রোভ বন	পটুয়াখালী	৫৬০
২০	২০১০	টেংরাগিরি ডব্লিউএস	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	বরগুনা	৪০৪৮.৫৮
২১	১৯৯৬	সুন্দরবন পূর্ব ডব্লিউএস	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	বাগেরহাট	৩১২২৬.৯৪
২২	১৯৯৬	সুন্দরবন পশ্চিম ডব্লিউএস	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	সাতক্ষীরা	৭১৫০২.১
২৩	১৯৯৬	সুন্দরবন দক্ষিণ ডব্লিউএস	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন	খুলনা	৩৬৯৭০.৪৫
২৪	২০১২	চাঁদপাই ডব্লিউএস	নদী/সামুদ্রিক	বাগেরহাট	৫৬০
২৫	২০১২	দুধমুখী ডব্লিউএস	নদী/সামুদ্রিক	বাগেরহাট	১৭০
২৬	২০১২	Daingmari ডব্লিউএস	নদী/সামুদ্রিক	বাগেরহাট	৩৪০
২৭	১৯৮২	ভাওয়াল এনপি	শাল বন	গাজীপুর	৫০২২.২৯
২৮	১৯৮২	মধুপুর এনপি	শাল বন	টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ	৮৪৩৬.১৩
২৯	২০১০	কাদিগঞ্জ এনপি		ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩
৩০	২০০১	রামসাগর এনপি		দিনাজপুর	২৭.৭৫
৩১	২০১০	সিংড়া এনপি		দিনাজপুর	৩০৫.৬৯
৩২	২০১০	নবাবগঞ্জ এনপি		দিনাজপুর	৫১৭.৬১
৩৩	২০১১	বীরগঞ্জ এনপি		দিনাজপুর	১৬৮.৫৬
৩৪	২০১১	আলতাদীঘি এনপি		নওগাঁ	২৬৪.১২
৩৫	২০১৩	নগরবাড়ী-মোহনগঞ্জ ডব্লিউএস	নদী	পাবনা	৪০৮.১১

ক্রমিক	বছর	সংরক্ষিত অঞ্চল	বাস্তুতন্ত্র	জেলা/অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)
৩৬	২০১৩	শিলন্দা-নাগডেমরা ডব্লিউএস	নদী	পাবনা	২৪.১৭
৩৭	২০১৩	নাজিরগঞ্জ ডব্লিউএস	নদী	সিরাজগঞ্জ /পাবনা	১৪৬
৩৮	২০১৪	সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড পার্ক		বঙ্গেপসাগর	১৭৩৮০০
৩৯	২০১৪	রাতারগুল জলারবন		বঙ্গোপসাগর	৬৯৮০০
৪০		সামুদ্রিক		সিলেট	২০৪.২৫
নোট: ডব্লিউএস–ওয়াইল্ড লাইফ স্যানকচুয়ারি (বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম), এনপি–ন্যাশনাল পার্ক (জাতীয় উদ্যান)					

সূত্র: আহসান ও অন্যান্য, ২০১৬

সারণি ১৫.২: উদ্ভিদের আদি আবাসস্থলের বাইরে সংরক্ষিত অঞ্চল

	সংরক্ষিত এলাকা	বাস্তুতন্ত্র	জেলা	আয়তন হেক্টর	বছর
১	বলধা গার্ডেন	মনুষ্যসৃষ্ট	ঢাকা	১.৩৭	১৯০৯
২	জাতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেন	মনুষ্যসৃষ্ট	ঢাকা	৮৪.২১	১৯৬১
৩	দুলাহাজরা সাফারি পার্কস	মিশ্র চিরসবুজ	কক্সবাজার	৬০০	১৯৯৯
৪	সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো-পার্ক	মিশ্র চিরসবুজ	চট্টগ্রাম	৮০৮	২০০০
৫	মাধনকুণ্ড ইকো পার্ক	মিশ্র চিরসবুজ	মৌলভীবাজার	২৬৫.৬৮	২০০১
৬	মধুটিলা ইকো পার্ক	পর্ণমোচী বন	শেরপুর	১০০	২০০১
৭	বাঁশখালী ইকো পার্ক	মিশ্র চিরসবুজ	চট্টগ্রাম	১২০০.০০	২০০৩
৮	কুয়াকাটা ইকো পার্ক	ইকো পার্ক	পটুয়াখালী	৪৫.৩৪	২০০৬
৯	টিলাগড় ইকো পার্ক	মিশ্র চিরসবুজ	সিলেট	৫,৬৬১.০০	২০০৫
১০	বড়শিজোড়া ইকো পার্ক	মিশ্র চিরসবুজ	মৌলভীবাজার	৩২৬.০৭	২০০৬
১১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	মুজিব সাফারি	গাজীপুর	১,৫৪২.৫১	২০১৪

চিত্র ১৫.২: বাংলাদেশের সংরক্ষিত অঞ্চলের প্রবণতা

সূচক ১৫.২.১: টেকসই বন ব্যবস্থাপনার দিকে অগ্রগতি

এই সূচকে কয়েকটি উপশ্রেণিতে অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়; যেমন– ক. মোট বন এলাকায় পরিবর্তন, খ. বনে মাটির ওপরে সব জীবের পরিবর্তন, গ. সংরক্ষিত অঞ্চলে বনাঞ্চলের অনুপাত এবং ঘ. দীর্ঘমেয়াদি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বনাঞ্চলের অনুপাত।

এই সূত্রে বিদ্যমান তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে–ক. ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র সম্পন্ন হবে, খ. মাটির ওপরে সব জীবের হার ৬৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ (২০১৫, ২০১৯), গ. সংরক্ষিত অঞ্চলের ২৪ দশমিক ১১ শতাংশ ভূমি বনের আওতায় এসেছে (জুন ২০১৮) এবং ঘ. ৩৫ দশমিক ১০ শতাংশ বনভূমি দীর্ঘমেয়াদি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় আনা হয়েছে।

সূচক ১৫.৪.১ সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতায় পাহাড়ি জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা

সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতায় পাহাড়ি জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকার হার ০.৩৫ শতাংশ (বিএফডি ২০১৯)।

সূচক ১৫.৫.১: লাল তালিকা সূচক (আরএলআই)

আইইউসিএনের লাল তালিকায় ১৩৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫৬৬ প্রজাতির পাখি, ১৬৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪৯ প্রজাতির উভচর, ২৫৩ প্রজাতির মাছ, বিভিন্ন খোলসযুক্ত প্রাণী ও কীটপতঙ্গ বিবেচনা করা হয়। আইইউসিএনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে: "অবশিষ্ট ১ হাজার ৬১৯ প্রজাতির মধ্যে ৯০ টি বা ৬ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ এবং ৮০২ প্রজাতি বা ৫০ শতাংশ কম উদ্বেগপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। আরও ২৭৮ অথবা ১৭ শতাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রে 'তথ্য ঘাটতি' রয়েছে। এর অর্থ মাঠপর্যায়ে পর্যাপ্ত তথ্য অথবা সমর্থনকারী নথি না থাকায় এসব প্রজাতিকে 'বিপন্ন শ্রেণিভুক্ত' করা যায়নি। ২৮ প্রজাতি অথবা শুধু দুই শতাংশ 'মূল্যায়ন হয়নি' শ্রেণিভুক্ত (আইইউসিএন, ২০১৫)।"

সারণি ১৫.৩-এ ২০০০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণীর তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই অবস্থান সরাসরি তুলনামূলক নয়, কারণ ২০০০ সাল ও ২০১৫ সালের প্রোটোকল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তারপরও যা বলা যায় তা হলো, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে স্তন্যপায়ী ও মাছ সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন। কিছু উন্নতিও লক্ষ করা যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রজাতিগুলোর মধ্যে 'বিলুপ্তির হুমকিতে নেই' এমন শ্রেণিতে থাকা 'সবচেয়ে কম উদ্বেগজনক' প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে উদ্বেগহীন প্রাণীর অনুপাত ছিলো ৫৩ শতাংশ। ২০১৫ সালে ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১১ সালে বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা ১১ প্রজাতির আবাসিক পাখি চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া ১১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে দুই প্রজাতি ২০০০ সালে বিলুপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে এগুলো ২০১৫ সালে খুঁজে পাওয়া গেছে।

সারণি ১৫.৩: প্রজাতির তুলনা ২০০০ ও ২০১৫ সালে

শ্রেণি	Red List species in 2000		Red List species in 2015	
	২০০০ সালে রেড লিস্টে প্রজাতি	২০১৫ সালে রেড লিস্টে প্রজাতি	No. of species	Threatened
মাছ (মিঠাপানি ও ঈষৎ লোনা)	২৬৬	৫৪ (২০%)	২৩৫	৫৯ (২৩%)
উভচর	২২	৮ (৩৬%	৪৯	১০(২০%)
সরীসৃপ	১২৭	৬৩ (৫০%)	১৬৭	৩৮ (২৩%)
পাখি	৬২৮	৪৭ (৭%)	৫৬৬	৩৯ (৭%)
স্তন্যপায়ী	১১৩	৪৩ (৩৮%)	১৩৮	৩৬ (২৬%)
খোলসযুক্ত প্রাণী	...	১৪১	১২ (৮.৭%)	...
প্রজাপতি	...	৩০৫	৫৭ (১৯%)	...

সূত্র: আইইউসিএন, ২০১৫

সূচক ১৫.৬.১: সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগতভাবে সুফল বিনিময়ের সুবিধার্থে আইনগত, প্রশাসনিক ও নীতিকাঠামো অবলম্বনকারী দেশের সংখ্যা

এই সূচকে নাগোয়া প্রটোকল বাস্তবায়নে আইনগত, প্রশাসনিক ও নীতিকাঠামো প্রতিপালনের মূল্যায়ন করা হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক সূচক; জাতীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করা হয় না। অ্যাক্সেস ও বেনিফিট শেয়ারিংয় (এবিএস)-এর জন্য ২০১০ সালে এটিকে নাগোয়া প্রটোকল নামেও উল্লেখ করা হয়। এটি মূলত ১৯৯২ সালের কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটির (সিবিডি) সম্পূরক চুক্তি। এর উদ্দেশ্য হলো জীনগত সম্পদ ব্যবহার থেকে পাওয়া সুবিধাগুলোর ন্যায্য ও ন্যায়সংগত ভাগাভাগি নিশ্চিত করা। ফলে এটি জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারে অবদান রাখতে পারবে। সিবিডিতে অংশগ্রহণকারী দেশ যারা এবিএস বিষয়ে আইনি, প্রশাসনিক অথবা নীতি-পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা এবিএস ক্লিয়ারিং হাউসে জমা দিয়েছে, তাদের জমা দেওয়া সেই সংখ্যা থেকে এ সূচক গণনা করা হয় (ইউএনএসকাপ ২০২০)। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদ জীনগত সম্পদবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (পিজিআরএফএ) প্রতিপালন করেছে।

১৫.৩ এসডিজি-১৫ অর্জনে সরকারের প্রচেষ্টা

বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধ নির্দেশনা দীর্ঘায়িতকরণ

সংরক্ষিত বনে গাছ কাটায় জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা বাড়ানো হয়েছে ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের আরও ভালো সংরক্ষণের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা বাড়ানো হয়েছে।

প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Areas-ECA)

পরিবেশ অধিদপ্তর কিছু অঞ্চলকে প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং তা পরিবেশ রক্ষা আইনে সেগুলোর সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। চিত্র ১৫.৩ ও ১৫.৪-এ দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির বিন্যাস। সব সংরক্ষিত অঞ্চলের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-১৫ সালে মোট আয়তনের মধ্যে সংকটাপন্ন এলাকা ছিল ১ দশমিক ৭ শতাংশ। আর ২০১৩-১৪ সালে স্বাদুপানির সংকটাপন্ন এলাকা ছিল ১ দশমিক ৮ শতাংশ। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ এই দুটো হার বেড়ে যথাক্রমে ২ দশমিক ৪ শতাংশ ও ৫ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ২০১৪ সালে উত্তর-পূর্ব (সিলেট) ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শকুনের জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি করে। সিলেট অঞ্চলে বাংলাদেশ সীমার ভেতরে মোট নিরাপদ এলাকার বিস্তৃতি প্রায় ১৯ হাজার ৬৬৩ বর্গকিলোমিটার এবং মূল জায়গা সাত হাজার ৪৫৯ বর্গকিলোমিটার। খুলনা অঞ্চলে বাংলাদেশের সীমার ভেতরে নিরাপদ জমির আয়তন ২৭ হাজার ৭১৭ বর্গকিলোমিটার এবং মূল নিরাপদ জোন ৭ হাজার ৮৪৬ বর্গকিলোমিটার।

সারণি ১৫.৪: বাংলাদেশে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)

ক্রমিক	পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	বাস্তুতন্ত্র	অবস্থান	আয়তন (হেক্টরে)	বছর
১	কক্সবাজার টেকনাফ উপদ্বীপ	উপকূলীয় -সামুদ্রিক	কক্সবাজার	২০.৩৭৩	১৯৯৯
২	সুন্দরবন উপকূল	উপকূলীয় -সামুদ্রিক	বাগেরহাট, বরগুনা, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা	২৯২.৯২৬	১৯৯৯
৩	সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	প্রবালপ্রাচীর	কক্সবাজার	১২১৪	১৯৯৯
৪	হাকালুকি হাওর	স্বাদুপানির জলাশয়	সিলেট ও মৌলভীবাজার	৪০৪৬৬	১৯৯৯
৫	সোনাদিয়া দ্বীপ	সামুদ্রিক দ্বীপ	কক্সবাজার	১০২৯৮	১৯৯৯
৬	টাঙ্গুয়ার হাওর	স্বাদুপানির জলাশয়	সুনামগঞ্জ	৯৭২৭	১৯৯৯
৭	মরজাত বাঁওড়	অক্সবো হ্রদ	ঝিনাইদহ ও যশোর	৩২৬	১৯৯৯
৮	গুলাশান-বারিধারা লেক	শহুরে জলাশয়	ঢাকা	১০১	২০০১

ক্রমিক	পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা	বাস্তুতন্ত্র	অবস্থান	আয়তন (হেক্টরে)	বছর
৯	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা	১৩৩৬	২০০৯
১০	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা	১১৮৪	২০০৯
১১	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা	৩৭৭১	২০০৯
১২	বালু নদী ও টঙ্গী খাল	নদী ও খাল	ঢাকা	১৩৫	২০০৯
১৩	জাফলং-ডাওকি	নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

সূত্র: আইইউসিএন বাংলাদেশ, ২০১৫

চিত্র ১৫.৩: বিপন্ন স্তন্যপায়ী, পাখি ও অন্য উভচর প্রাণীর বিন্যাস

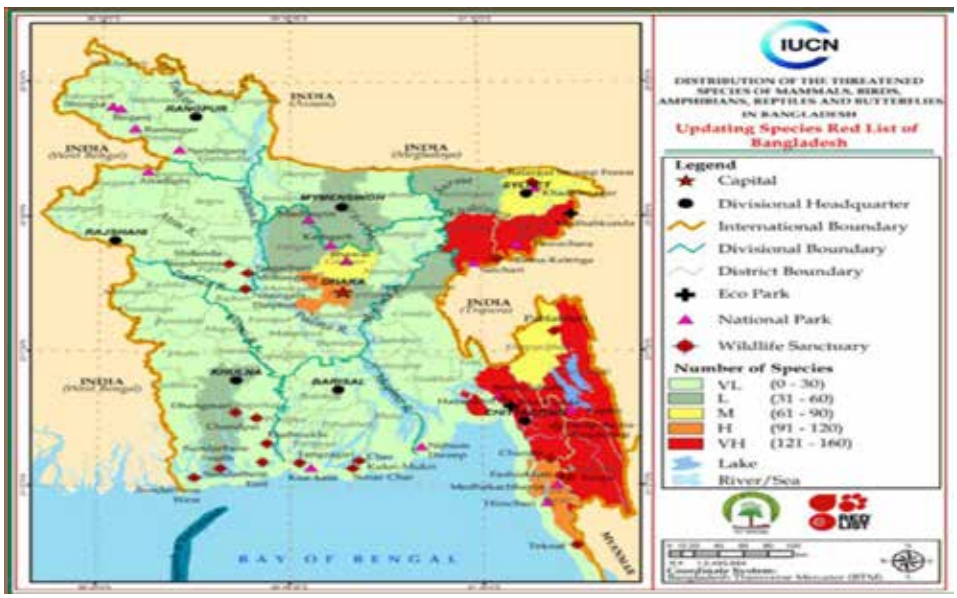

সূত্র: আইইউসিএন, ২০১৫

চিত্র ১৫.৪: হুমকিতে থাকা জলজ প্রজাতির বিন্যাস

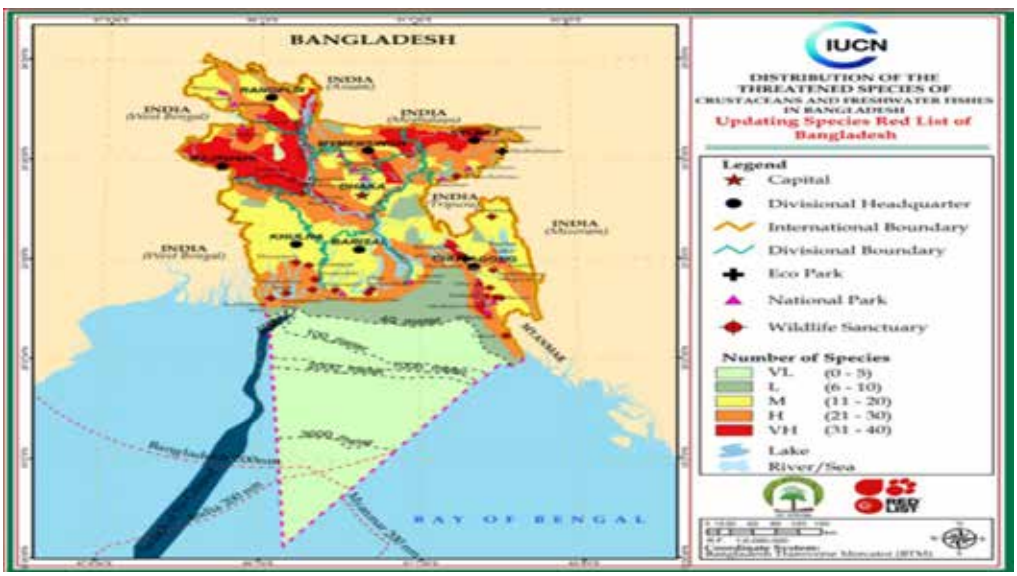

সূত্র: আইইউসি, ২০১৫

বিশেষ জীবমণ্ডলীয় সংরক্ষণাগার-রাতারগুল জলাভূমি বন

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হাওর অববাহিকায় স্বাদুপানির ছোট জলাভূমির বন রাতারগুল। স্বাদুপানির জলাবনের জীববৈচিত্র্যের জন্য এটিই দেশের সর্বশেষ সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। এখানকার বাস্তুতন্ত্র গতানুগতিক ধারার স্বাদুপানির জলাশয়ের মতোই। এটি শীতকালে থাকে শুকনো এবং বর্ষায় প্রায় আট ফুট পানির নিচে। বনের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র ধরে রাখার উদ্দেশ্যে সরকার ২০১৫ সালে রাতারগুলকে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে।

১৫.৪ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

স্থলজ জীবন রক্ষায় বাংলাদেশে প্রধান চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যথাযথ ব্যবস্থাপনার কৌশল উন্নয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা। এ কাজে স্থানীয় অংশীজনদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। এসব কাজে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব অনুধাবন করেছে বাংলাদেশ। এ জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের উপকারিতা বিষয়ে স্থানীয়দের সচেতন করার কৌশল উন্নয়ন করা হয়েছে। পাঁচটি জাতীয় উদ্যানে প্রবেশমূল্যের ৫০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বরাদ্দ রাখা হয়। এসব উদ্যানে বাস্তুতন্ত্রের সক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো কৌশল উন্নয়ন করা চ্যালেঞ্জের। তার ওপর পরিবেশগত বিপদাপন্ন বেশিরভাগ এলাকার অবনমন ঘটেছে এবং এগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের ফলে টেকনাফ উপদ্বীপ এখন প্রকট হুমকিতে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১০ লাখের বেশি আশ্রয়প্রার্থী বসত গাড়ায় সেখানে মানুষ ও হাতি এবং মানুষ ও সাপের মধ্যে দ্বন্দ্বের মাত্রা আরও তীব্র হয়েছে। বাংলাদেশকে ব্যাপক পরিবেশগত মূল্য দিতে হচ্ছে মানবতার জন্য শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে । সংরক্ষিত এলাকার ধারণা ও উপকার সম্পর্কে সব ধরনের মানুষকে অবহিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে, এসব এলাকায় আগত দর্শনার্থীরা যেন উদ্যানের প্রাকৃতিক নিজস্বতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখে, আগুন না জ্বালায় কিংবা উচ্চ আওয়াজ না করে। কেননা এসব কর্মকাণ্ড বন্য প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিরক্তির উদ্রেক করে। জীববৈচিত্র্যের জন্য বেশ কিছু সরাসরি হুমকি ও চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশেও রয়েছে। জীববৈচিত্র্যের ওপর সরাসরি কিছু হুমকির মধ্যে রয়েছে পরিবেশের ওপর বিপুল জনসংখ্যার চাপ, কৃষিকাজ ও বসতি এলাকার সম্প্রসারণ, চাষাবাদের পরিবর্তন এবং আবাসস্থলের অবনমন ও বিনাশ। মাছ, স্বাদুপানির শামুক-ঝিনুক, প্রবাল, কচ্ছপ, সাপ, পাখি এবং বিভিন্ন ধরনের হাঁসের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারও জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় হুমকি। নানা ধরনের তরল বর্জ্যের কারণে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্র দূষিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বর্জ্য, গৃহস্থালির জৈব ও অজৈব বর্জ্য এবং কীটনাশক, পতঙ্গনাশক ও সারের মতো কৃষি রাসায়নিক।

১৫.৫ ভবিষ্যৎ করণীয়

বাস্তুতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশল নিয়েছে। এসডিজি-১৫ বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে, যাদের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনে সরাসরি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশলে স্বীকার করা হয় যে, বন সম্পদ উজাড় করে অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিরুৎসাহিত করা উচিৎ নয় এবং বাস্তুতন্ত্র পরিষেবাগুলো হ্রাস করা উচিত নয়। তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অঞ্চলগুলোর যথাযথ স্বীকৃতির মতো বিভিন্ন ধরনের অ-অর্থনৈতিক প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়ে আরও বেশি বিবেচনা করা উচিত। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের জ্ঞান, পদ্ধতি ও বিচিত্র কৌশলের মাধ্যমে তাদের অবদানও জীববৈচিত্র্যসহ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাদের কৌশলগুলো জীবন, অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে অভিযোজিত হয়ে থাকে। তাদের এই অবদান তাদের অধিকার সংরক্ষণ থেকে কোনোভাবেই আলাদা করা সম্ভব নয়।

গাছপালা এবং এগুলোর উৎপাদন থেকে পৃথিবীতে মানুষের খাবার, বিনোদন ও চিকিৎসা সেবার ৮০ শতাংশ পাওয়া যায়। বনাঞ্চল বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আবাস এবং বিশুদ্ধ বায়ু ও পরিষ্কার পানীয় জলের জোগানদাতা। বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসসাধন কেবল উদ্ভিদ ও পশুর আবাসস্থলের জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। নিজস্ব জীববৈচিত্র্য নিয়ে বাস্তুতন্ত্র বন্যা ও ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানানসই।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) গাছের ঘনত্ব ৭০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রাকৃতিক বনে গাছকাটা বন্ধ এবং নানা উপায়ে বিদ্যমান গাছের ঘণত্ব বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে পাহাড়ি বনে প্রায় ৫০ হাজার

হেক্টর ও সমভূমির পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে গাছ লাগানো হবে। গাছ রোপণে উৎপাদনশীলতাও কয়েক গুণ বাড়ানো হবে। বনের জমির বহুমুখী ব্যবহার সুবিধা-সংবলিত গাছের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হবে। চলমান থাকবে বিদ্যমান উপকূলীয় বনায়ন ও সমৃদ্ধকরণ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম। উপকূলীয় বনায়ন সবুজ বেষ্টনী পুনর্বহালের জন্য বিদ্যমান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে নতুন করে গাছ রোপণ করা হবে।

১৫.৬ সারকথা

এসডিজি-১৫-এর অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অনেকটা সঠিক পথেই আছে। বাংলাদেশ বনায়নের আওতা ও আয়তনে প্রসার ঘটিয়েছে। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র এবং সংকটাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী রক্ষায় নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে। এ দেশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। তবে এর মান বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। দেশটি পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করেছে এবং আইনি প্রতিষ্ঠান কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ক্ষতিকর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত করেছে। এসব এলাকার মধ্যে রয়েছে শকুনিও পরিযায়ী পাখির কিছু বিচরণক্ষেত্র।

বাংলাদেশ বাস্তুতন্ত্রের জন্য সামগ্রিকতার (Wholistic) কৌশল গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে টেকসইভাবে বাস্তুতন্ত্র ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতি স্বীকৃতি দিয়েছে যে, বন সম্পদ উজাড় করে অর্থ প্রাপ্তির আশায় জীববৈচিত্র্য ও এর সংরক্ষণ কার্যক্রম বিঘ্নিত করা উচিৎ নয় এবং বাস্তুতন্ত্র পরিষেবাগুলোতে হ্রাস করা উচিত নয়। তবে আদিবাসী অঞ্চলগুলোর যথাযথ স্বীকৃতির মতো বিভিন্ন ধরনের অ-অর্থনৈতিক প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়ে আরও বেশি বিবেচনা করা উচিত। আদিবাসীদের জ্ঞান, পদ্ধতি ও বিচিত্র কৌশলের মাধ্যমে তাদের অবদানও জীববৈচিত্র্যসহ বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাদের কৌশলগুলো জীবন, অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে অভিযোজিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে এ বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে তা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে। পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে একীভূতকরণ, আর্থিক ও অ-আর্থিক সম্পদ কাজে লাগানো, বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল সৃষ্টি, পরিবীক্ষণের জন্য দরকারি তথ্য সংগ্রহ এবং অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

১৬

শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

১৬.১ এসডিজি ১৬ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

দুনিয়াজুড়ে সহিংসতা দমনে অগ্রগতি, আইনের শাসনের প্রসার, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং সব মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের প্রাপ্যতা এখনো সমতাভিত্তিক হয়নি। এখনো কয়েক মিলিয়ন মানুষ নিরাপত্তা অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সেবা এবং বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে অবহেলা করা হচ্ছে। সহিংসতার ভিন্ন রূপ- তথা যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং অপরাধ প্রবণতা উন্নয়নের গতি টেনে ধরছে। এজন্য এসডিজি-১৬ অর্জনে নতুন উদ্যম গ্রহণ করা জরুরি।

বিশ্বব্যাপী প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে পরিকল্পিত খুনের ঘটনা ২০১৫ সালের ৬ থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ৬ দশমিক ১ টিতে গিয়ে ঠেকেছে। এ সংখ্যা বেড়েছে মূলত লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় এবং সাব-সাহারা আফ্রিকার কিছু দেশে হত্যাকাণ্ড বাড়ার কারণে। শিশুর প্রতি সহিংসতাও চলছে নানাভাবে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল অঞ্চলসহ ৮৩ দেশে ব্যাপকভাবে শিশুরা নির্যাতনের শিকার। সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, এক থেকে ১৪ বছর বয়সি প্রতি ১০ জন শিশুর আট জনই নিজেদের বাড়িতে বিভিন্নভাবে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। উল্লিখিত ৮৩টি দেশের মধ্যে সাতটি বাদে বাকি সবগুলোয় মোট শিশুর কমপক্ষে অর্ধেক শিশুকে শৃঙ্খলা শেখানোর নামে নির্যাতন করা হয়। শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সম্ভবত যৌন সহিংসতা সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা। ৪৬ দেশের মধ্যে ১৪টিতে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ নারী নানাভাবে জোরপূর্বক যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এমনকি তাদের অনেকে ১৮ বছরের আগেই প্রথমবার এই নির্মমতার শিকার হয়।

সার্বিকভাবে মানব পাচারের প্রবণতাও বেড়েছে। তবে এতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের অর্থ খোঁজা যেতে পারে। নেতিবাচকভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, মানব পাচার আগের চেয়ে বেড়েছে। সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যায়, বেশিরভাগ পাচারের শিকার অভ্যন্তরীণভাবে শনাক্ত হয়। ২০১৬ সালে মানব পাচারের হার ছিল ৫৮ শতাংশ, যা ২০১৪ সালে ছিলো ৪৩ শতাংশ। অর্থাৎ পাচারের হার বেড়েছে। শনাক্ত হওয়া মানবপাচারে বেশিরভাগ বা ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু, যাদের যৌন কাজের জন্য সরবরাহ করা হয়।

শাস্তি হয়নি এমন বন্দিদের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোয় প্রায় ৩০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। এ সংখ্যা এমন প্রেক্ষাপটে পাওয়া যায়, যখন মোট কারাবন্দির সংখ্যা নিরঙ্কুশ মানে বেড়েছে। তবে এ সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অংশ হিসাবে স্থির রয়েছে। মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও শ্রমিক নেতা (ট্রেড ইউনিয়নিস্ট) হত্যার ঘটনাও বাড়ছে। জাতিসংঘ ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ৪১টি দেশে ৪৩১টি হত্যার তথ্য লিপিবদ্ধ করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টায় যারা সামনের সারিতে কাজ করেন, গড়ে তাদের অন্তত আটজনকে প্রতি সপ্তাহে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ ধারায় উদ্বেগজনক বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে, আগের দুই বছর অর্থাৎ ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালে প্রতিদিন একজন হত্যার শিকার হতেন।

ব্যক্তিগত অধিকার এবং ন্যায়বিচার ও সামাজিক সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে জন্মনিবন্ধন প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে। অনেক অঞ্চলে জন্ম নিবন্ধনের হার শতভাগ বা প্রায় শতভাগ। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এর গড় ৭৩ শতাংশ। সাব-সাহারা আফ্রিকায় পাঁচ বছরের নিচে ৪৬ শতাংশ শিশু জন্মনিবন্ধন পেয়েছে। বাধ্যবাধকতার যেসব আইন ও নীতিমালা একজন নাগরিককে সরকারি সংস্থার তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে, সেগুলো গৃহীত হয়েছে ১২৫টি দেশে। এর মধ্যে কমপক্ষে ৩১টি দেশ ২০১৩ সাল থেকে এসব আইন অবলম্বন করে আসছে। ১২৩টি দেশের আইনি কাঠামো-বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৪০টি দেশ একটি স্বাধীন প্রশাসনিক সংস্থার কাছে আপিল করার অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অথচ এই অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্যই এ ধরনের আইনের মূল চাবিকাঠি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্যারিস প্রিন্সিপলস (প্যারিস নীতিমালা) প্রতিপালন করে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা স্থাপনের অগ্রগতির হার ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। ২০১৮ সালে সব দেশের মধ্যে ৩৯ শতাংশ আন্তর্জাতিক চুক্তির মান প্রতিপালন করে এ ধরনের সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। যদি এ তালিকার সম্প্রসারণ বর্তমান গতিতে চলে, তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ মাত্র ৫৪ শতাংশ দেশে উপযুক্ত জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা প্রতিষ্ঠা হবে।

অনুমোদনও বাজেট বাস্তবায়নের যে পার্থক্য থাকে, সেটি দিয়ে সরকারের সামর্থ্য সম্পর্কে জানা যায়। এতে বোঝাযায়, সরকার জনগণকে সেবা সরবরাহের মধ্য দিয়ে কী পরিমাণ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। ২০০৬-২০১৭ সময়কালে ১০৮টি দেশে অনুমোদিত বাজেট এবং প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে বিচ্যুতির তথ্যে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক দেশের প্রকৃত ব্যয় ছিল অনুমোদিত বাজেটের পাঁচ শতাংশ কম বা বেশি। ১০টির মধ্যে একটি দেশে ১৫ শতাংশ কম বা বেশি বিচ্যুতি ছিল। বাজেট বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের

প্রায় অর্ধেক দেশে ১০ শতাংশের কম বা বেশি বিচ্যুতি ঘটে। দক্ষিণ এশিয়ায় এসডিজি-১৬ বাস্তবায়নে প্রচুর সম্পদ প্রয়োজন, যা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে জোগাড় করতে হবে। এসব ব্যয় হবে অর্থায়ন, প্রযুক্তি, সক্ষমতা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে।

এ অঞ্চলে এসডিজি ১৬ অর্জনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পদ্ধতিগত বিষয় (সিস্টেমেটিক ইস্যু) সামাল দেওয়া। পদ্ধতিগত যেকোনো জটিলতা সমাধান করা চ্যালেঞ্জিং কাজ। কারণ এতে প্রায়ই জটিল ও বিতর্কিত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। যেমন এসডিজি-১৬ দশমিক ৫-এ উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতি কমানোর কথা বলা হয়েছে। এটি পরিমাপ করা হয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাধারণ ব্যক্তি কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া বা চাওয়ার ঘটনার অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে। তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশগুলোতে অবশ্যই পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো থাকতে হবে। এ অঞ্চলের দেশগুলোকে অবশ্যই অহরহ লেনদেন হওয়া ছোটখাটো পর্যায়ের ঘুষ বন্ধে সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণের মতো পথে এগোতে হবে। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় এসডিজি-১৬-এর বেশিরভাগ সূচক দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত (টায়ার টু) হিসেবে শ্রেণিকৃত। এসব দেশে নিয়মিত তথ্য জোগান হয় না।

১৬.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি-১৬ অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

শান্তি, মানবাধিকার, স্থিতিশীলতা ও কার্যকর শাসন (Governance) ছাড়া টেকসই উন্নয়নের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা ব্যাপকভাবে বিখণ্ডিত। কিছু অঞ্চলে টেকসই মানের শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি রয়েছে। বিপরীতে অন্য অঞ্চলে আপাতদৃষ্টিতে অন্তঃহীন দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার চক্র বিরাজ করছে। এটি কোনোভাবেই অনিবার্য নয় এবং এর সমাধান দরকার।

টেকসই উন্নয়নের জন্য এসডিজি ১৬-তে প্রস্তাবিত শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। এসডিজি ১৬ অর্জনে সরকারের যে উদ্যম রয়েছে, তা বোঝা যায় নানা পদক্ষেপ থেকে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ। পরিণামে বাংলাদেশে পরিকল্পিত খুনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। গড় হারের চেয়েও মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির (ভিকটিম) সংখ্যা কমেছে। দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন ও সরকারি সেবায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার শাসন-সম্পর্কিত নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিছু উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), সিটিজেন চার্টার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)।

সূচক ১৬.১.১: জেন্ডার ও বয়সভেদে প্রতি এক লাখের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা

২০১৯ সালে প্রতি লাখ মানুষের বিপরীতে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১.৩৯ জনে নেমে এসেছে। এর মধ্যে পুরুষ ২ দশমিক ১ (২.১) ও নারী শুন্য দশমিক ৬৭ (০.৬৭) জন (বাংলাদেশ পুলিশ, ২০১৯)। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্রিয় পদক্ষেপ দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতিতে এবং সহিংস অপরাধের হার কমাতে সহায়তা করেছে।

সারণি ১৬.১: পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা

সূচক	২০১০	ভিত্তিবছর [২০১৫]	২০১৯	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	২০২৫ সাল নাগাদ মাইলফলক	২০৩০ সাল নাগাদ অভীষ্ট
৬.১.১ জেন্ডার ও বয়সভেদে প্রতি এক লাখের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা	২.৬	মোট ১.৯৪ পুরুষ: ৩.১ নারী ০.৭৬	মোট ১.৩৯ পুরুষ:২.১ নারী ০.৬৭	মোট:১.৬ পুরুষ: ১.৩ নারী ০.৩	মোট: ১.৫ পুরুষ:১.২ নারী:০.৩	মোট: ১ পুরুষ: ০.৯ নারী ০.২

সূত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৫, ২০১৯

সূচক ১৬.১.২: জেন্ডার, বয়স ও কারণভেদে প্রতি এক লাখে সংঘর্ষ-সম্পর্কিত মৃত্যু

সংঘর্ষ-সম্পর্কিত মৃত্যুর সংজ্ঞা দেওয়া হয় এভাবে–'যুদ্ধরত দুইপক্ষের সংঘর্ষে সম্পর্কিত প্রাণহানি। সামরিক ও বেসামরিক সব ধরনের জীবননাশ, যা এ অবস্থায় ঘটে; তার সবই সংঘর্ষ-সম্পর্কিত মৃত্যু হিসেবে গণ্য হয়।' (ইউএন, এনডি)। বাংলাদেশ পুলিশের ২০১৮ সালের উপাত্ত অনুসারে, প্রতি এক লাখ মানুষে এ সংঘর্ষ-সম্পর্কিত মৃত্যু ০.১৭; এর মধ্যে ০.৮ পুরুষ ও ০.০৯ নারী। যদিও বাংলাদেশ সরাসরি কোনো দেশের সঙ্গে কোনো যুদ্ধে জড়িত নয়। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক সেনাসদস্য বরং উচ্চ যুদ্ধ-আশঙ্কার দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে মোতায়েন রয়েছে।

সূচক ১৬.১.৩: পূর্ববর্তী ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া জনসংখ্যার অনুপাত

নারীর ওপর সহিংসতা (Violence Against Women-VAW) সমীক্ষা ২০১৫ অনুযায়ী, ৭২.৬ শতাংশ বিবাহিত নারী কোনো না কোনোভাবে তার স্বামী কর্তৃক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। পূর্ববর্তী ১২ মাসে ৫৪.৭ শতাংশ নারী যেকোনো ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

সূচক ১৬.১.৪: মোট জনসংখ্যার মধ্যে বসবাসের এলাকায় একা হাঁটার সময় নিরাপদ বোধ করা মানুষের অনুপাত

নাগরিক উপলব্ধি খানা জরিপ (সিটিজেন পারসেপশন হাউসহোল্ড সারভে–সিপিএইচএস), ২০১৮ অনুসারে ৮৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ মানুষ যে এলাকায় থাকেন, সেখানে একা হাঁটতে নিরাপদ বোধ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ৮৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৮৩ দশমিক ৭১ শতাংশ নারী। ২০১৯ সালের এমআইসিএস উপাত্ত অনুসারে, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি ৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ নারী একা হাঁটতে নিরাপদ বোধ করেন।

সূচক ১৬.২.১: পূর্ববর্তী মাসে এক থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশু, যারা নিজ গৃহে যেকোনো শারীরিক দণ্ড এবং / কিংবা মানসিক আঘাত পেয়েছে, তাদের অনুপাত

এক থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুর মধ্যে যারা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে তাদের হার ছিল ৮৮ দশমিক ৮ শতাংশ (এমআইসিএস, ২০১৯)। ছেলেদের ক্ষেত্রে তা ৮৯ দশমিক ২ শতাংশ এবং মেয়েদের মধ্যে ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ৯১ দশমিক ৯ শতাংশ ঘটেছে খুলনা বিভাগে (এমআইসিএস, ২০১৯; চিত্র ১৬.১)। বাংলাদেশের সব ভৌগোলিক অংশে শিশুদের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের ঘটনা ৮৫ শতাংশের বেশি। বোঝা যাচ্ছে, 'বেত না মারলে শিশু নষ্ট' এপ্রবাদ বাংলাদেশের সব জায়গায় মানা হয়।

চিত্র ১৬.১: পূর্ববর্তী একমাসে ১-১৪ বছর বয়সি শিশুর হার, যারা শৃঙ্খলা শেখানোর নামে নিগৃহীত হয়েছে, বাংলাদেশ ২০১৯

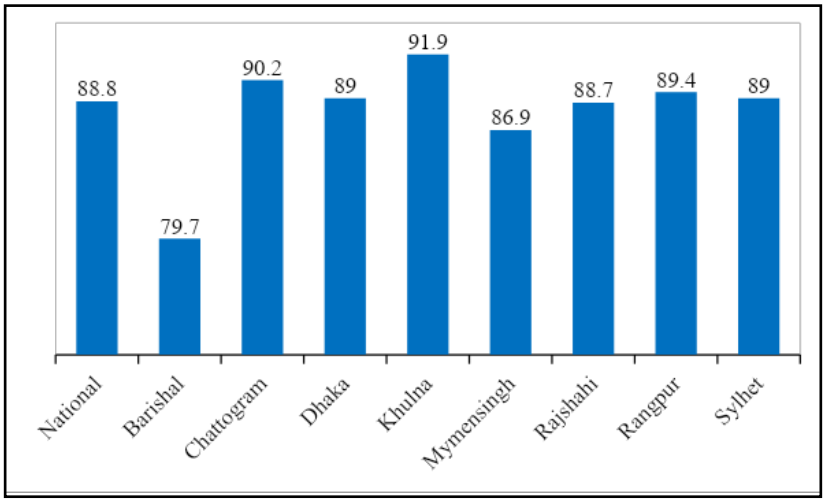

সূত্র: এমআইসিএস, ২০১৯

সূচক ১৬.২.২: জেন্ডার, বয়স ও হয়রানির ধরনভেদে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যায় মানব পাচারের শিকার মানুষের সংখ্যা

২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি এক লাখ জনে মানব পাচারের শিকার মানুষের সংখ্যা ২০১৫ সালের ভিত্তি বছরের তুলনায় কমেছে। ২০১৫ সালে প্রতি লাকে এ সংখ্যা ছিলো ০.৮৫ জন। ২০১৮ সালে তা ০.৬১ জনে নেমে এসেছে। মানব পাচারে ভিকটিমের মধ্যে পুরুষ ০.৫৮ ও নারী ০.৬৩ জন।

সারণি ১৬.২: মানব পাচার ও যৌন সহিংসতার শিকার

সূচক	বেজলাইন (২০১৫)	২০১৮	২০২৫ নাগাদ মাইলফলক
জেন্ডার, বয়স এবং হয়রানির ধরনভেদে মানব পাচারে প্রতি এক লাখে ভিকটিম সংখ্যা	০.৮৫ (পুরুষ: ০.৫৩; নারী ০.৩২)	০.৬১ (পুরুষ: ০.৫৮; নারী ০.৬৩)	মোট: ০.৩০

সূত্র: বাংলাদেশ পুলিশ, ২০১৯

সূচক ১৬.৩.১: পূর্ববর্তী ১২ মাসে যারা সহিংসতার শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত দ্বন্দ্ব নিরসনকারী সংস্থার কাছে অভিযোগকারী ব্যক্তির অনুপাত

২০১৫সালে যেসব নারী তাদের সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাদের ৭২ দশমিক ৭ শতাংশ অন্য কারও সঙ্গে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেননি। মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ ভিকটিম স্থানীয় নেতাদের কাছে অভিযোগ করেছেন, আর ১ দশমিক ১ শতাংশ পুলিশের সহায়তা চেয়েছেন। তবে ২০১৫ সালের পর থেকে এ বিষয়ে চমকপ্রদ অগ্রগতি দেখা গেছে। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৩৭ হাজার উপকারভোগীকে আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ২০১৭ সালেই ৮০ হাজার মানুষকে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এমআইসিএস, ২০১৯ অনুসারে, সহিংসতার শিকার ১০ দশমিক ৩ শতাংশ নারী পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন।

সূচক ১৬.৩.২: কারাগারে মোট বন্দির মধ্যে অ-দণ্ডিত হাজতির অনুপাত

এই সূচকে মামলা নিষ্পত্তিকরণ ও কার্যকর বিচারব্যবস্থায় অভিগম্যতা নিশ্চিতে সম্পাদিত কর্মের (পারফরম্যান্স) মূল্যায়ন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে অ-দণ্ডিত বন্দির সংখ্যা অনেক বেশি। ২০১৮ সালে মোট বন্দীর ৮৩ দশমিক ৬০ শতাংশ ছিলো অ-দণ্ডিত। এটি ২০৩০ সাল নাগাদ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণের বেশি। এসংখ্যা প্রত্যাশিত সীমায় রাখতে প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে।

সূচক ১৬.৫.১: পূর্ববর্তী ১২ মাসে যেসব ব্যক্তি অন্তত একজন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং সরকারি কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়েছেন অথবা যাদের কাছে ঘুষ দাবি করা হয়েছিল এমন ব্যক্তির অনুপাত

সিটিজেন পারসেপশন হাউসহোল্ড সার্ভে (সিপিএইচএস) ২০১৮ অনুসারে, পূর্ববর্তী ১২ মাসে ৩১ দশমিক ৩২ শতাংশ ব্যক্তি অন্তত একজন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং উৎকোচ দিয়েছেন, অথবা সরকারি কর্মকর্তারা তাদের কাছে ঘুষ দাবি করেছিলেন।

সূচক ১৬.৬.২: সর্বশেষ সরকারি সেবা গ্রহণকারী সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত

সিটিজেন পারসেপশন হাউসহোল্ড সার্ভে (সিপিএইচএস, ২০১৮)-এর তথ্য অনুযায়ী, ৩৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ মানুষ সর্বশেষ যে সরকারি সেবা নিয়েছে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

সূচক ১৬.৯.১: বয়সের ভিত্তিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের অনুপাত,

বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে জন্মনিবন্ধন করানো হয়েছে–পাঁচ বছরের নিচে এমন শিশুর অনুপাত ২০১২-১৩ সালে ছিল ৩৭ শতাংশ। এটি বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৬ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত হয়। এ অনুপাত গ্রাম এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশি বা ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ; শহর এলাকায় ৫৪ শতাংশ।

সূচক ১৬.১০.২: সরকারি তথ্য প্রাপ্যতায় সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ/কিংবা নীতি অবলম্বন ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' কার্যকর করা হয়েছে। চিন্তাভাবনা, বিবেক ও কথা বলার স্বাধীনতা মানুষের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করা হয়। এআইন অনুসারে একটি স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন মূলত পাঁচটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল। এর মধ্যে রয়েছে নির্দেশনা ও নীতিমালা তৈরি; গবেষণা পরিচালনা,তথ্য প্রাপ্যতার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি প্রতিপালনে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো; সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং অভিযোগের প্রতিকার করা। এসবের বাইরে, তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) বাস্তবায়ন করাও মূলত তথ্য কমিশনেরই দায়িত্ব।

সূচক ১৬.ক.১: প্যারিস নীতিমালা প্রতিপালনকারী স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার উপস্থিতি

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' অনুসারে দেশে একটি সংবিধিবদ্ধ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা করা। 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭'গ্রহণে ভূমিকা রাখে মানবাধিকার কমিশন। মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদাশীল সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় এ কমিশন তাৎপর্যপূর্ণ ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে। এতে সহযোগিতা থাকে সংশ্লিষ্ট সব গোষ্ঠী, যেমন সুশীল সমাজ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার। এ কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে আসছে। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোনো অভিযোগ তদন্ত করে। কমিশন নিজস্ব পরিবীক্ষণের মাধ্যমে অবগত নির্দিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও খতিয়ে দেখে। বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অথবা আদালত কিংবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তা হস্তান্তর করে। এছাড়া মানবাধিকার বিরোধের বিভিন্ন ঘটনায় মধ্যস্থতা বা প্রশমনের কাজ করে।

সূচক ১৬.খ.১: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে বৈষম্য হিসেবে বিবেচিত বিষয়ে পূর্ববর্তী ১২ মাসে ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্য বা হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগকারী ব্যক্তির অনুপাত

সিটিজেন পারসেপশন হাউসহোল্ড সার্ভে (সিপিএইচএস, ২০১৮) অনুযায়ী ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ পূর্ববর্তী ১২ মাসে ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্য বা হয়রানির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে নিষিদ্ধ আচরণগুলোকেই বৈষম্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এমআইসিএস, ২০১৯ অনুসারে, ১৫-৪৯ বছর বয়সি ১০ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, তারা পূর্ববর্তী ১২ মাসে বৈষম্যের অথবা হয়রানির শিকার হয়েছে।

১৬.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

যদিও বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, তবুও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে, যা এসব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। প্রথমত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। এর ফলে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্ধারণ ও যথাযথ অর্থায়ন কৌশল অবলম্বন করা কঠিন হয়ে যায়। এমনকি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অন্বেষণ করাও দুরূহ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে অপর্যাপ্ত সমন্বয়ের কারণে বাজেট বরাদ্দ ও এসডিজি-সম্পর্কিত কার্যক্রমের মূল্যায়নে অনেক অনৈক্য দেখা দেয়। জিইডি প্রকাশিত ২০১৮ সালের এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়ন কৌশলে এসডিজি ১৬ অর্জনে বাড়তি বিনিয়োগের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সে হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রয়োজন হবে ১০৮ কোটি (১.০৮ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৭৮ কোটি (১.৭৮ বিলিয়ন) ও ২০২৯-৩০ অর্থবছরে ২৩৩ কোটি (২.৩৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। ধরে নেওয়া যেতে পাওে, এই বাড়তি খরচের ৮০ শতাংশ সরকারি উৎস এবং ২০ শতাংশ বাইরের উৎস থেকে আসবে। ২০২০ সালে জন নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য অতিরিক্ত প্রায় ৪০ কোটি (০.৪০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যাএসডিজি অর্থায়ন কৌশলের প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ। কাজেই অর্থায়নের ঘাটতি পূরণে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে আরও সহযোগিতা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা ও যথাযথ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা কৌশল বিনির্মাণ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর বিচার ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাও মৌলিক চ্যালেঞ্জ। বিচার বিভাগে মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাবে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

সহিংসতার ঘটনা, বিশেষ করে পারিবারিক সহিংসতা এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে অভিযোগ করা দেশে বড় একটি বিষয়। আসলে সহিংসতা রোধ, ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিকে রক্ষা, ভিকটিমকে সহায়তা দেওয়া এবং হামলাকারীকে আরও আইননানুগ প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সময়মতো অবহিত করা প্রয়োজন।

১৬.৪ ভবিষ্যৎ করণীয়

নারীরা শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার বেশি শিকার হচ্ছে দরিদ্র পরিবারে। এজন্য ব্যাপক জনসচেতনতা, আরও জোরালো প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে আইন প্রয়োগেরও দরকার পড়বে।

বর্তমানে এসডিজি-১৬ অর্জনের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বিষয়টি শুধু বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য দুশ্চিন্তার নয়, বরং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতির জন্যও ভাবার বিষয়। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নির্যাতনের শিকার হয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। যথাযথ নাগরিকত্বের মর্যাদা নিয়ে এই আশ্রয়প্রার্থীদের মিয়ানমারে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল প্রত্যাবর্তন এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। তাহলে এসডিজি অর্জনে সম্পদের ওপর চাপ কমবে। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে নিজস্ব নাগরিককে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ় করা জরুরি। পাচারকারীরা উন্নত ও তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় অতিথি কর্মীর প্রবেশে বৈধতার সুযোগ কাজে লাগায়, কেননা হাজারো বাংলাদেশি অনেক বেশি সুযোগের আশায় বিদেশে পাড়ি জমাতে চায়। তাদের অনেকেই মানব পাচারকারীদের জালে আটকা পড়ে, যারা পরবর্তীকালে অন্য দেশে জোরপূর্বক শ্রম অথবা অন্য শোষণমূলক পরিস্থিতির শিকার হয়।

১৬.৫ সারকথা

এসডিজি ১৬-এর অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। সফলতা এসেছে সব ধরনের সহিংসতা ও সম্পর্কিত মৃত্যুহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমানোর ক্ষেত্রে। সবার জন্যনিবন্ধনের মতো বৈধ পরিচয় এবং সব পর্যায়ে কার্যকর, দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়েছে। দেশটি প্রাণপণ চেষ্টা করছে জনসাধারণের তথ্য অধিকারে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। এছাড়া সচেষ্ট রয়েছে নির্যাতন, শোষণ, পাচার এবং শিশু নির্যাতন ও সব ধরনের সহিংসতা বন্ধে। উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতি ও সব ধরনের উৎকোচ কমাতে এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংস্থাকে শক্তিশালী করতে সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস ও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে দেশে সব পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে।

বহুপক্ষীয় দাতার প্ল্যাটফর্ম গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ফান্ডের (জিসিইআরএফ) আওতায় বাংলাদেশে একটি মিশ্র ধারার পদ্ধতির প্রসার ঘটছে। এতে সরকার ও সুশীল সমাজের কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করেন। তারা তৃণমূল পর্যায়ের অভিঘাত সহনশীলতাকে প্রবলতর করেন ও তা কাজে লাগান উগ্রবাদ ও চরমপন্থি প্রবণতার বিরুদ্ধে। নারীর প্রতি বৈষম্য ঘটে ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা উদ্যোগের (এন্টারপ্রাইজ) ক্ষেত্রে। সব ধরনের বৈষম্য প্রতিরোধে আরও কার্যকর কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও তৃণমূল পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শান্তি, মানবাধিকার, স্থিতিশীলতা ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ (Governance) ছাড়া টেকসই উন্নয়নের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতার বিধ্বংসী প্রভাব রয়েছে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি এ থেকে সৃষ্ট দুর্দশা কয়েক প্রজন্ম ধরে স্থায়ী হয়। যৌন সহিংসতা, অপরাধ, শোষণ ও নির্যাতন অহরহ ঘটেএবং বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের রক্ষায় কাজ করছে। এই প্রক্রিয়ায় আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রসার ঘটানো গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ মজবুত করাও জরুরি।

১৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

টেকসই উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ

১৭.১ এসডিজি ১৭ অর্জনে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ সালের মধ্যে সফলভাবে অর্জনে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এতে থাকবে সরকারি ও বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ মানুষ। এই অংশীদারিত্বের ভিত্তি হবে সর্বজনীন নীতি ও মর্যাদা, পারস্পরিক দর্শন এবং সম্মিলিত অভীষ্ট। এসবের কেন্দ্রে থাকবে মানুষ এবং পুরো পৃথিবী। এই অংশীদারিত্বের জন্য দরকার ফলপ্রসূ ও সমতাভিত্তিক কর্মকাণ্ড। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সব সম্পদের রূপান্তরশীল শক্তি উদ্‌ঘাটন ও সংহত করে প্রয়োজন মতো কাজে লাগাতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোয় সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগসহ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ প্রয়োজন; বিশেষ করে টেকসই জ্বালানি, অবকাঠামো, পরিবহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে। সরকারি খাতে সুস্পষ্ট গন্তব্যও নির্ধারণ করা দরকার। এসব বিনিয়োগের নিশ্চয়তাদানকারী বিষয়গুলো পুনর্গঠন করতে হবে। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো, আইনকানুন ও প্রণোদনার ধরন। এর ফলে নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং টেকসই উন্নয়ন আরও শক্তিশালী হবে। নিরীক্ষা পদ্ধতির মতো জাতীয় তদারকি কৌশলগুলোকে আরও শক্তিশালী করা আবশ্যক।

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে সমন্বিত নীতিমালার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি সম্পদ সংহত করার সক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ স্থিতিশীলতা (ডেট সাসটেইনেবিলিটি) নিশ্চিত করা দরকার। বিনিয়োগ জনপ্রিয় করার কার্যক্রম এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনরুজ্জীবিত করার কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়ন দরকার। এসবের জন্য জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ বিনিময়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে।

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর (এলএমআইসিএস) জন্য অর্থ জোগানের বড় উৎস অভ্যন্তরীণ কর, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগসহ (এফডিআই) এবং অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসটেন্স (ওডিএ)। আর এই দেশগুলোর জন্য অ-আর্থিক সম্পদের অপরিহার্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে নীতিকাঠামো, কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও সুশাসনের জন্য সহায়তা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা। ওডিএ-প্রবাহ স্থিতিশীল রয়েছে। তবে তা ২০১৭ সালে লক্ষ্যমাত্রার নিচে ১৪ হাজার ৭০০ কোটি (১৪৭ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ছিল। ২০১৮ সালে ওইসিডির মাত্র পাঁচটি ড্যাক সদস্য দেশ উন্নয়ন সহায়তা বাবদ লক্ষ্যমাত্রার ০.৭ শতাংশ মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই) প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পেরেছে বা অতিক্রম করেছে। এ পাঁচটি দেশ হলো ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, সুইডেন ও যুক্তরাজ্য।

বাস্তবায়নের কয়েকটি কৌশলে অগ্রগতির হার বেশ গতিশীল; যেমন ব্যক্তিগত প্রবাসী আয় এখন যেকোনো সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীব্যাপী খুব দ্রুত বাড়ছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ২০১৯ সালে প্রায় ৫৫ হাজার কোটি (৫৫০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এই সংখ্যা নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে এফডিআই ও ওডিএ প্রবাহের চেয়েও বেশি। ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি বা ৩৯০ কোটি মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অগ্রগতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক তথা সমাজের পথে বড় পদক্ষেপ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

২০১৭ সালে বাণিজ্য-ভরযুক্ত শুল্ক (ট্রেড-ওয়েইটেড ট্যারিফ) পৃথিবীব্যাপী ২ দশমিক ২ শতাংশ হ্রাস পায়। এর অর্থ হচ্ছে পণ্য ও সেবায় আরও বেশি অভিগমনের সুযোগ রয়েছে, যা আরও মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার সৃষ্টি করছে। কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে বড় ধরনের পার্থক্য রয়ে গেছে, যা বৈশ্বিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার প্রতিফলন ঘটায়। দেশে দেশে নীতিমালার জন্য দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন অংশীদারদের মান ২০১৬ সালের ৬৪ শতাংশ থেকে কমে ২০১৮ সালে ৫৭ শতাংশে ঠেকেছে। ২০১৮ সালে ১১৪টির মধ্যে ৫১টি দেশ ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে বহু-সংশ্লিষ্টজনের অংশীদারিত্ব তৈরি ও কার্যকর করার উপায়সমূহের বিষয়ে সার্বিক অগ্রগতির কথা অবহিত করেছে। উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যক্রম ও সরকারি খাতের মাধ্যমে প্রবাহিত অর্থের জন্য বিবরণ পদ্ধতি এবং সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা ব্যবহারের গুণগত মানের অগ্রগতি এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

১৭.২ সূচকের ভিত্তিতে এসডিজি ১৭- অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা

সম্পদ সংহতকরণ

'এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়ন কৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' একটি সুনির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে। যেটা এসডিজি অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকপাত করে। বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়ন কৌশলে বাড়তি ৯২ হাজার ৮৪৮ কোটি (৯২৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার প্রয়োজন। এই অর্থ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের স্থির হিসাব অনুযায়ী দেশের জিডিপির প্রায় ১৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের তিনটি শর্তই বাংলাদেশ ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো পূরণ করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সাল নাগাদ এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ সঠিক পথেই রয়েছে। তবে এর সুবাদে ভবিষ্যতে বাড়তি কিছু চ্যালেঞ্জ উঁকি দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে কিছু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অগ্রাধিকার ও সহায়তা কৌশল হারানোর শঙ্কা।

সরকারেরও উপলব্ধি রয়েছে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে দেশি বা বিদেশি সম্পদ সংহতকরণের জন্য বর্তমান অগ্রগতির ক্ষেত্রে আরও উন্নতি দরকার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত ১৩ দশমিক ০৫ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি দরকার। বাংলাদেশ এখন আর অনুদাননির্ভর দেশ নয়। তবুও দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সামাজিক খাতের কর্মকাণ্ড এবং অবকাঠামো উন্নয়নে ওডিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ওডিএর তথ্য থেকে জানা যায়, এ ধরনের উন্নয়ন সহায়তার প্রবৃদ্ধি পরিমিত হলেও জিডিপিতে এর অবদান সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কমছে। বাংলাদেশে ত্বরিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে অভ্যন্তরীণ সম্পদে গুরুত্ব রেখে বেশি পরিমাণ পুঁজি ব্যবহারের কৌশল রয়েছে, যার অংশ হিসেবে যথাযথ প্রক্রিয়ায় এফডিআইয়ের বাড়তি প্রবাহ কাজে আসতে পারে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ এক হাজার ১৮৬ কোটি ৮৯ লাখ ৭০ হাজার (১৬৪০০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় হিসেবে অর্জন করেছে। এই পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবাহ থেকে ১০ শতাংশ বেশি। প্রবাসীদের উপার্জন থেকে পাঠানো আয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ।

সারণি ১৭.১: বহিঃস্থ অর্থের উৎসসমূহ

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
ওডিএ, মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩০০৫.৫	৩৫৩১.৭	৩৬৭৭.৩	৬৪০০.০	৬২১০.০
এফডিআই (নেট) মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৮৩০	২০০০	২৪৫০	২৫৮০	৩৮৮০
প্রবাসী আয়, বিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৫.৩	১৪.৯	১২.৮	১৪.৯	১৬.৪

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ব্যাংক

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা ইআরডি। এটি বিভিন্ন উৎস থেকে বহিঃস্থ সম্পদ বা অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনে সহায়তার জন্য অর্থেও যোগান বাড়াতে বেশকিছু কৌশলগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি পদক্ষেপ কার্যকর করেছে। সম্পদ সংহতকরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনতে বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সঙ্গে ইআরডি সহযোগিতা জোরদার করেছে। এছাড়া সম্ভাব্য ও সুবিধাজনক উন্নয়ন সহযোগিতা নিশ্চিত করতে ইআরডি উন্নয়ন সহযোগিতার জাতীয় নীতি (এনপিডিসি) প্রস্তুত করেছে।

ফলপ্রসূ বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উন্নয়নে বেশকিছু পদক্ষেপ রেখেছে ইআরডি। এগুলোর মধ্যে অন্যতম–উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে (এইচএলপিএফ) সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা (ভিএনআর) উপস্থাপন এবং ফলপ্রসূ উন্নয়ন সহযোগিতার বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব (জিপিইডিসি) উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে (এইচএলএমটু) অংশগ্রহণ। পরবর্তীকালে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে জিপিইডিসির এইচএলএমটু'র সহ-চেয়ার নির্বাচিত হয়।

কার্যকরভাবে বহিঃস্থ সংস্থান ব্যবস্থাপনা ও সংহতকরণে ইআরডির আরও কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত স্থানীয় পরামর্শক গোষ্ঠীর বৈঠক, অনলাইন অনুদান পোর্টাল 'এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'-এর সূচনা, প্রণিধানযোগ্য সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে নগদ প্রবাহের কৌশলগত রূপান্তর এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল। এছাড়া ২০১৮ সালে ইআরডি বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ) আয়োজন করে।

সূচক ১৭.১.১ এবং ১৭.১.২ উৎসের ভিত্তিতে জিডিপির অনুপাত হিসাবে মোট সরকারি রাজস্ব এবং অভ্যন্তরীণ করের সুবাদে অর্থায়ন পাওয়া দেশীয় বাজেটের অনুপাত

বাজেটের চাহিদা মেটাতে সরকারের সক্ষমতার বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় জিডিপির অনুপাত হিসাবে সরকারের মোট রাজস্ব ও অর্থনৈতিক সম্পদে সরকারের নিয়ন্ত্রণ পরিমাপের ভিত্তিতে। ২০১৮-১৯ মেয়াদে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব মিলে সমন্বিত মোট সরকারি রাজস্ব ছিল ৩ লাখ ১৬ হাজার ৫৯৯ কোটি (৩১৬৫ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন) টাকা, যা জিডিপির ১২.৪৮ শতাংশ। এর অংশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এই অর্জনের পেছনে রয়েছে মূলত নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা বাড়ানো, কর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং সুচিন্তিত কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ। মোট সরকারি রাজস্বের ৯০ শতাংশের বেশি কর রাজস্ব। অভ্যন্তরীণ বাজেটে এর অবদান সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেড়েছে। বাজেট অর্থায়নে করের অবদান ২০১৭ সালেই ২০২০ সালের মাইলফলক অতিক্রম করে গেছে।

সারণি ১৭.২: মোট সরকারি রাজস্ব ও অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত

সূচকসমূহ	২০১০	বেজলাইন ২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
উৎসের ভিত্তিতে জিডিপির অনুপাত হিসাবে মোট সরকারি রাজস্ব	১০.৪	১০.৭৮	১০.২৬	১০.১৬	১১.৬	১২.৪৮
অভ্যন্তরীণ কর থেকে তহবিল পাওয়া অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	৬০.৮	৬২.০	৬১.৭৫	৬১.৭৭	৬৪.১৬	৬৫.৮৫

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

সূচক ১৭.৩.১: মোট অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত হিসেবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই), আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহায়তা (এসএসসি)

এফডিআই ও ওডিআই নিয়ে গঠিত বহিঃস্থ অর্থায়ন উৎস। এটি বাংলাদেশের বাজেট ব্যয়ে ১৫ শতাংশ অবদান রেখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৬ সালে নেট ওডিএ ছিল ৩৫০ কোটি (৩.৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৭ দশমিক ২৭ শতাংশ বেশি। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে জাতীয় বাজেটের আকৃতির প্রসার ওডিএর প্রবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ছে। যদিও ২০১৮ সালে ওডিএ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৬৪০ কোটি (৬.৪০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার হয়েছিল। বহিঃস্থ অনুদানের (এইড) প্রতিশ্রুতি বছর বছর বাড়ছে। এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে বিদেশি অনুদানের অন্তঃপ্রবাহ বাড়তে থাকবে। ফলে অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্য খাতের বিকাশে বিনিয়োগ বাড়বে।

সারণি ১৭.৩: বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা এবং বার্ষিক বাজেট

	২০১০	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
বাজেট (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৮.২৭	২৩.৬৯	২৭.৮২	৩০.৮৬	৩৩.৮১	৩৩.৮০	৪২.৫৮	৫১.০০	৫৫.৩১
ওডিএ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১.৭৮	২.০৬	২.৭৬	৩.০৫	৩.০১	৩.৫৩	৩.৬৮	৬.৪০	৬.২১
বাজেটের % হিসেবে ওডিএ	৯.৭	৮.৭	৯.৯	৯.৯	৮.৯	৯.৬	৮.৬৪	১২.৫৫	১১.২৩

সূত্র: ইআরডি, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়

আরেক দিকে সরকারের বাজেটে এফডিআইয়ের অনুপাত আগের অর্থবছরের (২০১৭-১৮) তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০ শতাংশ বা এক বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও একটি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসে বড় অঙ্কের চীনা বিনিয়োগ আসায় এফডিআই বেড়েছিল। তারপরও ২০৩০ সালের মাইলফলক কিছুটা উচ্চাভিলাষী মনে হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে অর্থায়নের অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এফডিআই আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের ৩.০০ শতাংশের আশেপাশে ওঠানামা করে তেমন লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন ছাড়া। ২০৩০ সালের মাইলফলক অর্জন ও দেশে পর্যাপ্ত এফডিআই আকর্ষণে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন করতে আরও মনোযোগ প্রয়োজন।

সারণি ১৭.৪: বার্ষিক বাজেটের অনুপাত সিসেবে এফডিআই

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯
এফডিআই (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১.৮৩	২.০০	২.৪৫	২.৫৮	৩.৮৮
বাজেটের % হিসাবে এফডিআই	৫.৪১	৫.৯২	৫.৭৫	৫.০৬	৭.০২
আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের অনুপাত হিসাবে এফডিআই (%)	৩.২	৩.৬	৩.৬	২.৯	২.৮

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, আঙ্কটাড ২০১৯

সূচক ১৭.৩.২: মোট জিডিপির অনুপাত হিসাবে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)

প্রবাসী আয়ের বার্ষিক প্রবাহ ২০১৫ সাল থেকেই বাড়ছে। ২০১৯ সালে তা বেড়ে রেকর্ড ১৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। এর পরও ২০২০ সালে প্রবাসী আয় ও জিডিপির অনুপাত ১৪ শতাংশের মাইলফলক অর্জন করা উচ্চকাঙ্ক্ষী মনে হচ্ছে।

সারণি ১৭.৫: জিডিপির অনুপাত হিসাবে প্রবাসী আয়

	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯
প্রবাসী আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৫.৩১	১৪.৯৩	১২.৭৭	১৪.৯৮	১৬.৪২
জিডিপির % হিসাবে প্রবাসী আয়	৭.৮	৬.৭	৫.১	৫.৫	৫.৪

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়; বিশ্বব্যাংকের তথ্য

সূচক ১৭.৪.১: পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানির অনুপাত হিসাবে ঋণসেবা (%)

এই সূচকে মোট রপ্তানি আয়ের অনুপাতে ঋণ পরিশোধ, সুদ ও মূলধন পরিশোধ পরিমাপ করা হয়। বৃহৎ ঋণপরিশোধের কারণে সরকারের উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর সক্ষমতা কমে যায়। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ঋণসেবার বোঝা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেড়েছে। ২০১৫ সালের ৩ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে তা উর্ধ্বমুখী থেকে ২০১৯ সালে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। এখন পর্যন্ত তা নিরাপদ সীমার মধ্যে আছে। তবে সরকারের উচিত সতর্কভাবে এই প্রবণতায় লক্ষ্য রাখা, যেন প্রয়োজন হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

সারণি ১৭.৬: রপ্তানির অনুপাত হিসাবে ঋণসেবা

সূচক	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯
১৭.৪.১ পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানির অনুপাত হিসাবে ঋণসেবা (%)	৩.৫	৩.১	৩.২	৩.৮	৩.৯

সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়; বিশ্বব্যাংকের তথ্য

সূচক ১৭.৬.২: গতির ভিত্তিতে প্রতি ১০০ অধিবাসীর মধ্যে ফিক্সড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রাহক

ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ব্যবহার জ্ঞান বিনিময় এবং তা অন্বেষণের বিশাল সুযোগ তৈরি করে দেয়। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সংযুক্তি (কানেক্টিভিটি) দেশে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। বিটিআরসির ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি ১০০ মানুষের মধ্যে গ্রাহকের

সংখ্যা ৪.৮০। ২০১৪ সালের তুলনায় এ হার দ্বিগুণেরও বেশি। থ্রিজি সংযোগ ২০২০ সালে টুজি সংযোগের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে মোট সংযোগের ৪৬ শতাংশ হবে টুজি। এজন্য মোবাইল অপারেটরদের তরফ থেকে নিয়মিত বিনিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে। উদ্বোধনের শুরুর দিকে থ্রি-জি যেভাবে ব্যবহারকারীর মাঝে সাড়া ফেলে, ফোরজি চালুর প্রথমদিকে সেভাবে সাড়া নাও পেতে পারে। তবে তা ২০২৫ সাল থেকে ত্বরান্বিত হবে। যে সময় মোট সংযোগের অর্ধেকই ফোর-জি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক ২০২৫ সালের মধ্যে ৭ কোটি ৩০ লাখে(৭৩ মিলিয়ন) পৌঁছার পূর্বাভাস রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির এই সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ২০ শতাংশ। এই আলোকে ইন্টারনেট গ্রাহক বাড়তে থাকায় পরবর্তী বছরগুলোয় মাত্র ১০ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দরকার হবে।

সারণি ১৭.৭: ফিক্সড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রাহক

সূচক	২০১০	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
গতির ভিত্তিতে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে ফিক্সড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রাহক	০.২৭	০.৩৯	০.৯৯	২.০০	৩.১৩	৪.১৭	৪.৫৭	৬.৩৪	৪.৮০

সূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংকের তথ্য ২০১৯, এবং বিটিআরসি

চিত্র ১৭.১: বাংলাদেশে ফিক্সড ব্রডব্যান্ড গ্রাহক (প্রতি এক হাজার মানুষে)

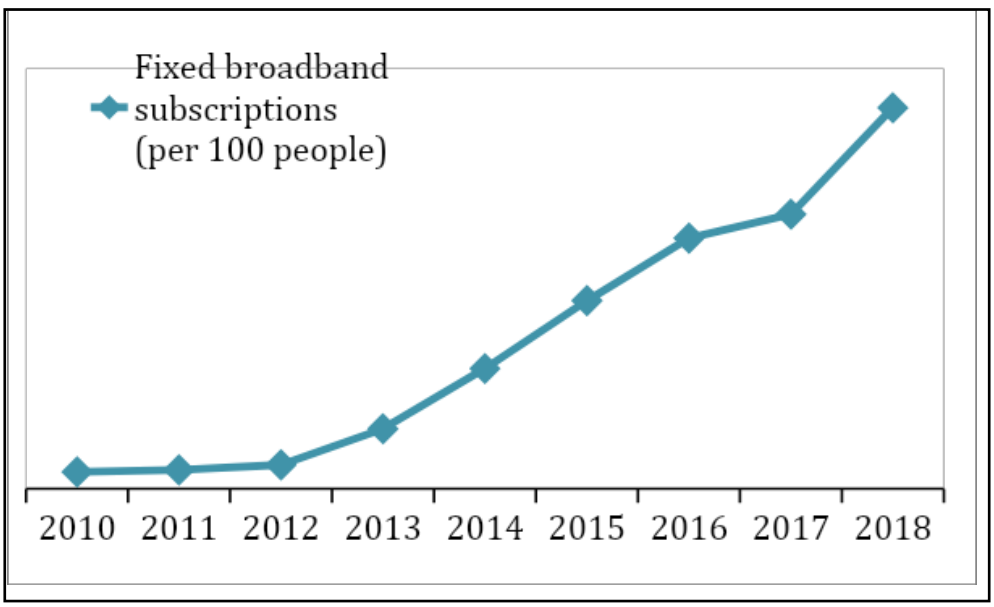

চিত্র ১৭.২: বাংলাদেশে চালুর এক বছর পর থ্রিজি ও ফোরজি অবলম্বনের ধারা

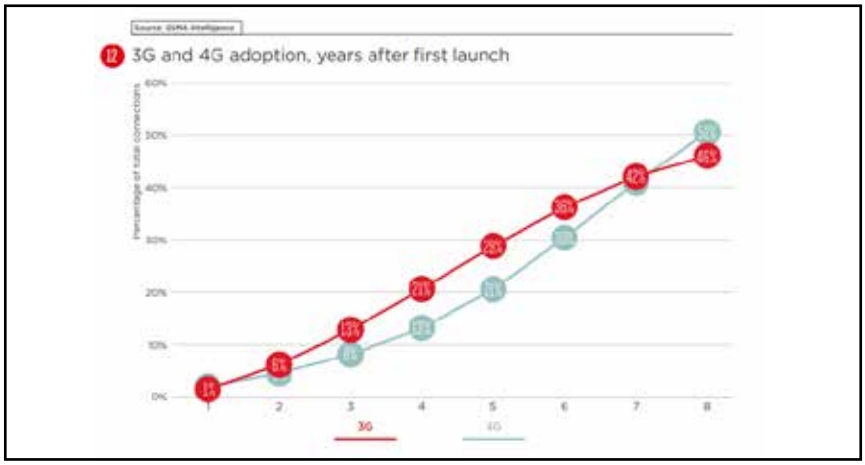

সূচক ১৭.৮.১: ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুপাত

ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত থেকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভিগম্যতা পরিমাপ করা হয়। বাংলাদেশ এটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে ২০১৫ সালে ৩৪ দশমিক ৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১০ সালে ছিল ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। জনসংখ্যার অনুপাতে খুব দ্রুত এই আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি অবলম্বন করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এটি ছিল ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ ও ২০১৯ সালে ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ। এ হিসাবে ২০২০ সালের মাইলফলক অতিক্রম হয়ে গেছে ২০১৬ সালেই। বাংলাদেশে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ১০০ মিলিয়নে পৌঁছেছে। দেশে গ্রাহক সংখ্যা পৌঁছেছে ৯৯ দশমিক ৪২৮ মিলিয়নে। এই সংখ্যা দেশের মোট মানুষের দুই-তৃতীয়াংশের চেয়ে খানিকটা কম।

সারণি ১৭.৮: ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুপাত (শতাংশ)

সূচক	২০১০	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
১৭.৮.১ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুপাত	৩.৭	৫.০	৬.৬৩	১৩.৯	১৪.৪ ৩৪.৬৩ (বিটিআরসি ২০১৫)	১৮.০২ ৪১.৪ (বিটিআরসি ২০১৫)	১৫ ৫০.৪ (বিটিআরসি)	৫৬.৬ (বিটিআরসি)	৬০.৪ (বিটিআরসি)

সূত্র: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক ২০১৯, বিশ্বব্যাংকের তথ্য এবং বিটিআরসির তথ্য হিসাব করে

চিত্র ১৭.৩: বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (জনসংখ্যার %)

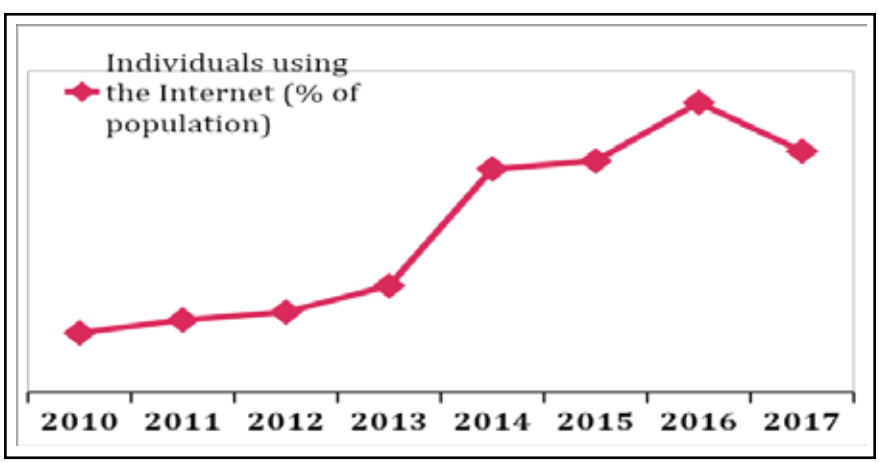

সূত্র: বিশ্বব্যাংক

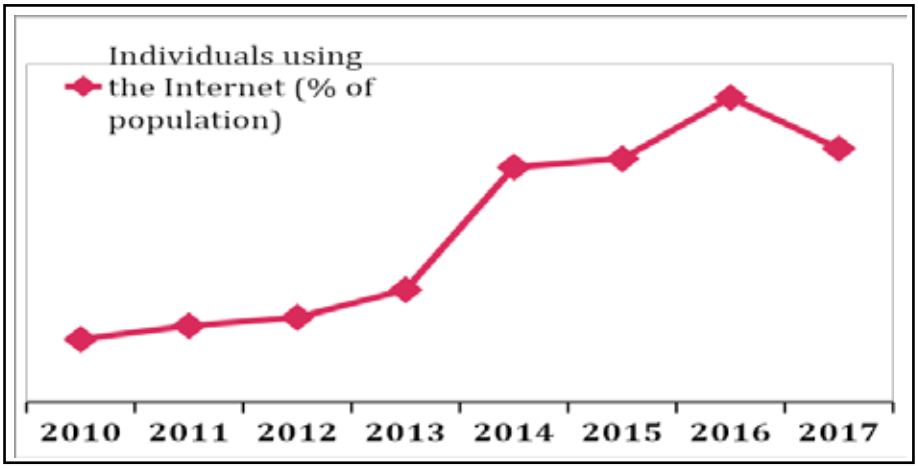

সূচক ১৭.৯.১: উন্নয়নশীল দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেওয়া অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার পরিমাণ (মার্কিন ডলারে); উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমাত্রিক সহায়তা এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত

এসডিজি অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশের সক্ষমতা বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রদত্ত কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার পর্যায় মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে এই সূচক। সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা উন্নয়নশীল দেশের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য ২০১৮ সালে প্রতিশ্রুত সহায়তার পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার (৩৮২ দশমিক ৪২ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। এই সূচকে নিম্নগামী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত করবে। ২০৩০ সাল নাগাদ বার্ষিক ১৫০ কোটি (১,৫০০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্য রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ এলডিসির জন্য নির্ধারিত কিছু কারিগরি ও আর্থিক সুবিধা হারাবে। তবে আশা করা যায়, এর ফলে বড় কোনো নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে না। নির্বিঘ্নে পাঁচ বছরের মেয়াদ পার হলে বাংলাদেশ 'এলডিসি টেকনোলজি ব্যাংকে' আর প্রবেশাধিকার পাবে না। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশীদার (ইউএনওএসএসসি, ২০১৭)। প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ (১২ মিলিয়ন) মার্কিন ডলারের একটি পিপিপি কারিগরি সহায়তা তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুর দিকে প্রকল্প উন্নয়নে অর্থায়ন সহযোগিতা করা।

সারণি ১৭.৯: বাংলাদেশকে আশ্বাস দেওয়া কারিগরি সহায়তা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সূচক	২০১২	২০১৩	২০১৪	বেজলাইন ২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
সূচক ১৭.৯.১ উন্নয়নশীল দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেওয়া অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার ডলার মূল্যমান; এ প্রতিশ্রুতিতে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমাত্রিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫৮৮.০	৭২৬.৩	৬৮০.৭	৫৭০.৮	৫৩০.৬	৩৬৭.৭২	৩৮২.৪২

সূত্র: ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচক ১৭.১০.১: বিশ্বব্যাপী ভরযুক্ত শুল্ক-গড়

বাংলাদেশে ভরযুক্ত শুল্ক-গড়ে অল্পকিছু পরিবর্তন ছাড়া ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালে মোটামুটি স্থির হার দেখা যাচ্ছে। ২০১৫ সালে এটি ছিল ৪ দশমিক ৮৫ এবং ২০১৯ সালে খানিকটা কমে ৪ দশমিক ৬৪-এ দাঁড়িয়েছে। যাহোক, ২০২০ সালের মধ্যে এ সূচক ৫ দশমিক ৫-এর লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ ওই মাইলফলক থেকে এখন তা থেকে খুব একটা দূরে নেই।

সারণি ১৭.১০: ওয়েইটেড শুল্ক-গড়

২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
৪.৮৫	৫.৭৪	৬.১৩	৫.০৮	৪.৬৪

সূত্র: বাংলাদেশ এসডিজি ট্র্যাকার, বিটিসি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (২০১৮-১৯)

সূচক ১৭.১১.১: বৈশ্বিক রপ্তানিতে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের অবদান

মোট বৈশ্বিক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ খুবই নগণ্য। বিটিসি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের (২০১৭) হিসাব অনুযায়ী, বৈশ্বিক পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ মাত্র শূন্য দশমিক ২৩ (০.২৩) শতাংশ। বৈশ্বিক পরিষেবা রপ্তানিতে এই হার মাত্র ০.০৭ শতাংশ।

সূচক ১৭.১২.১: উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত এবং ক্ষুদ্র-দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ওপর চাপানো শুল্কের গড়

দেশীয় শিল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ার সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশে আমদানি শুল্কহার কমানোর প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তিতে সদস্যপদ থাকলে তা দেশের রপ্তানিতে বিশেষ শুল্কহারের সুবিধা নিয়ে আসে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ভরহীন গড় আমদানি শুল্ক ছিল ৫৭ দশমিক ২২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ হার কমে ১৪ দশমিক ৫০ শতাংশে ঠেকে। স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত দেশের বাজারে অগ্রাধিকারমূলক শুল্কহারের সুবিধা পায়। এলডিসি ঘরানা থেকে উতরে যাওয়ার তিন বছর পর ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশ আর এসব সুবিধা পাবে না। অবশ্য বাংলাদেশ নীতিগতভাবে স্ট্যান্ডার্ড জিএসপিতে প্রবেশাধিকার পাবে। এর ফলে কিছুটা উঁচু হলেও অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা পাওয়া যাবে। জিএসপি সুবিধা নিতে চাইলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে আরও কঠোরভাবে 'রুলস অব অরিজিন' প্রতিপালন করতে হবে। এই সূচক থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমদানিকারক দেশে বাণিজ্য উদারীকরণ হলে বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জনে সক্ষম হবে।

সারণি ১৭.১১: গড় শুল্কহার

সূচক	২০১০	বেজলাইন ২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
সূচক ১৭.১২.১: উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত এবং ক্ষুদ্র-দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ওপর চাপানো শুল্কের গড়	এমএফএন: ১৪.৯৭% (ভরহীন শুল্ক গড়)	এমএফএন: : ১৪.৪৪% (ভরহীন শুল্ক গড়) অগ্রাধিকারমূলক ৩.৮৮%	এমএফএন: ১৪.৩৭% (ভরহীন শুল্ক গড়) অগ্রাধিকারমূলক ৯.৪৭%	এমএফএন: ১৪.৬১% (ভরহীন শুল্ক গড়)	এমএফএন: ১৪.৫৬% (ভরহীন শুল্ক গড়)	এমএফএন: ১৪.৬০% (ভরহীন শুল্ক গড়)

সূত্র: এনবিআর ২০২০, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সূচক ১৭.১৯.২: (ক) গত ১০ বছরে অন্তত একবার আদমশুমারি ও খানাশুমারি পরিচালনাকারী এবং (খ) শতভাগ জন্মনিবন্ধনও ৮০ শতাংশ মৃত্যুনিবন্ধন সম্পন্নকারী দেশের অনুপাত

'জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আইন, ২০০৪' কার্যকর হয় ২০০৬ সালে। ওই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রক্রিয়া টেকসই করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। সংশোধনের পর পাসপোর্ট, পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন এবং শিশুকে স্কুলে ভর্তি করানোসহ অন্যান্য কাজে নিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে জন্মনিবন্ধন তথ্য ব্যবস্থা (বিআরআইএস) ডেটাবেজে সরাসরি নিবন্ধন হচ্ছে। নিবন্ধকের কার্যালয়ের তথ্য অনুসারে, ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর পর্যন্ত বিআরআইএসে ১৬ কোটি ৪০ লাখ (১৬৪ মিলিয়ন বা জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ) মানুষের জন্মনিবন্ধন হয়েছে। বিয়ে ও তালাকের নিবন্ধন বাংলাদেশে এখনও কাগজভিত্তিক, তবে তা খুব সাধারণ। বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগ বিয়ে ও তালাকের নিবন্ধন পদ্ধতির ডিজিটালাইজেশন করছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচি এতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে।

১৭.৩ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ একটি কার্যকর বৈদেশিক সহায়তা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এইমস) বিনির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। তা বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হচ্ছে উন্নয়ন অংশীদারদের নীতি সামঞ্জস্য ও সংগতি নিশ্চিতে। সম্পদ সংহতকরণের আরও মানোন্নয়ন করা একটি চ্যালেঞ্জ। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। ভ্যাট আদায়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সংশ্লিষ্ট বিভাগে কর্মী ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার সংকট। সক্ষমতা বিনির্মাণে প্রচুর বিনিয়োগ দরকার। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অন্যতম হলো অবৈধ অর্থপ্রবাহ। এর ফলে প্রয়োজন মতো অভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া বাধার সম্মুখীন হয়।

যদিও বাজেট ব্যয় অর্থায়নের অন্যতম বহিঃস্থ উৎস ওডিএ- তথাপি জাতীয় বাজেটের আকার বিবেচনায় এর অবদান সংকুচিত হচ্ছে। অধিকন্তু উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জিত হলে তা ভবিষ্যতে কম সুদে ঋণ ও অন্য সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। প্রবাসী আয়ের উৎসে বৈচিত্র্য আনা দরকার। সম্ভাব্য অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এফডিআইয়ের ক্ষেত্রে এখনো উচ্চ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি আসেনি। বিদেশি বিনিয়োগ কম আসার পেছনে কয়েকটি কারণের মধ্যে রয়েছে–বিদ্যুৎ, গ্যাস, সম্পত্তি নিবন্ধন ও মেধাস্বত্ব অধিকারে সীমিত অভিগম্যতা। সরকারের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর দ্রুত উন্নয়ন দেশে এফডিআইয়ের অন্তঃপ্রবাহের গতি ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়নে সুশীল সমাজের অবদানের সুযোগ বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রাসঙ্গিক সংলাপের জন্য মনোযোগ দেওয়া দরকার। নিকট ভবিষ্যতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) প্রয়োজন হবে। কেননা এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ অন্য দেশের বাজারে শুল্কছাড় কিংবা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে না।

১৭.৪ সারকথা

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, এসডিজি-১৭-এর অধিকাংশ সূচক থেকে বোঝা যাচ্ছে, এগুলো চোখে পড়ার মতো সফলতা অর্জন করেছে এবং সঠিক পথেই আছে। জিডিপি অনুপাতে সরকারের রাজস্ব আনুমানিক প্রয়োজনীয় হারের চেয়েও বেশি বেড়েছে। তা বেড়েছে মূলত করদাতার সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ এবং বুদ্ধিদীপ্ত কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নেওয়ার সুবাদে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ওডিএর মোটামুটি প্রবৃদ্ধি হয়েছে; যদিও জাতীয় বাজেটে ওডিএর অবদান সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমছে। তবে এফডিআই ও প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহে বৃদ্ধি দরকার।

অন্য সূচক যেমন ইন্টারনেট প্রাপ্যতা ও ফিক্সড ব্রডব্যান্ড গ্রাহকসংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। এই সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে মূলত ফাইবার অপটিক কেব্‌ল নেটওয়ার্কের আওতা ও সক্ষমতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাড়ার কারণে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এজন্য এফডিআইসহ বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ বিনির্মাণে কৌশলগত নীতিনির্ধারণ করা দরকার। এছাড়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (এফটিএ) ও অন্য সম্ভাব্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। বাংলাদেশ এরই মধ্যে বিবিআইএন, বিসিআইএম, বিমসটেক ও এপিটিয়ের মতো কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। এছাড়া ডব্লিউটিও, ডব্লিউসিওসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উদ্যোগের সঙ্গেও জড়িত।

তবে আরও অর্থপূর্ণ অংশীদারিত্বের জন্য বাংলাদেশকে সম্ভাব্য সুবিধা আদায়ে স্বপ্ররোচিত হতে হবে। এসডিজি অর্জন ব্যাপকভাবে নির্ভর করে বহিঃস্থ সম্পদসহ সব সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বেসরকারি খাত উন্নয়নে সময়োপযোগী ও পর্যাপ্ত সহায়তা বাড়াতে হবে। এজন্য বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা শনাক্ত করে তা দূর করতে হবে। ঠেকাতে হবে কর ফাঁকি ও তা এড়ানোর প্রবণতা।

আরও ভালোভাবে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে দেশের উন্নয়ন অর্থায়ন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক অভীষ্ট নির্ধারণ এবং সরবরাহকারী, মধ্যস্থতাকারী ও উপকারভোগীর মধ্যে কৌশলগত পারস্পরিক ভূমিকা নিশ্চিত করা দরকার। আর সবচেয়ে ভালো পছন্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নিজের ক্ষমতায়ন করতে হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ

সব ধরনের বঞ্চনা ও অসমতা দূর করতে এসডিজি বাংলাদেশের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থাপন করছে। এটি সব মানুষের জীবনের মর্যাদা দেয়। অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও অবিস্মরণীয় অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রচুর দরিদ্র মানুষ ও অপুষ্টিতে ভোগা শিশু রয়েছে। এ দেশে কিছুসংখ্যক উন্নয়ন ও অবকাঠামো ঘাটতির কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এসডিজি অর্জনে গত পাঁচ বছরে কিছু অগ্রগতি রয়েছে, তবে তা দেশব্যাপী সমানভাবে নয়। এমডিজির অসম্পূর্ণ এজেন্ডা অব্যাহত রাখা এবং এর ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হলো এসডিজি। সুনির্দিষ্টভাবে নানা বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সমাধান করেছে এসডিজি। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পায়ন, অসমতা, শান্তি ও ন্যায়বিচার, বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা এবং বাস্তবায়নে মানোন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অধীনে সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (ক) নতুন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্ব রেখে মন্ত্রণালয়গুলো এসডিজি বাস্তবায়ণ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। (খ) সূচকের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের হালনাগাদ পরিবীক্ষণকাজে সহায়তার জন্য এসডিজি ট্র্যাকার সূচনা করা হয়েছে। (গ) আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণে এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়ন কৌশল চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ কৌশলে বলা হচ্ছে, অতিরিক্ত ৯২৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছরের মধ্যে। (ঘ) এসডিজি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার বিষয়ে প্রথম জাতীয় সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। এতে সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন অংশীদাররা অংশ নেন। (ঙ) উপাত্ত সৃষ্টিতে সংগতি আনতে জাতীয় তথ্য সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। (চ) সরকার এবং বাংলাদেশে কার্যরত জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। (ছ) এসডিজি স্থানীয়করণে ৪০ (৩৯+১) অগ্রাধিকার সূচকের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের ৩৯টি সূচক (১১টি জাতীয় সূচক) খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অন্য সূচকের ওপর এগুলোর শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত একটি স্থানীয় সূচক রয়েছে, যা (+১) 'কাউকে পেছনে ফেলে নয় (এলএনওবি)' এজেন্ডার প্রতিফলন ঘটাবে।

এসডিজি অগ্রগতিতে দেখা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের নিচে মৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যু কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। তামাকের ব্যবহারের ব্যাপকতা ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে সাফল্য সঠিক পথে আছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের হারও আছে সঠিক পথে। সামাজিক নিরাপত্তায় সরকারের প্রতিশ্রুতি, এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ও আওতা দুটোই সম্প্রসারণ করার কাজ এখন দৃশ্যমান। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি এবং জিডিপির অনুপাত হিসেবে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার এরই মধ্যে ২০২০ সালের নির্ধারিত লক্ষ্য অতিক্রম করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করার অঙ্গীকার রয়েছে, যার অংশ হিসেবে ৯৬ শতাংশ মানুষের জন্য এ সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। নারী ও শিশু সমাজের সবচেয়ে দুর্বল বিবেচনায় তাদের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা সুরক্ষার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এসডিজির মৌলিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের জন্য বেশ কিছু কৌশলগত নীতি অগ্রাধিকারে গুরুত্বারোপ করে:

- **টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধা মোকাবিলা**

বাংলাদেশে উন্নয়নের মৌলিক চ্যালেঞ্জ হলো খাদ্য নিরাপত্তা এবং চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। এ দেশে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা ও উৎপাদনশীলতায় গবেষণা-উন্নয়ন কাজের আওতা বাড়ানো দরকার। কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবারের আয় বাড়বে। কৃষি উৎপাদন বাড়ানো গেলে তা অনেক মানুষকে দারিদ্র্য থেকে টেনে তুলবে এবং বাড়তি কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

- **ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক রূপান্তর ও টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

দারিদ্র্য লাঘব ও এসডিজির অন্য অভীষ্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয়করণের মধ্যে রয়েছে শিল্পায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, যার মধ্যে উৎপাদনশীল চাকরি সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ এরই মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তবে এ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত চাকরি সৃষ্টি করা আবশ্যক। কেননা দেশের ৮৫ শতাংশ কর্মশক্তি অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভরতা থেকে সেবা খাতের দিকে ধাবমান হয়েছে,

তবে শিল্প খাত ও এর চাকরি তৈরির সক্ষমতাকে অনেকটা পাশ কাটিয়ে গেছে। বাংলাদেশে শিল্পমুখী কাঠামোগত রূপান্তর আরও অনেক উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে। একটি সুসমন্বিত টেকসই শিল্পায়ন কৌশল বিভিন্ন দেশের স্পিল ওভার প্রভাবকে কাজে লাগাতে পারে। এর ফলে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইনের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দেশের উৎপাদনশীলতার সক্ষমতা সৃষ্টি করা যাবে।

- **সবার জন্য মৌলিক সেবা সরবরাহ ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা**

পরিবহন অবকাঠামো, সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও জ্বালানির মতো মৌলিক অবকাঠামোর ঘাটতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য। অবকাঠামোর আরও বেশি প্রাপ্যতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে মাথাপিছু আয় বাড়াবে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে।

- **সর্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগানো**

বাংলাদেশের জনসংখ্যাগত সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবায় ও গুণগত শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং সবার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা হলে তা বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর থেকে জনমিতিক লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে। এই বিনিয়োগ বিশ্বমানের কর্মদক্ষতার ঘাটতি পূরণে দেশকে সাহায্য করবে। এজন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- **সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি সরবরাহ করা**

দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা দূরীকরণের উদ্যোগগুলো গতিশীল করার জন্য কার্যকর বিনিয়োগ মাধ্যম হলো সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। গত কয়েক দশকে যে সামাজিক সুরক্ষা মডেল চলে আসছে, সেগুলোর আওতা বাড়াতে হবে বাংলাদেশকে। এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেই মডেলগুলোও, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল আয়বর্ধনে সহায়তা, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং শর্তসাপেক্ষে নগদ স্থানান্তর। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রসার বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারের নতুন উদ্ভাবন কাজে লাগানো আবশ্যক। এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইলে অর্থনৈতিক পরিষেবার মতো উদ্ভাবন কাজে খাটিয়ে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বাড়াতে হবে।

- **জেন্ডার সমতা ও নারী উদ্যোক্তার প্রসার**

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জিত হওয়ার পরও বাংলাদেশ নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং বিভিন্ন মাত্রার জেন্ডার সমতা অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তার প্রসার ঘটাতে হবে। এতে আরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ওয়ান-স্টপ সেবা কেন্দ্র, নারীদের জন্য বিশেষায়িত ঋণ কর্মসূচি এবং সামর্থ্য বিনির্মাণ ও ভালো অনুশীলন অবলম্বন।

- **কম কার্বন নিঃসরণকারী ও জলবায়ু-অভিঘাতসহনশীল উপায়সমূহ অবলম্বন**

উন্নয়নে শূন্যতা পূরণ এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রসারে বাংলাদেশে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পানির গুণগত মান ও লভ্যতা-সম্পর্কিত পরিবেশগত অবনমন বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকিতে বাংলাদেশ ভঙ্গুর একটি দেশ। জ্বালানিতে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং বায়ুদূষণ কমাতে উদ্যোগ নেওয়া হলে তা সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হবে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পানি, সৌরশক্তি ও বাতাসের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের ব্যাপক ব্যবহার। পরিচ্ছন্ন গ্যাসভিত্তিক জ্বালানির দিকে অগ্রসর হতে হবে। এছাড়া গতানুগতিক ধারায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিঃসরণ কমিয়ে নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও দূষণ সৃষ্টির সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শিল্প খাতকে তা কমিয়ে আনতে হবে। এজন্য অবলম্বন করতে হবে জ্বালানি কার্যকারিতা, পুনর্ব্যবহার এবং কোজেনারেশন; যা ক্রমবর্ধমানভাবে কার্যকর হয়ে উঠছে। টেকসই বা পরিমিত ভোগের অংশ হিসাবে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। এতে টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শহুরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি বাংলাদেশকে কম টেকসই প্রযুক্তি এবং নগরের প্রচলিত ধারা এড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এর সুবাদে সবুজ পরিবহন ব্যবস্থা, আরও অভিঘাতসহিষ্ণু ভবন ও অবকাঠামো-সংবলিত 'স্মার্ট সিটি' নির্মাণ আনুকূল্যে আসবে। দুর্যোগ-ভঙ্গুর হওয়ায় বাংলাদেশের উন্নয়নের মূলধারায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঝুঁকির বিষয়টি রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

এসডিজি অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

এসডিজির কার্যকর বাস্তবায়নে বহুমাত্রিক টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ফলাফলমুখী কৌশল নেওয়া দরকার। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (এলজিআই) ক্ষমতায়নের জন্য কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। এছাড়া রীতিনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, বাজার ও ধ্যানধারণায় কাঠামোগত সংস্কার দরকার। এসডিজি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের সব পর্যায়ে সব সংশ্লিষ্টজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সব পর্যায়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের দরকার ২০৩০ সালের এজেন্ডা বাস্তবায়নের উপায়ে প্রণিধানযোগ্য সহায়তা ও সমর্থন। বাস্তবায়নের উপায়সমূহ বেশকিছু অভীষ্টের পাশাপাশি এবং এসডিজি-১৭ তেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো আওতাভুক্ত হয়েছে 'উন্নয়ন অর্থায়নে আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডায় (এএএএ)'। এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অর্থায়ন, প্রযুক্তি, সক্ষমতা বিনির্মাণ, বাণিজ্য, নীতি উপলব্ধি, তথ্য ও পরিবীক্ষণ এবং বহু সংশ্লিষ্ট জনের অংশীদারিত্ব।

অর্থায়ন: এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের সামাজিক ও অবকাঠামো বিনিয়োগসহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সংগতি প্রয়োজন হবে। পরিবেশগত স্থিতিশীলতা প্রসারেও বিনিয়োগ দরকার পড়বে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নানা ধরনের সামাজিক বিনিয়োগ নিশ্চিতে জিডিপির ২০ শতাংশ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকবে। সামাজিক বিনিয়োগ বলতে বোঝায় সবার জন্য কর্মসংস্থান, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আয় নিরাপত্তা এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জ্বালানিশক্তি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম। বাংলাদেশে করের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ব্যবস্থা সংস্কার, কর প্রশাসন জোরালোকরণ ও উদ্ভাবনী কর ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশে এসডিজির অগ্রাধিকারগুলোর সঙ্গে জড়িত উদ্ভাবনী করের উদাহরণগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে 'সবুজ ভ্রমণ' কর এবং 'করের ওপর কর' বা সেস। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতে আয়করের ওপর শিক্ষা কর আরোপ করা হয়েছে, যা দেশটিতে সবর্জনীন শিক্ষা ক্যাম্পেইনে তহবিল জোগায়। জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নে সহায়তার জন্য জ্বালানির ওপর আরোপিত কর। এছাড়া স্যানিটেশন প্রচারাভিযানে অর্থায়নের জন্য পরিষেবা করের ওপর একটি কর আরোপ করা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) সরকারি বিনিয়োগের সম্পূরক হতে পারে। বাংলাদেশ এরই মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে উন্নয়ন উৎসাহিত করতে নীতিমালা কার্যকর করেছে। এজন্য ২০১০ সালে পিপিপি কৌশল ও নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। সরকারি সংস্থানের সম্পূরক হিসেবে বাংলাদেশ সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির সম্ভাবনা কাজে লাগাচ্ছে।

ওডিএর প্রচলিত প্রবাহ বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশের উন্নয়ন চাহিদা সংস্থানের সম্পূরক হতে পারে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা। বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থায়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন মেটাতে আঞ্চলিক সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থায়নের প্রয়োজন মেটাতে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে। এএএএ ও ২০৩০ এজেন্ডার অধীনে উন্নত দেশগুলোকে তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ সমতুল্য অর্থ ওডিএ হিসেবে দিতে হয়। এর ০.২ শতাংশ স্বল্পোন্নত দেশের সহায়তায় বরাদ্দ রাখা হয়। উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন মেটাতে সবুজ জলবায়ু তহবিলের (জিইএফ) মাধ্যমে ২০২০ সাল নাগাদ উন্নত দেশগুলোর প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার কথা রয়েছে। কপ ২১ সম্মেলনও এই আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দেশে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে জিইএফ তহবিল অর্থায়ন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ওডিএর গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সাউথ সাউথ কো-অপারেশন। উন্নয়ন কর্মসূচি তহবিল জোগানে এটি ক্রমাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠছে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশ ও অঞ্চলগুলোর মাঝে সেরা অনুশীলন বিনিময়ের জন্য নতুন সুযোগ দিচ্ছে।

প্রযুক্তি: এলডিসিভুক্ত দেশের জন্য বৈশ্বিক প্রযুক্তি সহজীকরণ কৌশল ও একটি প্রযুক্তি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের বিনিয়োগ কম। দেশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের (এসটিআই) অন্যান্য খাতেও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এসব বিষয় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুফল নেওয়ার ক্ষমতা নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে জ্বালানি উৎপাদন ও তা ব্যবহারে পরিবেশগত নিরাপদ প্রযুক্তিতে অধিগম্যতা থাকা দরকার।

বাংলাদেশ সব এসটিআই সূচকে পিছিয়ে। মাথাপিছু গবেষণা উন্নয়ন ব্যয়, প্রতি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে গবেষণায় মানবসম্পদ, প্রযুক্তি, গ্রহণ ও প্রদান, এবং মেধাস্বত্ব (পেটেন্ট) নিবন্ধন প্রভৃতি বিষয় এ সূচকের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের দরকার এসটিআই নীতিমালা পুনরায় পর্যালোচনা করা ও তা শক্তিশালী করা। এর ফলে যেন সংশ্লিষ্টদের বাস্তুতন্ত্র বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়া

যায়। এ উদ্যোগ টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও চর্চা তৈরি এবং তা অবলম্বন করার জন্য সহায়ক হয়। একটি সহযোগিতাপরায়ণ আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের জন্য উপকারী হতে পারে নানা খাতে, যেমন কৃষি ও খাদ্যসংক্রান্ত গবেষণা-উন্নয়ন এবং সেরা কৃষি অনুশীলন (জিএপি) বিনিময়ে এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা ও জমির ব্যবহার উন্নয়নে কৃষিজ বৈচিত্র্য ও জার্মপ্লাজম নিয়ে। আঞ্চলিক সহযোগিতা বিচিত্র খাতে উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করবে। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) থেকে শুরু করে বীজ উৎপাদন কিংবা গবাদিপশু পালন থেকে রোগবালাই দমনসহ নানা বিষয়ে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়। একই সময়ে রূপান্তরশীল উন্নয়নের নীতিমালায় দক্ষতা সৃষ্টি এবং গবেষণা-উন্নয়নে বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এটি দরকার কাঠামোগত রূপান্তরের বিকাশের জন্য বিশেষ করে আরও কার্যকর ও কম সম্পদের ওপর নির্ভরশীল শিল্প প্রসারের জন্য।

বাংলাদেশ সাশ্রয়ী পণ্য ও সুলভ প্রসেস সৃষ্টিতে দারুণ সম্ভাবনা দেখিয়েছে। মিতব্যয়ী প্রকৌশল সক্ষমতার মাধ্যমে বাংলাদেশ জীবনরক্ষাকারী স্বল্পমূল্যের খাবার স্যালাইন ও পানি পরিশোধন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এই সক্ষমতা কাজে আসতে পারে কম কার্বন (সিওটু) নিঃসরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদে কম চাপ প্রয়োগ করার উপায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। এটি বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আরও কম মূল্যের পণ্য ও সেবা তৈরির দিকে এগিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের মিতব্যয়ী উদ্ভাবন প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইউটিলিটি মডেল অথবা 'পেটি পেটেন্ট' অবলম্বন করতে পারে। এটি চলমান উদ্ভাবনের জন্য কিছু সময় সুরক্ষা দিতে পারে। এছাড়া ট্রিপস চুক্তির আওতায় যেসব নমনীয়তা রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে দেশীয় উদ্ভবন প্রসার করা যেতে পারে।

তথ্য ও পরিবীক্ষণ: এসডিজি অর্জনের অগ্রগতি সঠিকভাবে নখদর্পণে রাখার পদ্ধতি অবলম্বন করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন এসডিজি বিষয়ে নিয়মিত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও গুণগত মানসম্পন্ন আলাদা আলাদা তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশটি বেশকিছু সমস্যা মোকাবিলা করে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরালো করা যেতে পারে, বিশেষ করে পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা উন্নয়নে। একটি সর্বজনীন মান ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিত উন্নয়ন এবং এসডিজির অগ্রগতিতে নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।

নীতি **সংগতি:** এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরে এসেছে প্রথাগত (সাইলো-লাইক) কৌশল/দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যা প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা অবলম্বন করেছিল। সেই কৌশল/দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বহুপক্ষীয় ও আলাদা আলাদা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি (ক্রসকাটিং অ্যাপ্রোচ) এক জায়গায় করার। এতে চেষ্টা ছিল মন্ত্রণালয় বা সংস্থাগুলোকে নেতৃত্বদানকারী, সহনেতৃত্ব ও সহযোগী সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা, যাতে বহু খাতের মধ্যে সমন্বয় এনে কাজে লাগানো যায়। এ কৌশল জোর দেয় ফলাফলমুখী কাজে, ভারসাম্য (ট্রেড অফ) বজায়ে ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে থাকা সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় (সিনার্জি) কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে।

সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে এলজিআইগুলোর যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল থাকার ওপর। আরও গুরুত্ব দিচ্ছে কর্তৃত্ব, সক্ষমতা ও সম্পদ সংহত করার বিনিয়োগ পরিকল্পনায়। এই প্রচেষ্টার আরও লক্ষ্য এলজিআই ও জাতীয় সরকারের মধ্যে মজবুত উলম্ব (ভার্টিক্যাল) সমন্বয় উন্নয়ন করা। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজির বিভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের সম্পর্কিত বিভিন্ন এলজিআইয়ের মধ্যে অনুভূমিক (হরাইজন্টাল) সমন্বয় তৈরি করা। পরিকল্পনা করা হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টজনদের কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনার।

সামাজিক উন্নয়নে দ্রুত অগ্রগতির জন্য অসংখ্য বিষয়ে পরিবর্তন দরকার। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক অনুশীলন জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসম্পর্কিত আইন ও নিয়মনীতি এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন ধারার প্রসারের জন্য প্রণোদনা ও নিয়মনীতি।

বহু-সংশ্লিষ্টজনের অংশীদারিত্ব: এসডিজি কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এসডিজি নকশা প্রণয়ন ও স্থানীয়করণের সময় বাংলাদেশ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অবলম্বন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এটি প্রযোজ্য হবে পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের সময়ও। পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্রদের মতো জনগোষ্ঠীর জন্য প্রবেশাধিকার তৈরি ও অন্য সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া সরকারি সেবার বিধানে কার্যকর পরিবীক্ষণ-সহায়ক হয়। সম্পর্কিত সব সংশ্লিষ্টজন, যেমন উপকারভোগী, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচলন শুরু করেছে বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ রেখে এসডিজি লক্ষ্যগুলোর পর্যালোচনার কিছু ক্ষেত্র নির্ধারণ করে চিহ্নিত করেছে, যেখানে উন্নয়ন সহযোগীরা সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র শনাক্ত ও এসডিজি লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করতে পারে (জিইডি ২০১৯)। যাহোক, আরও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণে বাংলাদেশকেও কিছু চ্যালেঞ্জ উতরাতে হবে। প্রথমত, এসডিজি লক্ষ্যগুলোর অগ্রগতি পরিবীক্ষণে সূচকগুলোর তথ্যে ঘাটতি থাকা, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সুরক্ষা (এসডিজি ১), স্বাস্থ্য (এসডিজি ৩) এবং শিক্ষার (এসডিজি ৪) মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে অভ্যন্তরীণ ব্যয় অপর্যাপ্ত। তৃতীয়ত, দাতাদের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের শোষণ ক্ষমতার (অ্যাবসর্পটিভ ক্যাপাসিটি) কারণে অর্থ ছাড় বাধাগ্রস্ত হয়। চতুর্থত, নির্বাহী সংস্থাগুলোর পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই এবং উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ:

- কর ব্যবস্থা সংস্কার এবং রাজস্ব আদায় বিকেন্দ্রীকরণ করা অপরিহার্য। কর প্রশাসনে পরিবর্তন আনয়ন উন্নয়নে কী প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণে উন্নয়ন সহযোগীরা কারিগরি সহায়তা দিয়ে অবদান রাখতে পারে। হার ও ব্যাপ্তি কমানোর মধ্য দিয়ে কর ও শুল্ক পুনর্গঠন এবং বেশ কিছু কর অব্যাহতি-সুবিধা স্থগিত করা হলে তা বাংলাদেশে সন্তোষজনক পর্যায়ে কর-জিডিপি অনুপাত অর্জনে সহায়ক হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কিছু কর আদায়ের অনুমোদনের মাধ্যমে রাজস্বব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়। রাজস্ব প্রশাসনে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা গেলে, তা বাংলাদেশের রাজস্ব সম্ভাবনা লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক হবে।
- ব্যয় কর্মসূচিগুলো মূলধারায় আনা দরকার। অর্থের যথার্থ উপযোগ পেতে ব্যয় কর্মসূচিগুলোর ফলপ্রসূ মানোন্নয়ন করা জরুরি।
- ওডিএর জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বিনির্মাণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার। উন্নয়ন অংশীদাদের স্থানীয় দপ্তরগুলোকে আরও বেশি অধিকার দেওয়া দরকার, যেন আহরণ ও অর্থছাড়ের সমস্যা দূর হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন গতিশীল হয়। এ প্রক্রিয়ায় দাতা-প্রকল্প প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা।
- এফডিআইয়ের ক্ষেত্রে নিয়মনীতিতে পরিবর্তন আনা দরকার বিশেষ করে বৈদেশিক লেনদেনের আইনকানুনে। দেশের বিনিয়োগ খাতে সম্ভাবনার বিষয়ে বাংলাদেশকে আরও তথ্য ছড়িয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে সহজে বিশ্বব্যাংকের সহজে ব্যবসাকরণ সূচকে দেশের মানোন্নয়ন হতে পারে উন্নতির প্রথম ধাপ। স্বচ্ছ ক্রয় (প্রক্রিউরমেন্ট) আরেকটি ক্ষেত্র যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণে বিশ্বস্ত বা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও করপোরেট সংস্থায় আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষা ও হিসাববিজ্ঞান চালু করা হলে তাতে বিপুল পরিমাণে এফডিআই প্রবাহ বাড়তে পারে।
- বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর বাণিজ্যিক লক্ষ্য এসডিজির সঙ্গে একই সূত্রে নির্ধারণ করাও জরুরি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারি খাত প্রায়োগিক কৌশল ও নির্দেশনা সৃষ্টিতে নানাভাবে অবদান রাখছে। এগুলো বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মকাণ্ডে এসডিজি অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করে। বাংলাদেশেও তা অবলম্বন করা যেতে পারে। এছাড়া একটি আকর্ষণীয় সিএসআর (সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি) ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে 'ইউএন কম্প্যাক্ট'-এর অধীনে প্রণয়ন করা নির্দেশাবলি কাজে লাগানো যেতে পারে। টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশের সাফল্যের রেকর্ড রয়েছে। এ বাজার আরও উদারীকরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা আরও সম্প্রসারণ করা উচিত। এর অংশ হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবসায়িক মডেল উপস্থাপন করতে হবে।
- পিপিপির ক্ষেত্রে কাঠামোর আরও উদারীকরণ করতে হবে। পিপিপি দপ্তরের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা বাড়াতে বেসরকারি বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। প্যানেলে থাকবে বিভিন্ন অবকাঠামো প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী অর্থায়ন কৌশল ও আইনি বিশেষজ্ঞ। বেশি বাণিজ্যিক সম্ভাবনার প্রকল্পগুলো দাতা বা সরকারি বাজেটের অর্থায়নের জন্য না রেখে বেসরকারি খাতে বাস্তবায়নের জন্য আলাদা করে রাখা উচিত।
- প্রবাসী আয় পরিস্থিতি উন্নয়নে অভিবাসীদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়াতে উত্তম চর্চা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রবাসী আয়ের প্রবাহ সম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে, তবুও হুন্ডির প্রচলন আছে। বিদেশি শ্রমিকরা বিনিময় হারের পার্থক্যজনিত সুবিধা ও কর এড়ানোর জন্য হুন্ডি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে কর কর্মকর্তাদের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এবং হয়রানি কমাতে হবে। তাহলে বিদেশি শ্রমিকরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেল অগ্রাধিকার দিয়ে প্রবাসী আয় পাঠাতে আগ্রহী হবে।

- ঋণ স্থিতিশীলতার জন্য, উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশে ঋণসেবা পরিবীক্ষণ করা দরকার। এটা এজন্য দরকার যে বাংলাদেশ এখন রেয়াতি অর্থায়ন থেকে আরও বেশি বাণিজ্যিক ঘরানার অর্থায়ন পাচ্ছে, যাতে আরও বেশি ঋণ পরিশোধের দায়বদ্ধতা (লায়াবিলিটি) রয়েছে। এই সহায়তা প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য পদ্ধতিগত ধাক্কা এড়াতে সহায়তা করবে।
- দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা আরও বৃহৎ পর্যায়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন কর্ম সম্পাদন (পারফরম্যান্স) মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স বেঞ্চমার্ক অবলম্বন করা। এ গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সূত্রের জন্য সাধারণ রেফারেন্স সূচক এবং একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার। একটি পদ্ধতিগত উপায়ে তথ্য অনুসরণ করা হলে তা সরকারি সংস্থাগুলোকে বিভিন্ন সহযোগিতার ব্যাপ্তি বুঝতে এবং আরও সম্পৃক্ত করতে সুযোগ দেবে। ফলপ্রসূ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের জন্য অন্য দেশগুলোর একই ধরনের সহযোগিতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। নানা অনভিপ্রেত বিপদ, যেমন ঋণের ফাঁদ থেকে রক্ষা পেতে তা সহায়ক হবে।
- প্রযুক্তির জন্য সরকারের একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, যা আইসিটি বিভাগ প্রতিপালন করবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে নিরাপদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যেসব চাকরি প্রয়োজনীয়তা হারায়, তা মোকাবিলায় শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা বাংলাদেশের জন্য খুবই অপরিহার্য একটি বিষয়।
- বাণিজ্য বিষয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার এলডিসি থেকে উত্তরণশীল ও অন্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে জোট গঠন করে বিভিন্ন খাত নিয়ে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় সম্পৃক্ত থাকা। এজন্য দরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের (এমওসি) সক্ষমতা বিনির্মাণে এ সহায়তা কাজে লাগানো যেতে পারে। বৈশ্বিক রপ্তানিতে হিস্যা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বাইরেও বৈচিত্র্য বাড়ানো দরকার। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে রপ্তানি গন্তব্য সম্প্রসারণ করতে হবে। বাণিজ্যে শুল্ক সমন্বয় ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানোর কৌশল অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ধরনের চুক্তি করার সময় দ্বিপক্ষীয় অথবা আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্যে 'স্প্যাগেটি-বোল' প্রভাবের কথা মাথায় রাখা উচিত। 'স্প্যাগেটি বোল' প্রভাব বলতে বোঝায় অসংখ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে সৃষ্ট জটিলতার কুফল।
- পদ্ধতিগত বিষয়ের জন্য বাংলাদেশের এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোয় সুশীল সমাজ সংস্থা (সিএসও) ও এনজিওদের স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। 'নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়' ও 'সহযোগী মন্ত্রণালয়ের' পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে 'সহযোগী অংশীদার' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। 'সহযোগী অংশীদার'-এর অধীনে এসডিজির নির্দিষ্ট কিছু অভীষ্টে বিশেষায়িত সুশীল সমাজ/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/শীর্ষ পর্যায়ের এনজিওদের বিবেচনা করা যেতে পারে।
- সামগ্রিক এসডিজি প্রচেষ্টাসমূহের পরিপূরক হিসেবে (বিশেষত) বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সামাজিক যোগাযোগের স্থানীয়করণ দরকার। সম্প্রদায়িক পর্যায়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও নেটওয়ার্ক তৈরি করতে এ স্থানীয়করণ প্রচেষ্টা সহায়তা করবে, যা এসডিজি অর্জনে সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে সামনে এগিয়ে নিতে কাজে আসবে। এনজিও, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ও অন্য পেশাজীবী সংগঠন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামাজিক ও মানব মূলধন সৃষ্টি এবং নেটওয়ার্ক বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সংক্ষেপে এই প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে জাতীয় সমন্বয়কারী সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ অন্যান্য বিষয়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ফলাফলভিত্তিক কৌশল অবলম্বন, এলজিআইগুলোর ক্ষমতায়ন এবং সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ। বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে এ বিষয়গুলো কার্যকরভাবে সম্পাদন করা আবশ্যক। বাস্তবায়নের উপায়সমূহে বাংলাদেশের অভিগম্যতা ও বেশ কিছু খাতে সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ করা দরকার। বাংলাদেশের সক্ষমতা ঘাটতি রয়েছে অর্থায়নে, প্রযুক্তিতে, বাণিজ্যে, তথ্যে, পরিবীক্ষণে ও স্বচ্ছতায়। বর্ধিত আর্থিক সংস্থান জোগান দিতে হবে করভিত্তি সম্প্রসারণ, করসংস্কার ও কর-উদ্ভাবনী কাজের মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি পিপিপি ও বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক সহযোগিতার সুবিধা আদায় করতে হবে। এগুলো ওডিএ প্রবাহ ও সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন দ্বারা পরিপূরক। বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের সমাধান সক্রিয় করতে এসব সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি সহজীকরণ কৌশল গুরুত্বপূর্ণ হবে। বাংলাদেশের সীমিত প্রকৌশল সক্ষমতার সমাধানের জন্য এটা দরকার। এই সহযোগিতা পরিসংখ্যানগত সক্ষমতার ঘাটতি কমিয়ে আনতেও সহায়ক হতে পারে।

বাংলাদেশের এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০ প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে দেশের অগ্রগতি অনুসরণের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়। এই এজেন্ডার ভেতরে রয়েছে এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ, যা আসলে টেকসই উন্নয়নের সকল মাত্রা এবং এর বিশ্বজনীন ও সমন্বিত বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা বহন করে। এটা মূলত স্বতন্ত্র ও জ্ঞানভিত্তিক। এতে বিশেষত আলোকপাত করা হয়েছে সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে যারা হয়েছে, তাদের ওপর।

তথ্যপঞ্জি

Ahmed, S. (2017). 'Urbanization and Development', in Ahmed, S, Evidence Based Policy Making in Bangladesh, Chapter 8, Policy Research Institute, Dhaka.

Ahsan, M. M., N. Aziz and H.M. Morshed (2016). Assessment of Management Effectiveness of Protected Areas of Bangladesh, SRCWP Project, Bangladesh Forest Department, Dhaka.

MoPME, (2018). Annual Primary School Census. Ministry of Primary and Mass Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BANBEIS, (2018). Bangladesh Education Statistics 2018, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS (2016). Report on Violence against Women (VAW) Survey 2015, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS (2017). Quarterly Labour Force Survey 2015-16, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS (2018), Labour Force Survey of 2016-17, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS and UNICEF (2019). Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2019, Progotir Pathey: Final Report, Bangladesh Bureau of Statistics and United Nations Children Fund, Dhaka.

BBS, (2015). Bangladesh Disaster Related Statistics 2015 Climate Change and Natural Disaster Perspectives, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS, (2015). Impact of Climate Change on Human Life (ICCHL) Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS, (2016). Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2016, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

BBS, (2018). Bangladesh Sample Vital Statistics 2018, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Bangladesh Economic Review (BER), (2019). Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Chowdhury, M. S. M. (2015). National framework for establishing and managing marine protected areas (MPAs) in Bangladesh. IUCN, International Union for Conservation of Nature in collaboration with BOBLME, Phuket, Thailand.

Credit Suisse (2016). Global Wealth Report 2016, Credit Suisse Research Institute, Geneva.

DOE (2015). Biodiversity National Assessment 2015: Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity, Department of Environment, Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

DoE (2019). Source of Air Pollution in Bangladesh—Brick Kiln and Vehicle Emission Scenario. Department of Environment.

ECOSOC (2019). Special Edition: Progress towards the Sustainable Development Goals, Report of the Secretary-General, Economic and Social Council, United Nations, New York.

ESCAP (2019). Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019, UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Bangkok.

FAO, (2019). The State of Food Security and Nutrition in the World. http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf

GED (2015). 7th Five Year Plan 2016-2020, General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh. Dhaka.

GED (2019), Prospects and Opportunities of International Cooperation in Attaining SDG Targets in Bangladesh, General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

GED, (2018). Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2018. Planning Commission. Ministry of Planning, Government of Bangladesh, Dhaka

GED, (2017). SDG Financing Strategy: Bangladesh Perspective. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka

GED, (2019). Bangladesh Moving Ahead with SDGs, Prepared for Bangladesh Delegation to 74th UNGA Session 2019. General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka.

Gomis, R., S. Kapsos and S. Kuhn (2020). World Employment and Social Outlook: Trends 2020, International Labour Office, Geneva.

Haque, Syed E., A. Tsutsumi, and A. Capon. 2014. Sick Cities: A Scenario for Dhaka City. International Institute of Global Health, UN University (http://ourworld.unu.edu/en/sickcities-a-scenario-for-dhaka-city).

Hydrocarbon Unit of Energy and Mineral Resource Division, (2019). http://www.hcu.org.bd/

ILO (2013). Bangladesh National Child Labour Survey 2013, International Labour Office, Dhaka.

ILO (2017). Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016, International Labour Office, Geneva.

IMF (2018). Financial Access Survey, International Monetary Fund, Washington DC

IOM (2018), Mapping of Labour Migration Recruitment Practices in Bangladesh, International Organisation for Migration, Madrid. IOM website (https://www.iom.int/global-compact-migration).

IUCN Bangladesh. (2015). Community Based Ecosystem Conservation and Adaptation in Ecologically Critical Areas of Bangladesh: Responding to Nature and Changing Climate. IUCN Bangladesh.https://www.researchgate.net/publication/304630300_Community_Based_Ecosystem_Conservation_and_Adaptation_in_Ecologically_Critical_Areas_of_Bangladesh_Responding_to_Nature_and_Changing_Climate/figures?lo=1

IUCN. (2015). Red List of Bangladesh: Volume 1 : summary: Vol. Red List of Bangladesh. International Union for Conservation of Nature. https://www.iucn.org/content/red-list-bangladesh-volume-1-summary

ACER, (2016). Learning Assessment of Secondary Schools 2015. Australian Council for Educational Research, for Monitoring and Evaluation Wing, Directorate of Secondary and Higher Education, Ministry of Education, Government of Bangladesh, Dhaka.

NIPORT, (2014). Bangladesh Demographic and Health Survey 2014: Key Indicators, National Institute of Population Research and Training, Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

NIPORT, (2018). Bangladesh Demographic and Health Survey 2017-18: Key Indicators, National Institute of Population Research and Training, Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

OECD, (2016). Improving the Evidence Base on the Costs of Disasters: Key Findings from an OECD Survey, organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.

OPHI, (2011). Global MPI Country Briefing 2011: Bangladesh (South Asia), Oxford Poverty and Human Development Initiative, Department for International Development and University of Oxford, London and Oxford.

OPHI, (2018). Global MPI Country Briefing 2018: Bangladesh (South Asia), Oxford Poverty and Human Development Initiative, Department for International Development and University of Oxford, London and Oxford.

PC (2017). SDGs Needs Assessment and Financing Strategy: Bangladesh Perspective, General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Power Division, 2016. Power System Master Plan, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka.

Siddiqui, T (2010). Recruitment Cost in Bangladesh: Challenges of Governing Migration in the Countries of Origin, Working Paper Series No. 25, Refugee and Migratory Movements Research Unit, Dhaka.

UNECOSOC (2019). SDG Progress Report, . https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2019/secretary-general-sdg-report-2019--EN.pdf

UNESCAP. (2020). SD Data Explorer. SDG Gateway - Asia Pacific. https://dataexplorer.unescap.org/

UNICEF-WHO (2015). Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment, United Nations Children Fund and World Health Organisation, New York and Geneva.

UNJMP (2017). WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation, United Nations Joint Monitoring Programme, New York and Geneva.

UNSTATS: SDG Indicators https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

WEF (2020). Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum, Geneva.

WHO, (2017). Human Resources for Health: Country Profile Bangladesh. World Health Organisation, Dhaka.

WHO, (2019). Bangladesh Health SDG Profile, World Health Organisation, Dhaka.

WHO, (2019). Global Tuberculosis Report, World Health Organisation, Geneva

World Bank (2014). World Development Indicators 2014, World Bank, Washington DC.World Bank, website (https://remittanceprices.worldbank.org).

World Bank. (2017). SDG Atlas 2017. Data | World Bank.http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/SDG-01-no-poverty.html

সংযুক্তি : সমন্বিত সারণি

সংযুক্তি: সমন্বিত সারণি এসডিজি সূচক সমূহের ভিত্তিসীমার নিরিখে ২০২০ সাল পর্যন্ত হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
অভীষ্ট ১. সব জায়গা থেকে সব ধরনের দারিদ্র্য দূর করা			
১.১.১ জেন্ডার, বয়স, কর্মসংস্থান এবং ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত (শহুরে/গ্রামীণ)	১৪.৭৭%(বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)	৯.৩০%	১৪.৭৭% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)
১.২.১ জেন্ডার এবং বয়স অনুসারে জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত	ইউপিএল: ২৪.৩% এলপিএল: ১২.৯% (হায়েস, ২০১৬, বিবিএস)	ইউপিএল: ১৮.৬% এলপিএল: ৮.৯%	ইউপিএল: ২০.৫% এলপিএল: ১০.৫% (হায়েস প্রাক্কলন ২০১৯, বিবিএস)
১.২.২ জাতীয় সংজ্ঞা অনুসারে সব মাত্রার দারিদ্র্যে বসবাসকারী সব বয়সের পুরুষ, নারী ও শিশুদের অনুপাত	এমপিআই: ০.১৮ এইচসি: ৩৭.৫১ তীব্রতা: ৪৬.৮৪ (বিবিএস, ২০১৯)	-	এমপিআই: ০.১৮ এইচসি: ৩৭.৫১ তীব্রতা: ৪৬.৮৪ (বিবিএস, ২০১৯)
১.৩.১ সামাজিক সুরক্ষা ভিত/পদ্ধতির আওতায় আসা শিশু, বেকার, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মরত অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং দরিদ্র ও দুর্বল জনসংখ্যার অনুপাত	২৮.৭% (কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা) (হায়েস, ২০১৬)	৩০%	৫৮.১% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
১.৪.১ মৌলিক পরিষেবায় প্রবেশাধিকার পাওয়া খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত	স্যানিটেশন: ৫৫.৯% স্বাস্থ্যবিধি: ৫৯.১% পরিষ্কার জ্বালানি: ৯.৯% প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা: ৫৮.৭% প্রাথমিক সমাপনের হার ৭৯.৫% বিদ্যুৎ: ৭৭.৯% (এসভিআরএস, ২০১৭, বিবিএস)	-	৯২.২৩% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
১.৫.১ দুর্যোগের কারণে প্রতি ১,০০,০০০ জনে নিহত, নিখোঁজ ও এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি: ১২,৮৮১ প্রতি এক লাখে নিহত: ০.২০৪৫ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৬)	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি: ৬,৫০০	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি: ৪,৩১৮ নিহত ব্যক্তি: ০.৩১৬ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৯)
১.৫.৪ জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকারগুলোর অনুপাত	সিটি করপোরেশন ০.০৮৩৩ (১/১২) পৌরসভা ০.০০৯১ (৩/৩৩০) (এমওডিএমআর, ২০১৯)	-	সিটি করপোরেশন ০.০৮৩৩ (১/১২) পৌরসভা ০.০০৯১ (৩/৩৩০) (এমওডিএমআর, ২০১৯)
১.ক.১ দারিদ্র্য নিরসনের কর্মসূচিতে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অভ্যন্তরীণভাবে উৎপন্ন সংস্থানের অনুপাত	৮০.০৭% (অর্থ বিভাগ, ২০১৪-১৫)	-	৮০.৬০% (অর্থ বিভাগ, ২০১৯)
১.ক.২ অপরিহার্য পরিষেবাগুলোয় (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা) মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাত	স্বাস্থ্য: ৪.৮১% শিক্ষা: ১২.৮২% এসপি: ১২.৭২% (অর্থ বিভাগ: অর্থবছর ২০১৫)	স্বাস্থ্য: ৫% শিক্ষা: ১৫% এসপি: ১৫%	স্বাস্থ্য: ৪.৯% শিক্ষা: ১৫.২০% এসপি: ১৪.২০% (অর্থ বিভাগ, ২০১৯-২০২০)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
১.খ.১ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নারী, দরিদ্র ও দুর্বল গোষ্ঠীর উপকারে আসে না এমন খাতে সরকারের পৌনঃপুনিক ও মূলধন ব্যয়ের অনুপাত	মোট বাজেটে নারীদের জন্য ব্যয়ের (পৌনঃপুনিক ও মূলধন) অনুপাত: ২৬.৬০% মোট বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ব্যয়ের (পৌনঃপুনিক ও মূলধন) অনুপাত: ১৪.৯৯% (অর্থ বিভাগ, ২০১৫)	-	মোট বাজেটে নারীদের জন্য ব্যয়ের (পৌনঃপুনিক এবং মূলধন) অনুপাত: ৩০.৬০% মোট বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ব্যয়ের (পৌনঃপুনিক ও মূলধন) অনুপাত: ১৪.৫৫% (অর্থ বিভাগ, ২০১৮-১৯)
অভীষ্ট ২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার			
২.১.১ পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা	১৫.১%	১৪%	১৪.৭% (এফএও, ২০১৯)
২.১.২ ফুড ইনসিকিউরিটি এক্সপেরিয়েন্স স্কেলের (এফআইইএস) ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে মধ্যম ও চরম মাত্রার খাদ্যঘাটতির প্রবণতা	মধ্যম: ৩২.৩% চরম: ১১.১% (এফএও, ২০১৬)	-	মধ্যম: ৩০.৫% চরম : ১০.২% (এফএও, ২০১৬)
২.২.১ পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে খর্বতার ব্যাপকতা (বয়সের তুলনায় উচ্চতা <-২ বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ-সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি) এবং	৪২% (এমআইসিএস ২০১২-১৩)	২৫%	২৮.০% (এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস)
২.২.২ ধরনভেদে (কৃশতা ও বাড়তি ওজন) পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা (বয়সের তুলনায় উচ্চতা >+২ অথবা <-২ বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ-সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি)	ক) কৃশতা: ১৪.৩% (বিডিএইচএস, ২০১৪) খ) বাড়তি ওজন: ১.৬% (এমআইসিএস ২০১২-১৩)	ক) ১২% খ) ১.৫%	ক) কৃশতা: ৯.৮% খ) স্থূলতা: ২.৪% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
২.৫.১ খাদ্য ও কৃষির জন্য মধ্যম অথবা দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষিত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর জিনগত সম্পদের ভান্ডার	বিএআরআই : ১০১৫৭ বিআরআরআই: ৭,৪২০ বিআইএনএ: ১,৭০০ বিজেআরআই: ৬,০১২ বিএসআরআই: ১১৩৬ সিডিবি: ৫২০ বিএফআরআই:২১৩ (মতস্য) বিএফআরআই:১৮,০০০ (বন) বিটিআরআই: ৪৭৫ বিএসআরটিআই:৬৮ বিএলআরআই: প্রাণী: ৩০ উদ্ভিদ: ৪০ (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৫)	বিএআরআই:৯,৮৮৪ বিআরআরআই:৮,২৮১ বিআইএনএ: ২,১০০ বিজেআরআই: ৬,০৩০ বিএসআরআই: ১,২৫০ সিডিবি: ৫৪৫ বিএফআরআই:২৭০ (মৎস্য) বিএফআরআই:১৮,৫০০ (বন) বিটিআরআই: ৫৭৫ বিএসআরটিআই: ৮৬	বিএআরআই: ১১০৮১ বিআরআরআই:৮৫৮২ বিএফআরআই:২৬০ বিএলআরআই: প্রাণী: ৩৩ উদ্ভিদ: ৪৪ (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৯)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
২.৫.২ ঝুঁকিগ্রস্ত, ঝুঁকিবিহীন বা বিলুপ্তি ঝুঁকির অজানা পর্যায়ভুক্ত–এমন শ্রেণিবিন্যাসে প্রাণিজাতের অনুপাত	বিএলআরআই: ৬৪ (বিএলআরআই, ২০১৫)	-	বিএলআরআই: ৫ (বিএলআরআই, ২০১৯)
২.ক.১ সরকারি ব্যয়ের জন্য কৃষিমুখিতা সূচক বা এগ্রিকালচারাল অরিয়েন্টেশন ইনডেক্স (এওআই)	০.৫৩ (এফএও, ২০১৫)	০.৮০০	০.৪০৯ (এফএও, ২০১৬)
২.ক.২ কৃষি খাতে মোট বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ (সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দসহ অন্যান্য বরাদ্দ)	২১০.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, অর্থবছর ১৫) মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, অর্থবছর ২০১৯)
২.খ.১ কৃষিজ রপ্তানি ভর্তুকি	৭৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিবি, অর্থবছর ১৫-১৬)	০	৭৩.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিবি, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
২.গ.১ খাদ্যমূল্যে ব্যত্যয়ের সূচক	ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচক: (-) ০.২০ চাউল: ০.৬০ গম: (-) ০.৭০ (এফএও, ২০১৬)	-	ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচক: ১.২০ চাউল ১.৬০ গম: ০.৬০ (এফএও, ২০১৭)
এসডিজি অভীষ্ট ৩: সব বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্থ জীবন ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান			
৩.১.১: মাতৃমৃত্যুর হার	১৮১ (এসভিআরএস, ২০১৫)	১০৫	১৬৫ (এসভিআরএস, ২০১৯)
৩.১.২: দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে প্রসবের অনুপাত	৪৩.৫% (এমআইসিএস, ২০১২-১৩)	৬৫%	৫৯% (এমআইসিএস, ২০১৯) ইউ : ৭৩.৭%, আর-৫৪.৮%
৩.২.১ অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর	৩৬ (এসভিআরএস, ২০১৫)	৩৪	২৮ (এসভিআরএস, ২০১৯)
৩.২.২ নবজাতকের মৃত্যুহার	২০ (এসভিআরএস-২০১৫)	১৯	১৫ (এসভিআরএস, ২০১৯)
৩.৩.১: জেন্ডার, বয়স ও মূল জনসংখ্যা অনুসারে প্রতি হাজার অসংক্রমিত মানুষের মধ্যে নতুন এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা	সব বয়সি: ০.০১ (নারী ১৫-৪৯ বছর: <০.০১, পুরুষ ১৫-৪৯ বছর: <০.০১) (ইউএনএইডস, ২০১৬)	০.০৩	সব বয়সি : <০.০১ প্রাপ্তবয়স্ক ১৫-৪৯ বছর: ০.০১৫ (ইউএনএইডস, ২০১৮)
৩.৩.২: প্রতি লাখে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা	২৮৭ (এনটিপি২০১৬)	২৫০	১৬১ (ডিজিএইচএস)
৩.৩.৩: প্রতি এক হাজার জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের ঘটনা	৪.৩ (এমসিপি, ২০১৫)	৩	১.৬ (ডব্লিউএইচও, ২০১৯)
৩.৩.৫: উষ্ণমণ্ডলীয় গুরুত্বহীন রোগের (এনটিডি) কারণে চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়া মানুষের সংখ্যা	৪৯,৮৭৩,৮৮৯ (ডব্লিউএইচও, ২০১৬)	৪৫,০০০,০০০	৫৬,৩৩৯,৩৯২ (ডব্লিউএইচও, ২০১৯)
৩.৪.১: হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস অথবা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগে মৃত্যুর হার	২১.০% (ডব্লিউএইচও, ২০১৬)	১৫%	২১.৬% (ডব্লিউএইচও, ২০১৯)
৩.৪.২: আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর হার	৭.৬৮ (বিপি, ২০১৫)	৫.৫	৭.৫৬ (বিপি, ২০১৯)
৩.৫.১: মাদকাসক্তিজনিত মানসিক সমস্যা নিরাময়ে চিকিৎসার হার (ওষুধ প্রয়োগ, মনস্তাত্ত্বিক ও পুনর্বাসন এবং নিরাময়-পরবর্তী সেবা)	১৬,৪১৬ (ডিএনসি, ২০১৫, এমওএইচএ)	-	৩৮,০৩৫ (ডিএনসি, ২০১৮)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
৩.৫.২: ক্ষতিকর মাত্রায় অ্যালকোহল গ্রহণ, দেশীয় প্রেক্ষিতে ১৫ বছরের উর্ধ্বে মাথাপিছু অ্যালকোহল সেবনের হার (বছরে কত লিটার)	০.০৮৩ (ডব্লিউএইচও, ২০১৬)	০.২	০.০৮৩ (ডিএনসি, ২০১৮)
৩.৬.১: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার (প্রতি এক লাখ জনসংখ্যার বিপরীতে)	২.৪৮ (পিএসডি, ২০১৫)	২.০	১.৬৪ (পিএসডি, ২০১৮)
৩.৭.১: প্রজনন সক্ষম নারীদের (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি) মধ্যে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের সন্তোষজনক হার	৭২.৬% (বিডিএইচএস, ২০১৪)	৭৫%	৭৭.৪% (এমআইসিএস, ২০১৯,বিবিএস)
৩.৭.২: প্রতি এক হাজার নারীর মধ্যে কিশোরী বয়সে সন্তানধারণকারীর হার (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছরে গর্ভধারণের প্রবণতা)	৭৫ (এসভিআরএস, ২০১৫)	৭০	৮৩ (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
৩.৮.১: জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অবস্থান (জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অবস্থান বলতে বোঝায় প্রজনন, মাতৃ, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগের সেবাদানের সক্ষমতা এবং সাধারণ মানুষ ও সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সেসব সেবাপ্রাপ্তির সুযোগের মাত্রা)	৫২ (ডব্লিউএইচও, ২০১৬)	৬৫	৫৪ (ডব্লিউএইচও, ২০১৯)
৩.৮.২: সংসারের মোট ব্যয়ের অনুপাতে স্বাস্থ্যসেবায় বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হওয়া জনসংখ্যার অনুপাত	১০% জাতীয়: ২৪.৬৭ গ্রামীণ: ২৬.০৫ শহুরে: ২১.০০ সবচেয়ে দরিদ্র ২০% (কিউ১): ২৪.০৫ দ্বিতীয় সবচেয়ে দরিদ্র ২০% (কিউ ২): ২৪.৫৫ মধ্যবিত্ত ২০% (কিউ ৩): ২৪.৯১ দ্বিতীয় সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ ৪): ২৫.৯২ সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ৫): ২৩.৯২ ২৫% জাতীয় ০৯.৫৩ গ্রামীণ: ১০.২২ শহুরে: : ০৭.৭১ সবচেয়ে দরিদ্র ২০% (কিউ ১): ০৯.৩৬ দ্বিতীয় সবচেয়ে দরিদ্র ২০% (কিউ ২): ০৯.৩০ মধ্যবিত্ত ২০% (কিউ ৩): ১০.০৪ দ্বিতীয় সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ ৪): ০৯.৭০ সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ ৫): ০৯.২৪ (হায়েস -২০১৬, বিবিএস)	-	১০% জাতীয়: ২৪.৬৭ গ্রামীণ: ২৬.০৫ শহুরে: ২১.০০ সবচেয়ে দরিদ্র ২০% (কিউ ১): ২৪.০৫ দ্বিতীয় সবচেয়ে দরিদ্র ২০% (কিউ ২): ২৪.৫৫ মধ্যবিত্ত ২০% (কিউ ৩): ২৪.৯১ দ্বিতীয় সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ ৪): ২৫.৯২ সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ ৫): ২৩.৯২ ২৫% জাতীয়: ০৯.৫৩ গ্রামীণ: ১০.২২ শহুরে: ০৭.৭১ দরিদ্র ২০% (কিউ ১): ০৯.৩৬ দ্বিতীয় সবচেয়ে দরিদ্র ২০% (কিউ ২): ০৯.৩০ মধ্যবিত্ত ২০% (কিউ ৩): ১০.০৪ দ্বিতীয় সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ ৪): ০৯.৭০ সবচেয়ে ধনী ২০% (কিউ ৫): ০৯.২৪ (হায়েস -২০১৬, বিবিএস)
৩.৯.৩: অনিচ্ছাকৃত বিষপ্রয়োগজনিত মৃত্যুর হার	০.৩০ (ডব্লিউএইচও , ২০১৬)	০.৩	০.৩ (ডব্লিউএইচও, ২০১৯)
৩.ক.১: বয়স অনুযায়ী ১৫ বছর বা তদূর্ধ্বদের মধ্যে তামাক সেবন পরিস্থিতি	৪৩.৩% (জিএটিএস, ২০০৯, ডব্লিউএইচও)	৩৫%	৩৫.৩% (জিএটিএস, ২০১৭, ডব্লিউএইচও)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
৩.খ.১: জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় সব ধরনের টিকাদান কার্যক্রমের আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত	৭৮% (বিডিএইচএস, ২০১৪)	৯৫%	৮৫.৬% (বিডিএইচএস, ২০১৭-১৮)
৩.গ.১: চিকিৎসা গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্য খাতে মোট নেট আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা	(ক) ৭.৪ (ডব্লিউএইচও , ২০১৬) (খ) ১: ০.৫: ০.২ (এইচআরএইচ ডেটা শিট, ২০১৪এইচএসডি)	(ক) ১৮.৯ (খ) ১: ১.৩: ১.৮	(ক) ৮.৩ (খ) ১: ০.৫৬: ৪০ (এইচআরডি, ২০১৭, এমওএইচফডব্লিউ)
৩.ঘ.১ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়মনীতি (আইএইচআর) সক্ষমতা ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রস্তুতি	৭৮.০ (ডব্লিউএইচও, ২০১৬)	৯৫	৫৮ (ডব্লিউএইচও, ২০১৯)
অভীষ্ট ৪: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিতকরণ			
৪.১.১: জেন্ডারভেদে শিশু ও অল্পবয়সিদের অনুপাত, যারা (ক) ২য়/৩য় শ্রেনিতে (খ) প্রাথমিকের শেষদিকে ও (গ) নিম্ন মাধ্যমিকের শেষে ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করেছে (অ) পঠনে ও (আ) গণিতে।	(ক) তৃতীয় শ্রেণি (বাংলা পড়া– মোট ৪১%, গণিত– মোট ২৮%) (খ) প্রাথমিক শেষে– পঞ্চম শ্রেণী (বাংলা পঠন– মোট ৪৫%, গণিত–মোট ২৫%) (এনএসএ, ২০১৫, ডিপিই) (গ) নিম্ন মাধ্যমিক শেষে পঠন: বাংলা–বালক: ৫৫, বালিকা: ৫৪, মোট: ৫৪ ইংরেজি– বালক: ২২, বালিকা: ১৮, মোট: ১৯ গণিত– বালক: ৬২, বালিকা: ৫২, মোট: ৫৭ (এলএএসআই, ২০১৫)	(গ) নিম্ন মাধ্যমিক শেষে পঠন: বাংলা– বালক: ৬৫, বালিকা: ৬৫, মোট: ৬৫ ইংরেজি– বালক: ৪০, বালিকা: ৪০, মোট: ৪০ গণিত–বালক: ৬৫, বালিকা: ৬০, মোট: ৬৩	(ক) দ্বিতীয়/তৃতীয় শ্রেণি (বাংলা পঠন– ২৫.৯%, গণিত–১৩.০%) (এমআইসিএস, ২০১৯ বিবিএস)
৪.২.১: জেন্ডারভেদে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে ট্র্যাকে থাকা শিশুর অনুপাত	৬৩.৯% (এমআইসিএস ২০১২-১৩)	-	৭৪.৫% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
৪.২.২: আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য বয়সের এক বছর আগে)	ছেলে: ৩৮% মেয়ে: ৪০% মোট: ৩৯% (এপিএসসি, ২০১৫) মোট-৩৪% (ডবিউডিআই, ২০১৬)	ছেলে: ৮০% মেয়ে: ৮০% মোট: ৮০%	ছেলে: ৭৬.১% মেয়ে: ৭৮.৮% জাতীয়: ৭৭.৫% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
৪.৫.১ সব শিক্ষা-সূচকের সমতা সূচকসমূহ যা এই তালিকা থেকে পৃথক করা যেতে পারে (তথ্যের প্রাপ্যতা অনুযায়ী মহিলা / পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে, নিচে / শীর্ষস্থানীয় সম্পদশালী জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য যেমন অক্ষমতার অবস্থা, আদিবাসী মানুষ এবং সংঘাত-আক্রান্ত)	(ক) প্রাথমিক জিপিআই: ১.০২ (খ) মাধ্যমিক জিপিআই: ১.১৫ গ্রামীণ: ১.১৯ শহুরে: ১.০৯ গ) উচ্চ মাধ্যমিক জিপিআই:০.৮৫ গ্রামীণ:০.৮৬শহুরে: ০.৮৪ ঘ) টারশিয়ারি জিপিআই: ০.৬৫ ঙ) কারিগরি জিপিআই: ০.৩৮ চ) অক্ষমতা জিপিআই (৬-১০) : ০.৬১ ছ) শিক্ষক (মাধ্যমিক) জিপিআই: ০.২৬ জ) শিক্ষক (টারশিয়ারি) জিপিআই ০.২১ (প্রাথমিকের জন্য এপিএসসি, ২০১৫ অন্যান্যের জন্য বিইএস, ২০১৫)	ক) জিপিআই: ১.০০ খ) জিপিআই: ১.১৪ গ) জিপিআই: ০.৯০ ঘ) জিপিআই: ০.৭০ ঙ) জিপিআই: ০.৪১ চ) জিপিআই (৬-১০): ০.৭৪ ছ) জিপিআই: ০.৩৪ জ) জিপিআই: ০.৩০	খ) জিপিআই: ১.১৯ গ) জিপিআই: ০.৯৩ ঘ) জিপিআই:০.৭২ (এইআইএস, ব্যানবেইস, ২০১৭)
৪.৬.১: জেন্ডারভেদে ব্যবহারিক (ক) সাক্ষরতা ও (খ) গণন দক্ষতায় ন্যূনতম নৈপুণ্য অর্জনকারী নির্দিষ্ট বয়সের জনগোষ্ঠীর হার	(ক) ব্যবহারিক সাক্ষরতা (১৫-৪৫ বছর): ৫৩.৬% (খ) ব্যবহারিক গণন দক্ষতা (১৫-৪৫ বছর): ৫২.৮% (এলএএস, ২০১১, বিবিএস)		৭৩.৯% (বিবিএস, এসভিআরএস, ২০১৮)
৪.ক.১ সেইসব বিদ্যালয়ের অনুপাত যেগুলোর অভিগম্যতা রয়েছে–(ক) বিদ্যুতে; (খ) শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে; (গ) শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে কম্পিউটারে; (ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিযোজিত অবকাঠামো এবং উপকরণে; (ঙ) মৌলিক পানীয় জলে; (চ) একক-লিঙ্গের প্রাথমিক স্যানিটেশন সুবিধায়; এবং (ছ) মৌলিক হাত ধোয়া সুবিধায় (ওয়াশ সূচক সংজ্ঞা অনুসারে)	প্রাথমিক (ক) ৫৮% (খ) ০.৮% (গ) ০.৮% (ঘ) ৩৪% (ঙ) ৮২% স্কুল (চ) ৪৮% স্কুল (ছ) প্রযোজ্য নয় (এপিএসসি, ২০১৫) মাধ্যমিক (ক) ৮৬.০৩% (খ) ২.৪.৪৯% (গ) ৮২% (ফ) র‍্যাম্প: ১৪% (বিইএস, ২০১৫) (ঙ) ৯৬.৬১% (চ) ৯৫.৫৫% (ছ) ১৯.৬৮% (ব্যানবেইস, ২০১৭)	প্রাথমিক (ক) ১০০% (খ) ৮০% (গ) ৮৫% (ফ) ৬০% (ঙ) ৯০% স্কুল (চ) ৭০% স্কুল (ছ) ৭০% মাধ্যমিক (ক) ৯৫% (খ) ৯৫% (গ) ৯৫% (ফ) ৬০%	প্রাথমিক (ক) ৭৬.৮৬% (খ) ৮.৩৬% (গ) ১৭.৯% (জিইএমআর, ২০১৬) (ফ) ৫২.০৬% (পিওডি, ডিপিই, ২০১৮) (ঙ) ৭৮.৮৮% স্কুল (চ) ৭০.৮৮% স্কুল (ছ) ৪৩.৫% (পিওডি, ডিপিই, ২০১৮)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
৪.গ.১ শিক্ষকদের অনুপাত: (ক) প্রাক-প্রাথমিকে; (খ) প্রাথমিকে; (গ) নিম্ন মাধ্যমিকে; এবং (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায়, যারা সংশ্লিষ্ট দেশে প্রাসঙ্গিক স্তরে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় কমপক্ষে ন্যূনতম আনুষ্ঠানিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন চাকরির আগেই বা চাকরিতে থাকাকালীন	প্রাথমিক (খ) মোট: ৭৩% (পুরুষ: ৭৭% নারী: ৭০%) (এপিএসসি, ২০১৫) মাধ্যমিক) (গ) ৫৯.৬১% (ঘ) ৪৪.১০% (বিইএস ২০১৫)	প্রাথমিক (খ) মোট: ৭৫% (পুরুষ: ৮০% নারী: ৭৫%) মাধ্যমিক (গ) ৭৩% (ঘ) ৬০%	প্রাথমিক (খ) মোট : ৬৮.৭৩% (এপিএসসি-২০১৮, ডিপিই)
অভীষ্ট ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও তরুণীর ক্ষমতায়ন			
৫.৩.১: বিয়ে বা কোনো ধরনের বন্ধনে ১৫ ও ১৮ বছরের আগে আবদ্ধ হয়েছে, এমন ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি নারীর অনুপাত	১৫ বছরের আগে: ২৩.৮% ১৮ বছরের আগে : ৫৮.৬% (এমআইসিএস, ২০১২-১৩)	১৫ বছরের আগে: ১৫% ১৮ বছরের আগে : ৩০%	১৫ বছরের আগে: ১৫.৫% ১৮ বছরের আগে : ৫১.৪% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
৫.৪.১: জেন্ডার, বয়স ও স্থানভেদে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ব্যয়িত সময়ের অনুপাত	নারী: ২৫.৮% পুরুষ: ৫% (টিইউএস, ২০১২,)	নারী: ২৫% পুরুষ: ৬%	নারী: ২৩.৬% পুরুষ: ৬.৯% (এলএফএস ২০১৬-১৭, বিবিএস)
৫.৫.১: নারী প্রতিনিধির অনুপাত (ক) জাতীয় সংসদে ও (খ) স্থানীয় সরকারে	(ক) ২০% (বিপিএস, ২০১৪) (খ) ২৩% (এলজিডি, ২০১৬)	(ক) ৩৩% (খ) ২৫%	(ক) ২০.৮৬% (বিপিএস, ২০১৯) (বিপিএস, ২০১৯) (খ) ২৫.২১% (এলজিডি, ২০১৮)
৫.৫.২: ব্যবস্থাপনা পদে নারীদের অনুপাত	১১.৪% (এলএফএস, ২০১৫-১৬)	১৮%	১০.৭% (এলএফএস, ২০১৬-১৭)
৫.খ.১: জেন্ডারভেদে মোবাইল টেলিফোনের মালিক ব্যক্তিদের অনুপাত	উভয় লিঙ্গ: ৭৯.৭৬% (বিটিআরসি, ২০১৫)	৮৫%	৭৮.১% (সিপিএইচএস, ২০১৮, বিবিএস)
অভীষ্ট ৬: সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা			
৬.১.১: পানযোগ্য নিরাপদ পানির সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত	জাতীয়: ৪৭.৯% নগর: ৪৪.৭% গ্রামীণ: ৪৮.৮% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)		জাতীয়: ৪৭.৯% নগর: ৪৪.৭% গ্রামীণ: ৪৮.৮% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
৬.২.১: জনসংখ্যার অনুপাত যারা (ক) নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা ও (খ) সাবানপানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা পান	(ক)) ৬১% (ইউএনজেএমপি, ২০১৫) ক) জাতীয়: ৮৪.৬ শহুরে: ৯০.৬ গ্রামীণ: ৮২.৯ (খ) জাতীয়: ৭৪.৮ শহুরে: ৮৭.০ গ্রামীণ: ৭১.৪ (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)	(ক) ৭৬%	(ক)) ৮৪.৬% (খ) ৭৪.৮% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
৬.৫.১ সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাত্রা (০-১০০)	৫০ (ইউএনইপি, ২০১৭)	-	৫২ (বিডব্লিউডিবি, ২০১৯)
৬.৫.২: পানিবিষয়ক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ আন্তঃসীমান্ত অববাহিকার অনুপাত	৩৮% (জেআরসি, ২০১৬)	-	৩৮% (জেআরসি, ২০১৮)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
৬.ক.১: সরকারের সমন্বিত ব্যয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পানি ও স্যানিটেশন খাতে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ	৩০১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি অর্থবছর ১৫)	৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৫২৬.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
অভীষ্ট ৭. সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা			
৭.১.১: বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠীর অনুপাত	৭৮% (এসভিআরএস, ২০১৫)	৯৬%	৯২.২৩% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
৭.১.২: পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত	২০.৮% (এসভিআরএস, ২০১৫)	২৫%	১৯% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
৭.২.১: চূড়ান্ত জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য উৎসের অংশ	২.৭৯% (স্রেডা, ২০১৫)	১০%	৩.২৫% (স্রেডা, ২০১৯)
৭.৩.১: প্রাথমিক জ্বালানি ও জিডিপি অনুপাতে জ্বালানির ঘনত্ব	২.৬৬ কিলোটন তেল/ শতকোটি টাকা (এইচসিইউ, ২০১৬)	৩ মেগাজুল	২.১৫ কিলোটন তেল/ শতকোটি টাকা (এইচসিইউ, ২০১৯)
৭.ক.১ হাইব্রিড পদ্ধতিসহ পরিষ্কার জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনকে সহায়তা দিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রবাহ	৩০১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার(ইআরডি অর্থবছর ১৫)	-	৪৯৬.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
অভীষ্ট ৮: স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল চাকরি এবং সবার জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা			
৮.১.১: মাথাপিছু প্রকৃত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.১২% (বিবিএস, অর্থবছর ১৫)	৬.৭%	৬.৯১% (এনএডব্লিউ, ২০১৮-১৯, বিবিএস)
৮.২.১: প্রতি কর্মিজনে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৫.৭১% (এনএডব্লিউ, বিবিএস, ২০১৬)	৫%	৫.৮৫% (এনএডব্লিউ, ২০১৮-১৯, বিবিএস)
৮.৩.১: জেন্ডারভেদে অকৃষি খাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত	৭৭.৫% (পুরুষ: ৭৪.৯%, নারী: ৮৮.৪%) (এলএফএস, ২০১৫-১৬)	৭৫%	৭৮.০% (এলএফএস, ২০১৬-১৭, বিবিএস)
৮.৫.১: পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তিভেদে (প্রতিবন্ধী) নারী ও পুরুষ কর্মীদের ঘণ্টাপ্রতি উপার্জন	মাসিক গড় আয় টাকা ১২, ৮৯৭ (পুরুষ: ১৩, ১২৭ নারী: ১২, ০৭২) ১৫-২৪: ১০৮৬২ ২৫-৩৪: ১২৮০১ ৩৫-৪৪: ১৪০৫৩ ৪৫-৫৪: ১৪৮৫৭ ৫৫-৬৪: ১৩১৬০ ৬৫+:১০৮৪৪ (এলএফএস, ২০১৫-১৬)	২০% বৃদ্ধি	মাসিক গড় আয় টাকা. ১৩, ২৫৮ (পুরুষ: ১৩, ৫৮৩ নারী: ১২, ২৫৪) (এলএফএস, ২০১৬-১৭, বিবিএস)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
৮.৫.২: জেন্ডার, বয়স ও অসামর্থ্যের ভিত্তিতে বেকারত্বের হার	লিঙ্গভেদে পুরুষ: ৩.০% নারী: ৬.৮% বয়সভেদে ১৫-১৭ বছর: ১০.৫% ১৮-২৪ বছর: ১০.১% ২৫-২৯ বছর: ৬.৭% ৩০-৬৪ বছর: ১.৯% ৬৫+ বছর: ০.৯% (এলএফএস, ২০১৫-১৬)	লিঙ্গভেদে পুরুষ: ২.৭% নারী: ৪.২%	লিঙ্গভেদে পুরুষ: ৩.১% নারী: ৬.৭% বয়সভেদে ১৫-১৭ বছর:১২.৩% ১৮-২৪ বছর: ৫.৭% ২৫-২৯ বছর: ১.২% ৩০-৬৪ বছর: ০.৮% ৬৫+ বছর: ০.৬% (এলএফএস , ২০১৬-১৭)
৮.৬.১: শিক্ষা, কর্মসংস্থান অথবা প্রশিক্ষণে যুক্ত নয় ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি এমন তরুণ-তরুণীর অনুপাত	২৮.৯% (পুরুষ: ১০.৩%, মহিলা: ৪৬.৭%) (এলএফএস, ২০১৫-১৬)	২২%	২৬.৮% (পুরুষ: ৯.২%, মহিলা: ৪৩.৯%) (এলএফএস, ২০১৬-১৭, বিবিএস)
৮.৮.১: জেন্ডার ও অভিবাসীর অবস্থানভেদে পেশাগত কাজে মারাত্মক ও মারাত্মক নয় এমন জখমের ঘটনার হার	ক) মারাত্মক জখম: ৩৮২ প্রতিবছর (পুরুষ: ৩৬২; নারী: ২০) খ) অ-মারাত্মক জখম: ২৪৬ প্রতিবছর (পুরুষ: ১৭৭; নারী: ১৯) (ডিআইএফই, ২০১৫)	ক)মারাত্মক: <৩০০ খ) অ-মারাত্মক: <২০০	ক) মারাত্মক: ২২৮ (পুরুষ: ২২০; নারী: ৮) খ) অ-মারাত্মক: ১১১ (পুরুষ: ৯৪; নারী: ১৭) (ডিআইএফই, ২০১৯)
৮.১০.১: (ক) প্রতি এক লাখ পূর্ণবয়স্ক মানুষের বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সংখ্যা (খ) প্রতি লাখ পূর্ণবয়স্কের বিপরীতে এটিএম বুথের সংখ্যা	(ক) ৮.৩৭ (খ) ৬.৭৯ (আইএমএফ, ২০১৫)	(ক) ৯.০ (খ) ৭.০	(ক) ৮.৯৬ (খ) ৮.৮৭ (আইএমএফ, ২০১৮)
৮.১০.২: ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মোবাইলে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাবধারী পূর্ণবয়স্ক (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) জনগোষ্ঠীর অনুপাত	(ক) ব্যাংক: ৩১% (খ) এফআই: ২৯.১% (গ) মোবাইল: ২.৭% (গ্লোবাল ফিনডেক্স, বিশ্বব্যাংক, ২০১৪) ৫০.৮০% (বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৫)	(ক) ব্যাংক: ৩৩% (খ) এফআই: ৩০% (গ) মোবাইল: ৩%	মোট: ৬৯.২৫% (বিবি, ২০১৮)
অভীষ্ট ৯: অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ও উদ্ভাবন উৎসাহিত করা			
৯.১.২ পরিবহনের ধরন অনুসারে যাত্রী ও পণ্যের পরিমাণ	যাত্রী: ৭,৯৩৮,০০০ পণ্য: ২,৭৯,২৮৬ মেট্রিক টন (সিএএবি, ২০১৫)	-	যাত্রী:১২,৩৯৮,০০০ পণ্য:৩,৮৩,০১৮ মেট্রিক টন (সিএএবি, ২০১৮)
৯.২.১ জিডিপি ও মাথাপিছু অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজন	জিডিপির অনুপাতে: ২০.১৬% মাথাপিছু: ১৩০ মার্কিন ডলার (এনএডব্লিউ, অর্থবছর ২০১৪-১৫, বিবিএস)	২১.৫%	জিডিপির অনুপাতে: ২৪.২১% মাথাপিছু: ১৮৪ মার্কিন ডলার (এনএডব্লিউ, অর্থবছর ২০১৮-১৯, বিবিএস)
৯.২.২ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কর্মসংস্থান	১৪.৪% (এলএফএস ২০১৫-১৬)	২০%	১৪.৪% (এলএফএস, ২০১৬-১৭, বিবিএস)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
৯.ক.১ অবকাঠামোতে মোট আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক সহায়তা (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা এবং অন্যান্য সরকারি প্রবাহ)	১২৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, অর্থবছর ১৫)	২১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৪০৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
৯.খ.১ মোট মূল্য সংযোজনে মধ্য ও উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পের মূল্য সংযোজনের অনুপাত	১২.৬৫ (এনএডব্লিউ, ২০১৫, বিবিএস)	-	১১.৫৭ (এনএডব্লিউ, ২০১৮, বিবিএস)
৯.গ.১ প্রযুক্তির ভিত্তিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত	টুজি: ৯৯.৪% থ্রিজি: ৭১% (বিটিআরসি, ২০১৫)	টুজি: ১০০% থ্রিজি: ৯২%	টুজি: ৯৯.৬০% থ্রিজি: ৯৫.২৩% ফোরজি: ৭৯.০০% (বিটিআরসি, ২০১৯)
অভীষ্ট ১০. দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমানো			
১০.৩.১ পূর্ববর্তী ১২ মাসে বৈষম্য অথবা নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বলে ব্যক্তিগতভাবে মনে করে তা অবহিত করেছেন, এমন জনসংখ্যার অনুপাত; আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে	৩৫.৬% (সিপিইচএস, ২০১৮, বিবিএস)	-	৩৫.৬% (সিপিইচএস, ২০১৮, বিবিএস
১০.৫.১ আর্থিক সক্ষমতার সূচক	১. রেগুলেটরি টায়ার ১ ক্যাপিটাল টু অ্যাসেটস ৫.৪০ ২. রেগুলেটরি টায়ার ১ক্যাপিটাল টু রিস্ক-ওয়েইটেড অ্যাসেটস: ৮.০০ ৩. ননপারফর্মিং লোনস নেট অফ প্রভিসনস টু ক্যাপিটাল ৪৪.১৯ ৪. ননপারফর্মিং লোনস টু টোটাল গ্রস লোনস: ৮.৪০ ৫. রিটার্ন অন অ্যাসেটস: ১.৮৬ ৬. লিকুইড অ্যাসেটস টু শর্ট-টার্ম লায়াবিলিটিস: ৫১.১৩ ৭. নেট ওপেন পজিশন ইন ফরেইন এক্সচেঞ্জ টু ক্যাপিটাল: ৪.৭২ (বিবি. ২০১৫)	-	১. রেগুলেটরি টায়ার ১ ক্যাপিটাল টু অ্যাসেটস: ৪.৭৪ ২. রেগুলেটরি টায়ার ১ক্যাপিটাল টু রিস্ক-ওয়েইটেড অ্যাসেটস: ৬.৭৭ ৩. ননপারফর্মিং লোনস নেট অফ প্রভিসনস টু ক্যাপিটাল ৫৩.৩৬ ৪. ননপারফর্মিং লোনস টু টোটাল গ্রস লোনস: ৯.৮৯ ৫. রিটার্ন অন অ্যাসেটস: ০.৮৬ ৬. লিকুইড অ্যাসেটস টু শর্ট-টার্ম লায়াবিলিটিস: ৪৪.৪৮ ৭. নেট ওপেন পজিশন ইন ফরেইন এক্সচেঞ্জ টু ক্যাপিটাল: ৭.৪৩ (বিবি. ২০১৮)
১০.খ.১ গ্রাহক ও দাতা দেশ এবং প্রবাহের ধরন অনুযায়ী উন্নয়ন খাতে মোট সম্পদ প্রবাহ (যেমন আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ও অন্য প্রবাহ অন্তর্ভুক্ত।	ওডিএ: ৩০০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৪-১৫), ইআরডি খ) এফডিআই: ১৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (বিডা, ২০১৪-১৫) মিলিয়ন	ক) ওডিএ: ৬০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খ) এফডিআই: ৯০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	ক) ওডিএ: ৬৩৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, অর্থবছর ২০১৭-১৮
১০.গ.১ পাঠানো রেমিট্যান্সের অনুপাত হিসাবে রেমিট্যান্স ব্যয়	৪.০৬% (বিবি, ২০১৫)	৫%	৪.৪৮% (বিবি, ২০১৮)
অভীষ্ট ১১. অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা			
১১.৪.১ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণে মাথাপিছু মোট ব্যয় (সরকারি ও বেসরকারি)। ঐতিহ্যভেদে, যেমন: সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, মিশ্য ও বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি। সরকারে পর্যায়, যেমন জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় বা পৌরসভা। ব্যয়ের ধরন, যেমন পরিচালন ব্যয় বা বিনিয়োগ এবং বেসরকারি অর্থায়ন যেমন অনুদান, বেসরকারি অলাভজনক খাত এবং পৃষ্ঠপোষকতা।	১.৭২ পিপিপি ডলার (সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, অর্থবছর ২০১৫-১৬)	-	১.৭৫ পিপিপি ডলার (সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, অর্থবছর ২০১৮-১৯)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
১১.৫.১ প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে মৃত, নিখোঁজ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ: ১২, ৮৮১ প্রতি ১০০, ০০০ মানুষে মৃত: ০.২০৪৫ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৬)	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ: ৬, ৫০০	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ: ৪, ৩১৮ মৃত: ০.৩১৬ (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৯)
১১.খ.২ জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকারের অনুপাত	সিটি করপোরেশন: ০.০৮৩৩ (১/১২) পৌরসভা: ০.০০৯১ (৩/৩৩০) (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৯)	-	সিটি করপোরেশন: ০.০৮৩৩ (১/১২) পৌরসভা: ০.০০৯১ (৩/৩৩০) (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৯)
অভীষ্ট ১২. টেকসই উৎপাদন ধারা ও পরিমিত ভোগ নিশ্চিতকরণ			
১২.গ.১ জিডিপির (উৎপাদন ও ভোগ) প্রতি ইউনিটে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকির পরিমাণ এবং মোট জাতীয় ব্যয়ের অনুপাত হিসাবে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকি	জিডিপির ০.০৪% জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যয়ের ০.০৬% (অর্থ বিভাগ, অর্থবছর ২০১৪-১৫)	-	জিডিপির ০.৬% জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যয়ের ১.৩% (অর্থ বিভাগ, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
অভীষ্ট ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি			
১৩.১.১ দুর্যোগের কারণে প্রতি এক লাখের মধ্যে মৃত, নিখোঁজ ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ: ১২, ৮৮১ প্রতি ১,০০, ০০০ জনসংখ্যায় মৃত মানুষ: ০.২০৪৫ (এমওডিএমআর, ২০১৬)	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ: ৬,৫০০	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ: ৪,৩১৮ মৃত মানুষ: ০.৩১৬ (এমওডিএমআর, ২০১৯)
১৩.১.৩ জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকারের অনুপাত।	সিটি করপোরেশন: ০.০৮৩৩ (১/১২) পৌরসভা: ০.০০৯১ (৩/৩৩০) (এমওডিএমআর, ২০১৯)	-	সিটি করপোরেশন: ০.০৮৩৩ (১/১২) পৌরসভা: ০.০০৯১ (৩/৩৩০) (এমওডিএমআর, ২০১৯)
অভীষ্ট ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার			
১৪.৫.১ মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি	২.০৫% (বিডিএফ)	-	৫.২৭% (ইউএনএসকাপ, ২০২০)
১৪.৭.১ ক্ষুদ্র দ্বীপ, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত দেশ এবং সব দেশের জিডিপি অনুপাতে টেকসই মৎস্য আহরণ	৩.২৯ (এনএডব্লিউ, ২০১৫, বিবিএস)	-	৩.১৪ (এনএডব্লিউ, ২০১৮, বিবিএস)
১৪.গ.১ আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সমুদ্র-সম্পর্কিত আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন অনুমোদন, গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অগ্রগতিশীল দেশগুলোর সংখ্যা; সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন জাতিসংঘের সমুদ্র আইন অধিবেশন অনুযায়ী প্রণীত যা মহাসাগর ও এগুলোর সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণের জন্য প্রণীত	-	-	অনুমোদন বা সম্পর্কিত দলিলে/চুক্তিতে অংশগ্রহন: ১০০ সংশ্লিষ্ট দলিল/চুক্তি বাস্তবায়ন: ৯০ [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ২০১৯]
অভীষ্ট ১৫. স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবিলা, ভূমির অবক্ষয়রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি প্রতিরোধ			
১৫.১.১ মোট ভূমি এলাকার অনুপাতে বনাঞ্চল	১৪.১০% (বন বিভাগ, ২০১৫, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)	১৫%	১৪.৪৭% (অভ্যন্তরীণ জলীয় এলাকা বাদ দিয়ে) (বন বিভাগ, ২০১৮)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
১৫.১.২ বাস্তুতন্ত্রের ধরনভেদে সংরক্ষিত এলাকায় স্থলজ ও স্বাদু পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকার অনুপাত	ক) স্থলজ: ১.৭% (২০১৪-১৫, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) খ) স্বাদু পানি: ১.৮% (২০১৩-১৪ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)	ক) ২.৪% খ) ৫%	ক) ৩.০৬% (বন বিভাগ, ২০১৯) খ) ৩.০৮% (বন বিভাগ, ২০১৮)
১৫.৪.১ সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতায় পাহাড়ি জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা	০.৩৫% (বিএফডি, ২০১৯)		০.৩৫% (বিএফডি, ২০১৯)
অভীষ্ট ১৬. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের পথ সুগম করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ			
১৬.১.১ জেন্ডার ও বয়সভেদে প্রতি ১ লাখের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে খুন হওয়া মানুষের সংখ্যা	মোট: ১.৯৪ পুরুষ: ৩.১ নারী: ০.৭৬ (বিপি, ২০১৫)	মোট: ১.৬ পুরুষ: ১.৩ নারী: ০.৩	মোট: ১.৩৯ পুরুষ: ২.১ নারী: ০.৬৭ (বিপি, ২০১৯)
১৬.১.২ জেন্ডার, বয়স ও কারণভেদে প্রতি এক লাখে সংঘর্ষ-সম্পর্কিত মৃত্যু	০.৮৫ (বিপি, ২০১৫)	-	০.১৭ (বিপি, ২০১৮)
১৬.১.৪ মোট জনসংখ্যার মধ্যে বসবাসের এলাকায় একা হাঁটার সময় নিরাপদ বোধ করা মানুষের অনুপাত	সবসময়: ৮৫.৮৫% (পুরুষ: ৮৭.৮৮% নারী: ৮৩.৭১%) মাঝে মাঝে: ৯.৫৫% (পুরুষ: ৮.৩৫% নারী: ১০.৮২%) (সিএইচপিএস, ২০১৮, বিবিএস)		সবসময়: ৮৫.৮৫% (পুরুষ: ৮৭.৮৮% নারী: ৮৩.৭১%) মাঝেমাঝে: ৯.৫৫% (পুরুষ: ৮.৩৫% নারী: ১০.৮২%) (সিএইচপিএস, ২০১৮, বিবিএস)
১৬.২.১ পূর্ববর্তী মাসে ১ থেকে ১৭ বছর বয়সি শিশু যারা নিজ গৃহে যে কোনো শারীরিক দণ্ড এবং/কিংবা মানসিক আঘাত পেয়েছে, তাদের অনুপাত	৮২.৩ (এমআইসিএস ২০১২-১৩)	-	৮৮.৮ (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
১৬.২.২ জেন্ডার, বয়স এবং হয়রানির ধরনভেদে প্রতি এক লাখ জনসংখ্যায় মানব পাচারের শিকার মানুষের সংখ্যা	মোট: ০.৮৫ পুরুষ: ১.১৪ নারী: ০.৬৪ (বাংলাদেশ পুলিশ, ২০১৫)	মোট: ০.৫	মোট: ০.৬১ পুরুষ: ০.৫৮ নারী: ০.৬৩ (বাংলাদেশ পুলিশ, ২০১৯)
১৬.৩.১ পূর্ববর্তী ১২ মাসে যারা সহিংসতার শিকার হয়েছে, যারা এ বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত দ্বন্দ্ব নিরসনকারী সংস্থার কাছে অভিযোগ দিয়েছে, তাদের অনুপাত	নারী: ২.৪৫% (ভিএডব্লিউ সমীক্ষা, ২০১৫)	নারী: ১০%	নারী: ১০.৩% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
১৬.৩.২ কারাগারে মোট বন্দির মধ্যে অদণ্ডিত হাজতির অনুপাত	৭৬.৫ (কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ২০১৬ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	৭০%	৮৩.৬০% (কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ২০১৮ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
১৬.৬.১ খাতভেদে (বা বাজেট কোড বা অনুরূপ দ্বারা) সরকারের আসল অনুমোদিত বাজেটের অনুপাত হিসাবে প্রাথমিক সরকারি ব্যয়	শিক্ষা ও প্রযুক্তি : ৯২% স্বাস্থ্য: ৯৩% সামাজিক সুরক্ষা: ৭৩% কৃষি: ৮৪% এলজিইডি ও আরডি: ১০৩% গৃহায়ন: ৯৫% (অর্থ বিভাগ, অর্থবছর ২০১৫)	-	শিক্ষা ও প্রযুক্তি: ৯৩% স্বাস্থ্য: ৮০% সামাজিক সুরক্ষা: ৮৮% কৃষি: ৯০% এলজিইডি ও আরডি: ৯৬% গৃহায়ন: ১২১% (অর্থ বিভাগ, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
১৬.৯.১ বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের অনুপাত, বয়স ভিত্তিতে	৩৭% (এমআইসিএস ২০১২-১৩)	৬০%	৫৬.২% (এমআইসিএস, ২০১৯, বিবিএস)
অভীষ্ট ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালীকরণ			
অর্থায়ন			
১৭.১.১ উৎসের ভিত্তিতে জিডিপির অনুপাত হিসেবে মোট সরকারি রাজস্ব	১০.৭৮% (অর্থবিভাগ, অর্থবছর ১৫)	১৬%	১২.৪৮% (অর্থবিভাগ, অর্থবছর ২০১৯-২০)
১৭.১.২ অভ্যন্তরীণ করের সুবাদে অর্থায়ন পাওয়া দেশীয় বাজেটের অনুপাত	৬৩% (অর্থবিভাগ, অর্থবছর ১৫)	৬৫%	৬৫.৮৫% (অর্থবিভাগ, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
১৭.২.১ নেট আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তার সমষ্টি এবং যা স্বল্পোন্নত দেশকে দেওয়া হয়েছে, ওইসিডির ডিএসির মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) অনুপাত হিসেবে	ক) মোট নেট ওডিএ: ১৩১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খ) এলডিসি দেশকে দেওয়া মোট নেট ওডিএ: ৩৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার গ) বাংলাদেশকে দেওয়া নেট ওডিএ: ৩.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ওইসিডি, ২০১৫ এবংইআরডি, ২০১৫)	-	ক) মোট নেট ওডিএ: ১৪৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খ) এলডিসি দেশকে দেওয়া মোট নেট ওডিএ: ৬৫.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার গ) বাংলাদেশকে দেওয়া নেট ওডিএ: ৬.২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ওইসিডি, ২০১৭ এবংইআরডি, ২০১৯)
১৭.৩.২ মোট জিডিপির অনুপাত হিসাবে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)	৬.৭% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬)	৭.৬০%	৫.৭% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯)
১৭.৪.১ পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানির অনুপাত হিসাবে ঋণসেবা	৩.১% (বিবি, এবংইআরডি, অর্থবছর১৫-১৬)	-	৩.৯% (বিবি, এবংইআরডি, অর্থবছর ২০১৮-১৯)
প্রযুক্তি			
১৭.৬.২ গতির ভিত্তিতে প্রতি ১০০ অধিবাসীর মধ্যে ফিক্সড ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রাহক	২.৪১ (বিটিআরসি, ২০১৫)	৮	৪.৮০ (বিটিআরসি, ২০১৯)
সক্ষমতা-বিনির্মাণ			
সূচক ১৭.৯.১ উন্নয়নশীল দেশের প্রতি আশ্বাস দেওয়া অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার ডলার মূল্যমান; যে আশ্বাসে অন্তর্ভুক্ত নর্থ-সাউথ, সাউথ-সাউথ ও ট্রায়াঙ্গুলার কো-অপারেশনের সহায়তা	৫৭০.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, ২০১৫)	৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩৮২. মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইআরডি, ২০১৮)
বাণিজ্য			

সূচক	ভিত্তিসীমা উপাত্ত (বছর, সূত্র)	২০২০ সাল নাগাদ মাইলফলক	বর্তমান অবস্থা
১৭.১০.১ বিশ্বব্যাপী ওয়েইটেড শুল্ক-গড়	৪.৮৫% (এমওসি, ২০১৫)	৫.৫%	৪.৬৪% (বিটিসি, ২০১৮-১৯, এমওসি)
১৭.১১.১ বৈশ্বিক রপ্তানিতে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের হিস্যা	ক) বৈশ্বিক পরিষেবা রপ্তানি =>উন্নয়নশীল: ৩১.০৪%; এলডিসি: ০.৮৪% খ) বৈশ্বিক পণ্য রপ্তানি=> উন্নয়নশীল: ৪৪.৫৬%; এলডিসি: ০.৯৪% গ) বৈশ্বিক পরিষেবা আমদানি => উন্নয়নশীল: ৩৯.২০%; এলডিসি: ১.৬৮% ঘ) বৈশ্বিক পণ্য আমদানি => উন্নয়নশীল: ৪২.১৯%; এলডিসি: ১.৪৫% (২০১৫, ইউএনস্ট্যাটস)		ক) বৈশ্বিক পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের অংশ: ০.২৩% খ) বৈশ্বিক পরিষেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা: ০.০৭% (বিটিসি, ২০১৭, এমওসি)
১৭.১২.১ উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত এবং ক্ষুদ্র-দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ওপর চাপানো শুল্কের গড়	ক) এমএফএন: ১৪.৪৪% খ) অগ্রাধিকার: ৩.৮৮% (এনবিআর, ২০১৫)	ক) ৮.২৫% খ) ৩.৮৮%	এমএফএন-১৪.৬০% এসএটি: ৮.৩৩% ডব্লিউএটি: ২.৯৫% (বিটিসি, ২০১৯, এমওসি)
পদ্ধতিগত বিষয়			
বহু-সংশ্লিষ্টজনের অংশীদারিত্ব			
১৭.১৭.১ (ক) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও (খ) সুশীল সমাজ অংশীদারিত্বকে প্রদেয় মার্কিন ডলারের আশ্বাসের অনুপাত	৮০৭, ১৬৪, ০২৭.৮৬ মার্কিন ডলার (এনজিওএবি ২০১৫-১৬)	-	১, ০৯৮, ৫৯৮, ০২১.৮৩ মার্কিন ডলার (এনজিওএবি ২০১৮-১৯)
উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও দায়বদ্ধতা			
১৭.১৮.২ সেসব দেশের সংখ্যা যাদের জাতীয় পরিসংখ্যান আইন রয়েছে, যেগুলো আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যানের মূলনীতি (এফপিওএস) প্রতিপালন করে	বাংলাদেশে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ রয়েছে, যা এফপিওএস প্রতিপালনে পর্যবেক্ষণাধীন আছে	-	আইনটি যাচাই ও সুপারিশ প্রণয়নে বিবিএসে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে
১৭.১৮.৩ তহবিল উৎসের ভিত্তিতে সেসব দেশের সংখ্যা, যাদের জাতীয় পরিসংখ্যান আইন রয়েছে, যেগুলো পুরো অর্থায়ন পেয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন রয়েছে	বিবিএস ২০১৪-২০১৩-ব্যাপী এনএসডিএস অনুমোদন করেছে, যা হালানাগাদ করা দরকার	-	এনএসডিএস বাস্তবায়নের সুবিধার্থে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

২০০৯ থেকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

1.	Policy Study on Financing Growth and Poverty Reduction: Policy Challenges and Options in Bangladesh (May 2009)
2.	Policy Study on Responding to the Millennium Development Challenge Through Private Sectors Involvement in Bangladesh (May 2009)
3.	Policy Study on The Probable Impacts of Climate Change on Poverty and Economic Growth and the Options of Coping with Adverse Effect of Climate Change in Bangladesh (May 2009)
4.	Steps Towards Change: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction II (Revised) FY 2009 -11 (December 2009)
5.	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2009 (2009)
6.	Millennium Development Goals: Needs Assessment and Costing 2009-2015 Bangladesh (July 2009)
7.	এমডিজি কর্ম-পরিকল্পনা (৫১টি উপজেলা) (জানুয়ারি-জুন ২০১০)
8.	MDG Action Plan (51 Upazillas) (January 2011)
9.	MDG Financing Strategy for Bangladesh (April 2011)
10.	SAARC Development Goals: Bangladesh Progress Report-2011 (August 2011)
11.	Background Papers of the Sixth Five Year Plan (Volume 1-4) (September 2011)
12.	6th Five Year Plan (FY 2011-FY 2015) (December 2011)
13.	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2011 (February 2012)
14.	Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021: Making Vision 2021 a Reality (April 2012)
15.	Public Expenditure for Climate Change: Bangladesh Climate Public Expenditure and Institutional Review (October 2012)
16.	Development of Results Framework for Private Sectors Development in Bangladesh (2012)
17.	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) বাংলা অনুবাদ (অক্টোবর ২০১২)
18.	Climate Fiscal Framework (October 2012)
19.	Public Expenditure for Climate Change: Bangladesh CPEIR 2012
20.	First Implementation Review of the Sixth Five year Plan -2012 (January 2013)
21.	বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ণ (ফেব্রুয়ারি ২০১৩)
22.	National Sustainable Development Strategy (2010-2021) (May 2013)
23.	জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) [মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুদিত] (মে ২০১৩)
24.	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report-2012 (June 2013)
25	Post 2015 Development Agenda: Bangladesh Proposal to UN (June 2013)
26.	National Policy Dialogue on Population Dynamics, Demographic Dividend, Ageing Population & Capacity Building of GED [UNFPA Supported GED Project Output1] (December 2013)
27.	Capacity Building Strategy for Climate Mainstreaming: A Strategy for Public Sector Planning Professionals (2013)
28.	Revealing Changes: An Impact Assessment of Training on Poverty-Environment Climate-Disaster Nexus (January 2014)
29.	Towards Resilient Development: Scope for Mainstreaming Poverty, Environment, Climate Change and Disaster in Development Projects (January 2014)
30.	An Indicator Framework for Inclusive and Resilient Development (January 2014)
27.	Capacity Building Strategy for Climate Mainstreaming: A Strategy for Public Sector Planning Professionals (2013)

28.	Revealing Changes: An Impact Assessment of Training on Poverty-Environment Climate-Disaster Nexus (January 2014)
29.	Towards Resilient Development: Scope for Mainstreaming Poverty, Environment, Climate Change and Disaster in Development Projects (January 2014)
30.	An Indicator Framework for Inclusive and Resilient Development (January 2014)
31.	Manual of Instructions for Preparation of Development Project Proposal/Performa Part-1 & Part 2 (March 2014)
32.	SAARC Development Goals: Bangladesh Progress Report-2013 (June 2014)
33.	The Mid Term-Implementation Review of the Sixth Five Year Plan 2014 (July 2014)
34.	Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2013 (August 2014)
35.	Population Management Issues: Monograph-2 (March 2015)
36.	GED Policy Papers and Manuals (Volume 1-4) (June 2015)
37.	National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh (July 2015)
38.	MDGs to Sustainable Development Transforming our World: SDG Agenda for Global Action (2015-2030)- A Brief for Bangladesh Delegation UNGA 70th Session, 2015 (September 2015)
39.	7th Five Year Plan (2015/16-2019/20) (December 2015)
40.	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০ (ইংরেজি থেকে বাংলা অনূদিত) (অক্টোবর ২০১৬)
41.	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (অক্টোবর ২০১৬)
42.	Population Management Issues: Monograph-3 (March 2016)
43.	Bangladesh ICPD 1994-2014 Country Report (March 2016)
44.	Policy Coherence: Mainstreaming SDGs into National Plan and Implementation (Prepared for Bangladesh Delegation to 71st UNGA session, 2016) (September 2016)
45.	Millennium Development Goals: End- period Stocktaking and Final Evaluation Report (2000-2015) (September 2016)
46.	A Handbook on Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) (September 2016)
47.	Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (January 2017)
48.	Environment and Climate Change Policy Gap Analysis in Haor Areas (February 2017)
49.	Integration of Sustainable Development Goals into the 7th Five Year Plan (February 2017)
50.	Banking ATLAS (February 2017)
51.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত) (এপ্রিল ২০১৭)
52.	EXPLORING THE EVIDENCE : Background Research Papers for Preparing the National Social Security Strategy of Bangladesh (June 2017)
53.	Bangladesh Voluntary National Review (VNR) 2017 : Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world, (June 2017)
54.	SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective (June 2017)
55.	A Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan (June 2017)
56.	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 01: Macro Economic Management & Poverty Issues (June 2017)
57.	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 02: Socio-Economic Issues (June 2017)
58.	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 03: Infrastructure, Manufacturing & Service Sector (June 2017)

59.	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 04: Agriculture, Water & Climate Change (June 2017)
60.	7th Five Year Plan (FY 2015/16-FY 2019/20): Background Papers Volume 05: Governance, Gender & Urban Development (June 2017)
61.	Education Sector Strategy and Actions for Implementation of the 7th Five Year Plan (FY2016-20)
62.	GED Policy Study: Effective Use of Human Resources for Inclusive Economic Growth and Income Distribution-An Application of National Transfer Accounts (February 2018)
63.	Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (March 2018)
64.	National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the implementation of Sustainable Development Goals (June 2018)
65.	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 1: Water Resources Management (June 2018)
66.	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 2: Disaster and Environmental Management (June 2018)
67.	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 3: Land use and Infrastructure Development (June 2018)
68.	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 4: Agriculture, Food Security and Nutrition (June 2018)
69.	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 5: Socio-economic Aspects of the Bangladesh (June 2018)
70.	Bangladesh Delta Plan 2100: Baseline Studies: Volume 6: Governance and Institutional Development(June 2018)
71.	Journey with SDGs, Bangladesh is Marching Forward (Prepared for 73rd UNGA Session 2018) (September 2018)
72.	এসডিজি অভিযাত্রা: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৮)
73.	Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Volume 1: Strategy (October 2018)
74.	Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Volume 2: Investment Plan (October 2018)
75.	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ) (অক্টোবর ২০১৮)
76.	Bangladesh Delta Plan 2100: Bangladesh in the 21st Century (Abridged Version) (October 2018)
77.	Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation (November 2018)
78.	Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 (December 2018)
79.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টঃ বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ (ইংরেজি থেকে অনূদিত) (এপ্রিল ২০১৯)
80.	Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh (May 2019)
81.	Implementation Review of the Sixth Five Year Plan (FY 2011-FY 2015) and its Attainments (May 2019)
82.	Mid-term Implementation Review of the Seventh Five Year Plan (FY 2016-FY 2020) May 2019
83.	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-1 June 2019
84.	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-2 June 2019
85.	Empowering people: ensuring inclusiveness and equality For Bangladesh Delegation to HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2019 (July, 2019)
86.	Implementation Review of the perspective plan 2010-2021 (September 2019)
87.	Bangladesh Moving Ahead with SDGs (Prepared for Bangladesh Delegation to 74th UNGA session 2019) (September 2019)
88.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৯)
89	Prospects and Opportunities of International Cooperation in Attaining SDG Targets in Bangladesh (Global Partnership in Attainment of the SDGs) (September 2019)

90	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-3 October 2019
91	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-4 October 2019
92	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-5 October 2019
93	Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-6 October 2019
94	Monograph 4: Population Management Issues (December 2019)
95	Monograph 5: Population Management Issues (December 2019)
96	Consultation on Private Sector Engagement (PSE) in attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh: Bonding & Beyond. Proceedings (January 2020)
97	Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh (March 2020)
98	Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041(March 2020)
99	বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ (মার্চ ২০২০)
100	Revised Monitoring and Evaluation Framework of the Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (April 2020)
101	Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020 (June 2020)
102	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত) (জুন ২০২০)

২০১৬ থেকে জিইডি কর্তৃক প্রকাশিত এসডিজি বিষয়ক গ্রন্থাবলী

1	Integration of Sustainable Development Goals into the 7th Five Year Plan (February 2016)
2	Policy Coherence: Mainstreaming SDGs into National Plan and Implementation [Prepared for Bangladesh Delegation to 71st UNGA session 2016] (September 2016)
3	A Handbook on Mapping of Ministries by Targets in the Implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) (September 2016)
4	Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (January 2017)
5	**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুদিত) (এপ্রিল ২০১৭)**
6	Bangladesh Voluntary National Review (VNR) 2017: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world (June 2017)
7	SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective (June 2017)
8	A Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan (June 2017)
9	Bangladesh Development Journey with SDGs [Prepared for Bangladesh Delegation to 72nd UNGA Session 2017] (September 2017)
10	Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (March 2018)
11	National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs (June 2018)
12	Journey with SDGs: Bangladesh is Marching Forward [Prepared for Bangladesh Delegation to 73rd UNGA Session 2018] (September 2018)
13	**এসডিজি অভিযাত্রা : এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৮)**
14	Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation (November 2018)
15	Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 (December 2018)
16	**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টঃ বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ (ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুদিত) (এপ্রিল ২০১৯)**
17	Empowering People: Ensuring Inclusiveness and Equality [For Bangladesh Delegation to High-Level Political Forum 2019] (July 2019)
18	Prospects and Opportunities of International Cooperation in Attaining SDG targets in Bangladesh (September 2019)
19	Bangladesh Moving Ahead with SDGs [Prepared for Bangladesh Delegation to 74th UNGA Session 2019] (September 2018)
20	**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৯)**
21	Consultation on Private Sector Engagement (PSE) in attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh: Bonding & Beyond. Proceedings (January 2020)
22	Revised Monitoring and Evaluation Framework of the Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (April 2020)
23	Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020 (June 2020)
24	**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত) (জুন ২০২০)**

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার